শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৭শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৪০২ { ৮ম সংখ্যা



অন্তর্দ্বীপস্থ
শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে সেবিত

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-
নৃসিংহদেব

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
—: কার্য্যালয় :— নূতন ফোনঃ ৫৫৫-৮৯৭৩
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন: ৩৩-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ, বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৮ গোবিন্দ হইতে ৫০৯ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৪০১ ফাল্গুন হইতে ১৪০২ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯৫ মার্চ্চ হইতে ১৯৯৬ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সপ্তচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অকিঞ্চন কে ?	৪।১৩৭
অনর্থ ত্যাগ [কবিতা]	৪।১৪৪
অনধিকার চর্চ্চা	১২।৪৬০
অনুরাগ-বল্লী—শ্রী	৮।২৮১
অধিকারই ভিন্নতা-প্রকাশক	১১।৪১১
অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা]	১২।৪৭২
আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য	১।১৯, ৩।৯৬, ৪।১৩৪, ৫।১৭৫, ১০।৩৬৯
আস্তিকতা ও নাস্তিকতা	৯।৩২৯
একাদশী—শ্রী	৮।২৯৩
কার্ত্তিকব্রতে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ	৩।১০৪
কামনাই সর্ব্বপাপের মূল	৭।২৭৫
কৃষ্ণ স্তোত্রম্—শ্রী	১২।৪৪১
কৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলা—শ্রী [কবিতা]	৮।২৯৬
কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ—শ্রী	৮।৩০৫
কেশব গোস্বামী মহারাজের হরিকথা—শ্রীশ্রীল	১।৮, ২।৪৯, ৩।৯০
কেশব-গোস্বামি-বন্দনা—শ্রীল [কবিতা]	১২।৪৬৮
গুরুদেবের আরতি দর্শন—শ্রীশ্রী [কবিতা]	১।২৪
গুরুদেব ও পরমার্থ-বিদ্যা—শ্রী	৩।১১৫
গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা—শ্রীল [দামোদর-ব্রতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত]	৪।১৫৪, ৫।১৯৪, ৬।২২৮, ৮।৩১৫, ৯।৩৫৪, ১০।৩৯০, ১১।৪৩১, ১২।৪৬২
গুরুসেবক ও গুরুভোগী	১১।৪১৮, ১২।৪৫০
গুরু-বন্দনা—শ্রী [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায়	১১।৪২৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১১।৪৩৬
গোপালরাজ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৫।১৬১
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৬।২০১
গোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
গোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	১০।৩৯৮
গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ ও শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৫৯
চৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৫।১৬৯
চৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্—শ্রী	৩।৮১
ছাত্রজীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা	৩।১০৭
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জীবের কৃত্য	৯।৩৩৮, ১০।৩৮৩, ১১।৪২৩, ১২।৪৫৩
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৫।১৯৯
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরণে [কবিতা]	৩।১১৩
"তিতা বেহায়া"	৪।১৫১
দয়া না সেবা ?	৮।২৯৯
দান-নির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্—শ্রী	১০।৩৬১
দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন	৬।২২৫
দ্বাদশ-স্তোত্রম্ - শ্রীমদ্	১।১, ২।৪১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৫
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১১।৪৩৯
নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৪।১২১
নন্দলালের জন্মকথা—শ্রী	৬।২১৯, ৭।২৫২
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়	১।১১, ২।৫৬, ৩।৯২, ৪।১৩০, ৫।১৭১
নৃসিংহ	৪।১৪৭, ৫।১৯০
পত্রিকার নববর্ষ—শ্রী	১।৩৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৩, ২।৪৩, ৩।৮৩, ৪।১২৪, ৫।১৬৬, ৬।২০৪, ৭।২৪৭, ৮।২৮৪, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৫, ১২।৪৪৩
প্রচার-প্রসঙ্গ	১২।৪৭০
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	১।৬, ২।৪৭, ৩।৮৮, ৪।১২৮, ৫।১৭০, ৬।২০৮, ৭।২৫১, ৮।২৮৭, ৯।৩২৭, ১০।৩৬৭, ১১।৪০৯, ১২।৪৪৮
প্রকৃত পুত্র কে ?	২।৬৫
প্রকৃত বন্ধু কে ?	৭।২৬০
প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্—শ্রী	১১।৪০১
প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ—শ্রী	৯।৩২১
বর্ষশেষে নিবেদন	১২।৪৭৩
বিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	২।৭৯
বিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব —শ্রী [বিবরণ]	৪।১৫৮
বিনোদবিহার—শ্রী [কবিতা]	৬।২৩১
বিবিধ প্রসঙ্গ	৬।২৩৬
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য-কেশরী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ—শ্রী	৭।২৬৭
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [ফোন নং পরিবর্ত্তন]	৭।২৮০
বেতন, পারিশ্রমিক বা জীবিকার বিনিময়ে ভক্তিযাজন হয় না	২।৫১
বৈষ্ণবগণ-বন্দনা [কবিতা]	৮।৩০২
বৈষ্ণব কি হিন্দু ?	৮।৩০৮
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী [বিবরণ]	১০।৩৯৮
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এবং প্রেম-প্রদীপ [বিজ্ঞাপন]	২।৭৮
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব [বিজ্ঞাপন]	৪।১৫৩
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ	১০।৩৭৩
ভক্তিবিনোদ-প্রণতি—শ্রী [কবিতা]	১।১৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব —শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৬।২৩৯
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে	৯।৩৩১
ভক্তি-অর্ঘ্য [কবিতা] শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে	১০।৩৯৫
ভ্রান্ত-কর্ম্মবীর [কবিতা]	৭।২৭৭
মন	৫।১৮৫
মদনগোপাল-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৭।২৪১
মনুষ্য-সৃষ্ট ঈশ্বর, না—ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্য	৯।৩৪৫
মনোধর্ম্ম ও স্বরূপতত্ত্ব	১।২৯
রথযাত্রা-মাহাত্ম্য—শ্রী [কবিতা]	৬।২১৭
"রাধিকার দাসী যদি হোয় অভিমান"	৩।১০১
শারদীয়া দুর্গাপূজার উৎপত্তি কোথায় ?	৬।২০৯
শ্রীমনঃশিক্ষা ও শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৩৮
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ	১।২৬, ২।৬০
সঙ্কীর্ত্তন	৩।১১৮, ৪।১৪১
সভ্যতা	৮।২৮৯
"সম্ভবামি যুগে যুগে"	৬।২৩৩, ৭।২৬৩
সাধুর মহান্ গুণ শুন ভক্তজন [কবিতা]	৫।১৮১
সাধুসঙ্গই তীর্থভ্রমণের প্রকৃষ্ট ফল	১০।৩৭৮
সেবকের অনুভূতি ও উপলব্ধি	৭।২৭৩
স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্	১।৩৩, ৩।১১১
স্বধামে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ	২।৭০
স্বধামে শ্রীরসিককৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু	২।৭২
"হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার"	৯।৩৩৪
A FEW WORDS ON VEDANTA ও RELATIVE WORLDS [বিজ্ঞাপন]	৬।২২৭
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

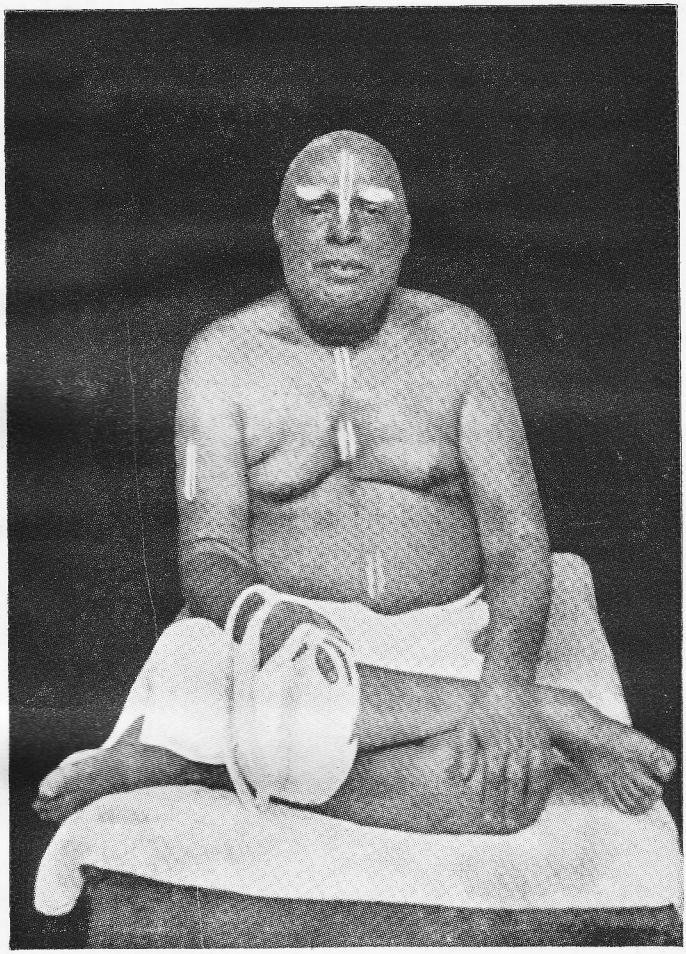

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ২৮ গোবিন্দ, অনিরুদ্ধ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০১, ইং ১৫/৩/৯৫ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্‌-দ্বাদশ-স্তোত্রম্‌

[শ্রীমদ্‌-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্‌]

(১১)

উদীর্ণমজরং দিব্যমমৃতস্যন্দ্যধীশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্‌॥ ১॥

জগদধীশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং অজর, দিব্য ও অমৃত-নিষ্যন্দিরূপে প্রকাশমান। আমি তাহা বন্দনা করি॥ ১॥

সর্ব্ববেদপদোদ্‌গীতমিন্দিরাবাসমুত্তমম্‌।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্‌॥ ২॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং সমস্ত বৈদিক পদসমূহ-কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত ও ইন্দিরাদেবীর উত্তম আবাস-স্থল। আমি তাহা বন্দনা করি॥ ২॥

সর্ব্বদেবাদিদেবস্য বিদারিতমহত্তমঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদেবাদিদেব আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং প্রবল-তমোরাশির বিঘাতক। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

উদারমাদরান্নিত্যমনিন্দ্যং সুন্দরীপতেঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৪ ॥

সুন্দরীগণ-কান্ত আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয়। আমি আদরপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

ইন্দীবরোদরনিভং সুপূর্ণং বাদি-মোহদম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৫ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নীলকমল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপূর্ণ ও বাদিগণের মোহপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

দাতৃ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্য বিমুক্ত্যাদেরহো বরম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৬ ॥

আনন্দময়ের উত্তম পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নিখিল দেবগণের ঐশ্বর্য্য ও বিমুক্তিপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

দূরাদ্দূরতরং যত্তু তদেবান্তিকমন্তিকাৎ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৭ ॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং দূর হইতেও দূরতর ও নিকট হইতেও নিকটতর। আমি তাহা বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

পূর্ণসর্ব্বগুণৈকার্ণবমনাদ্যন্তং সুরেশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

সুরেশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বগুণের অদ্বিতীয় সিন্ধু, অনাদি ও অনন্ত ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থ-মুনিনা হরেরানন্দরূপিণঃ।
কৃতং স্তোত্রমিদং পুণ্যং পঠন্নানন্দতামিয়াৎ ॥ ৯ ॥

আনন্দতীর্থমুনি-কর্ত্তৃক বিরচিত আনন্দময় শ্রীহরির এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিয়া মানব আনন্দরূপতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রুতিপ্রস্থান

১। শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান শাস্ত্র কি ?

"উপনিষদ্,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষদ্। সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ষোল পাদ। এই দুইটী শাস্ত্র-মধ্যে প্রধান।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ৭।১০৮

২। শ্রুতি-প্রস্থানের প্রতিপাদ্য কি ব্রহ্ম-লাভ নহে ?

"উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র। স্থল-বিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্ম-লাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু চরম মীমাংসাস্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।" —'অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

৩। অথর্ব্ববেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কি আধুনিক ? জৈমিনীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য কি ?

"ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিকস্থলে উক্ত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন মন্ত্র-সকল ঐ তিন বেদরূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না। যেহেতু, বৃহদারণ্যকে,—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম-বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্য-স্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি',—এরূপ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে, বোধ হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রে যে পুরাণ-ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা—যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনির সার-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে-সকলই পরমেশ্বর-মূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ—এই সকল অনিত্য

বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল-সত্য-সকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। কি কি বেদ-গ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন ?

"ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনাসহায়রূপ তাপনী এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বান্তর্গত কাণ্ড-বিস্তারক বেদ-গ্রন্থসমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যপরম্পরা-ক্রমে এই সকল বেদগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ আপ্তবাক্য বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

ন্যায়প্রস্থান

১। ন্যায়-প্রস্থানের বৈশিষ্ট্য কি ?

"ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ-নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্ত-সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্য-সকল সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য, এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্য কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদের অর্থ না জানিলে মানব জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগ-পূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচারমাত্র নয়, কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সংগ্রহের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন। ব্রহ্মসূত্রার্থ

সংগ্রহ করা জীবের পক্ষে সহজ নয়। সূত্র পাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, এরূপ নহে, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। অতএব কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে একটী কঠিন প্রশ্ন এই,—সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায়, অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়? বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্ন-সহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষ্য রচনা করেন, সংস্কৃত 'প্রপন্নামৃত'-গ্রন্থে এরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য-রচনা নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এরূপ জনশ্রুতি আছে।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

২। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য কোন্‌টী। শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক বৌধায়ন ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতকে গোপন করিবার মূল কারণ কি?

"বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে-যে কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? অতএব যে-সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, শ্রীনারদের উপদেশে তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা-পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ে আর বাসনা থাকে না।

শরীরের প্রতি মমতা—মূঢ়তা মাত্র। কেবল শরীরের যত্ন করিলে হরিভজন হয় না। শরীর একদিন না একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা আবশ্যক। দেহ থাকাকালে পরতত্ত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব যত্ন। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, কাদা, মাটি প্রভৃতি আমাদের কিছু প্রকৃত সুবিধা দিবে না।

যিনি হরিভজন করেন ও অপরকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। জড়বিদ্যা অধিক হইলে হরিভজনের পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকরা প্রায় শত ভাগই সম্ভাবনা।

'হরিভজনই সর্ব্বদা করিব'—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নামপরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তন্নিজজনকে চিনিতে পারেন। হরিভজন না করিয়া বাঁচিয়া থাকা কি লাভ? মরিয়া যাওয়া ভাল। হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে 'খা'ব-দা'ব', থা'কব ও শেষকালে নরকে চলিয়া যাইব।'

অধিক সঞ্চয় বা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম; অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানা মতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টী দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর নাই—হইবে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা উপকারের নামে মহা অপকার; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্যি সত্যি নিত্য উপকার। তাহা দু' দশ দিনের উপকার নয়,—তাৎকালিক উপকার নয়, যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব করিবে। এরূপ উপকারের কথা বলিয়া মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। তাঁহারা এমন উপকারের কথা বলিয়াছেন—এমন জিনিস দান করিয়াছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।

আমার গুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর, তাঁহার দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করিতে পারে। যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন করেন, তাঁহার আনুগত্যময়ী সেবার দ্বারা তিনি যাঁহার সেবা করেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যাইতে পারে না। নমস্কারের পথই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা দরকার। সাধুদিগের শ্রীমুখবিগলিত বার্ত্তা যিনি কাণ পাতিয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়। যে পরিমাণে হরির বিস্মৃতি হইবে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর্দ্বারা দেখিবার চেষ্টা হইবে।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া - কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া। কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হইলে এই অভদ্র হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণ স্মৃতিপথে আসিয়া যান অর্থাৎ আমি নিত্যকৃষ্ণদাস এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত অভদ্রে আগুন লাগিয়া যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

মানুষের সর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বস্ব যাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ শতকরা শত-পরিমাণে সুবিধা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিয়াছেন।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন—সর্ব্বাপেক্ষা হীন-অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন। সর্ব্বোত্তম হইলেও নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। জাগতিক কোনপ্রকার অসুবিধা শরণাগত ভক্তকে শরণাগতি হইতে—কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ কার্য্য হইতে কিছুমাত্রও বিচ্যুত করিতে পারে না।

ভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা, কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শন নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। কাজেই ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গল বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করিব। সকল বিপদের মীমাংসা—ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা।

প্রতিকূল অনুশীলনের দ্বারা অসুবিধা হইয়া যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। শুষ্ক-বৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকাইয়া মারিয়া ফেলে! কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত,

মরিয়া যাইবার দরুণই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্যকথায় অমনোযোগিতা। যাহারা নিজেরা **recipient** হইতে চাহিতেছে, তাহাদের জীবন কিছুক্ষণ পরে থামিয়া যাইবে। তাহারা মৃতই আছে। বাস্তব বেদ্যবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হইয়াছে, সে জীবিতম্মন্য হইলেও 'জীব'-শব্দবাচ্য নহে। তাহার তথাকথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভাসিয়া যাওয়া মাত্র। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিকভাবে পরস্পর মারামারি করিতেছে।

অভক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতন বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণা মাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্য-বিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এরূপ অমঙ্গল হইতেছে।

শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের হরিকথা

বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুইটী একই বস্তু। তাঁহাদের এ জগতে আসা ও যাওয়া—দুইই তাঁহাদের কৃপার পরিচায়ক। জগতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারা এ'জগতে আসেন, আবার কৃপা করিয়াই এ'জগৎ হইতে চলিয়া যান। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কলাপ সমুদায়ই কৃপাময়। "বৈষ্ণব চরিত্র সদা পবিত্র।" আনন্দ-প্রদানই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ব্যক্তি ভোগবশে তাঁহাতে নিরানন্দ লক্ষ্য করে। ইহাই মায়ার আধিপত্য। কেহ যদি মনে করেন,—বৈষ্ণব এ'জগৎ হইতে চলিয়া গিয়া আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-চরিত্রে দোষারোপ করা হয়। তিনি দুঃখ দিবেন কেন? এই জন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে '**বিরহ-উৎসব**' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'উৎসব'-শব্দের অর্থ—নিরানন্দ বা দুঃখ নহে। ইহা সুখ ও প্রীতিদায়ক। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণব জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অনিত্য নহে; তাৎকালিকতার ছায়াপাতও তাঁহাতে নাই। সনাতন বস্তুর রীতিও সনাতন। তাহাতে আবির্ভাব তিরোভাবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং তিরোভাব আবির্ভাবের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে। আবির্ভাবের মাধুর্য্য ও তিরোভাবের ঔদার্য্য লইয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব। এ' সাহিত্য শব্দ-ব্রহ্মেরই বিকাশ। ইহাতে শব্দ-সামান্যের কোন মলিন ছায়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্রীল প্রভুপাদ —সিদ্ধান্ত সরস্বতী। অর্থাৎ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত বাণী-মন্দিরের গর্ভ বিস্তার-স্বরূপ।

সুখ ও দুঃখ দুইটীকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করাই বৈকুণ্ঠ-দর্শন। বৈকুণ্ঠ-দর্শনে প্রত্যেক বস্তুতেই সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাম্য পূর্ণ-বৈশিষ্ট্যময়। জাগতিক বৈষম্য অপ্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকার সুখ-দুঃখের প্রতি-দ্বন্দ্বিতাময়ী বৃত্তি পরস্পরের ভিতরে অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যময় সাম্য প্রকাশ করিয়াছে। একই পথের দুই সীমায় সুখ ও দুঃখ—দুইটী অবস্থিত। উভয় দিক্ হইতে উহা সমভাবে অগ্রসর হইলে একই মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে মিলিত হয়। ইহারই নাম সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ। ইহারই অধিদেবতা স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর। আবির্ভাব-তিরোভাবই সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের প্রতীক অবতার। মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কাই মিলনকে প্রগাঢ়তর করিয়া থাকে। এবং মিলন-স্থলে যত গভীর-ভাবে বিরহ-চিন্তা হৃদয়ে জাগরুক হইবে, ততই মিলনের মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত হইবে। বিপ্রলম্ভেও সেই প্রকার মিলনের চিহ্ন যত প্রখরা হইবে, ততই বিপ্রলম্ভ-রসের নিত্য প্রস্রবণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে। ইহাই পরমমুক্তগণের চরিত্রে উদ্ভাসিত।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ক্রিয়া-কলাপের কথা কীর্ত্তনমুখে আলোচনা করিয়া থাকি। অতিমর্ত্ত্যতার বিচার ও চিন্তাস্রোত সকলের এক নহে। যিনি যতটুকু অতিমর্ত্ত্য-ভাবে বিভাবিত, তিনি ততটুকুই তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন। আমাদের ভোগবৃত্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা, সুখৈষণা প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য ধারণার সহায়ক নহে। আমরা এইরূপ বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যে বিরহ জ্ঞাপন করি, তাহা ভোগেরই প্রতিচ্ছবি। ভোগে ব্যাঘাতের নাম 'বিরহ' নহে। ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগ বা বৈরাগ্যকেও তাহা হইলে 'বিরহ' বলা যাইত। বিরহী ব্যক্তির চরিত্রে ত্যাগ বা বৈরাগ্য স্বতঃ-সিদ্ধভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া উহা 'বিরহ' নহে। আমরা আমাদের ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই বিরহ বোধ করি। শ্রীল প্রভুপাদের ললিত-লাবণ্য রূপ, তাঁহার মধুর কোমল হাস্য, সরল উদার ব্যবহার, ভুবন-বিজয়ী অসমোর্দ্ধ্ব পাণ্ডিত্য, সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তনে মুখরিত স্বভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সদয় করুণ স্নেহশীলতা আমাদের সর্ব্বদাই আনন্দ-বর্দ্ধন করিত। এমন কি, veteran intellectualist (গভীর জ্ঞানবাদী) গণও তাঁহার বিচার-যুক্তিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহার অভাবে তাঁহারা দুঃখানুভব করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বক্তব্য,—ইহা বিরহ নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা-স্বরূপ। গুরুদেব সুপুরুষ, তাঁহার ব্যবহার ভাল, তিনি আমাদের প্রচুর সাহায্য করিয়া আনন্দ-বিধান করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে খুব ভাল লাগিত।

এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা ঐগুলি পাইতেছি না বলিয়া যে দুঃখ, উহা সমস্তই কামনা বা ভোগ।

আমরা জন্ম হইতেই পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে কতকগুলি ভাল-মন্দের বিচার লইয়া জীবনধারণ করি। ইহা কতকটা **atmospher & environment** (আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা) হইতে লাভ করিয়া থাকি। তদনুসারে আমরা যে বৃত্তি পাইয়াছি, তাহার দ্বারা যে সাধুতার কল্পনা করিয়া লই, তাহা প্রকৃত সাধুতা নহে। সেবাবুদ্ধির দ্বারাই সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যতদিন সেবা ততদিন ভক্তি। ভক্তিতে বা সেবায় প্রকৃত **atmospher or environment** (আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিকতা)র কোন আধিপত্য নাই। শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও অন্তঃকরণে ভক্তি বা সেবাবৃত্তি দেখিলেই তাহাকে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিতেন, নচেৎ তাঁহার নিজত্ব চিরদিনই বাহ্য জগতের নিকট অবগুণ্ঠিত। ভক্তির প্রধান লক্ষণ—শরণাগতি। নিজের নিজত্ব বিলাইয়া দেওয়াকেই শরণাগতি বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি লাভ করিতে হইবে। গুরু-পাদপদ্মে যতই আত্ম-সমর্পণ হইয়াছে, ততটাই তাঁহার নিষ্কপটে কৃপা পাওয়া গিয়াছে। আমরা আত্মীয়-স্বজনের নিকট সুখ-স্বচ্ছন্দতাই আশা করি। শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও সেইগুলিই আমরা আশা করিয়াছিলাম এবং তাহা পাইয়াও ছিলাম। ইহা কিন্তু বিরহের লক্ষণ নহে। আত্ম-সমর্পণের উপরই বিরহের বিচার। আত্ম-সমর্পণ বলিতে 'আমি ও আমার' যাহা কিছু, সমস্তই সম্যক্‌রূপে অর্পণ করা বুঝায়। সুতরাং গুরুপাদপদ্ম হইতে কোন পার্থিব বস্তু, চিন্তাস্রোত বা ক্রিয়াকলাপ আশা করা—আত্মনিবেদনের লক্ষণ নহে। যেহেতু যে বস্তুটী আমার নিজস্ব বলিয়া মনে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করাই ভক্তি। কেহ যদি মনে করেন,—গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া উহা গুরুদেবকে সমর্পণ করিলে আত্মনিবেদন হইবে না কেন? কিন্তু গুরুর নিকট হইতে এইরূপ কিছু আদায় করিয়া তাহাই গুরুকে দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? যদিও গণিতের বিচারে জমা-খরচ করিলে ইহা একই বলিয়া মনে হইবে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে দেওয়ায় আমার তহবিল শূন্য হইয়াছে; এই শূন্য তহবিলে গুরুদেবের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা আদায় করিয়া লওয়ায় আমার তহবিলে শূন্যের সহিত যোগ দিয়া সহস্র মুদ্রা হইল। পুনরায় এই সহস্র মুদ্রাই গুরুদেবকেই দেওয়া হইল, পরিশেষে শূন্যই রহিল। পূর্ব্বে যে-প্রকার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমার তহবিল শূন্য হইয়াছেন, এখন গুরুর নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে তাহা সমর্পণ করায় তহবিল পূর্ব্বের ন্যায়ই শূন্য হইল। (০+

১০০০=১০০০ ; ১০০০—১০০০=০)। যদিও এই উভয় অবস্থা গণিতের বিচারে একই বলিয়া গণ্য হইবে, তথাপি প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহা এক নহে। বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কারণ গুরুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা—শরণাগত ভক্তের লক্ষণ নহে। উপরন্তু, গুরু-সেবকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য গুরুদেবের ইচ্ছা বা চেষ্টা-জনিত তাঁহার যে ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেই ক্লেশ-প্রদানের ফলভোগ গুরু-সেবককে করিতে হইবে। সুতরাং গুরুপাদপদ্মে কামনা—গুরু-সেবকের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক। গুরুপাদ-পদ্মে প্রীতিকামনাই অন্য কামনার বিনাশক। ইহাই শরণাগতের লক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়

বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়া সংসার-সমুদ্রে পতিত এবং নানা দুঃখে জর্জ্জরিত। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। বদ্ধজীব স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবানই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য ভগবানের অধীন ও সেবক। পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবানই জীবের আশ্রয়। ভগবানাশ্রয় ব্যতীত মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতির অন্য রাস্তা নাই। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

আমার সত্ত্ব-রজস্তমো গুণময়ী দৈবী মায়া নিজ চেষ্টায় কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করে তাহার এই মায়া জয় করিতে পারে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাগত হও; তাহা হইলে তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

ভগবদাশ্রিত ব্যক্তিই ভগবানের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষা করে এবং ভগবানের কৃপাতেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৭৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

'ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুঃ।' অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপাতেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয় এবং ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে।

ভগবন্নামই সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবন্নাম ভগবানের অবতার। কলিকালে শ্রীহরি 'নাম'-রূপে অবতীর্ণ। হরিনাম আনন্দাবতার, হরিনাম পরংব্রহ্ম, হরিনাম জগদীশ্বর। সুতরাং **নামাশ্রয়ই ভগবদাশ্রয়।** হরিনাম হইতেই জগতের লোকের উদ্ধার হইবে—জগদ্বাসী চিরসুখী হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এজন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে জানাইয়াছেন যে—কলিকালে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্য। হরিনামই সাধনা, হরিনামই সাধ্য। হরিনাম যুগপৎ ভগবান্ ও ভক্তি। কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন শুন—স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩০)
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ (শিক্ষাষ্টকম্ ১)
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম্॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্নমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শিক্ষাষ্টকম্ ২)
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণমন্ত্রদ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয় এবং কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন। কলিকালে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। যিনি নিজ জীবনে শুদ্ধভাবে হরিনাম করিয়া অপরকে হরিনাম কীর্ত্তন করান, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনিই প্রকৃত দাতা, তিনিই প্রকৃত দয়ালু, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রচারক, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩-৭৪, ৮৩)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন,—

অবতার কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করে আচার ॥
'আচার'-'প্রচার' নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১০০-১০৩)

জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কুর্ব্বন্ কারয়তে ধর্ম্মং যঃ স ধার্ম্মিক উচ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।১২৬)

যে ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্মযাজন করেন ও অন্যকে ধর্ম্মযাজন করান, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলে।

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, কলিযুগপাবনাবতারী ও মহাবদান্য। তিনি 'তৃণাদপি' শ্লোকে চারিটী বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা সতত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম হরি হইতে অভিন্ন। শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে এবং কৃষ্ণ-জ্ঞান ও কৃষ্ণ-প্রেম দিতে পারেন।

"তৃণাদপি সুনীচ হয়ে কৃষ্ণনাম করতে হবে। 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবটী "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী। কীর্ত্তনকারী ভক্ত নিজকে শ্রীনামের সেবক বলিয়া জানেন। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য এবং প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন।

"শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপক্ষয় ও সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনের অধিকারী হন। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিল রসামৃতসিন্ধু। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে তিনি তাহাতে উদিত হন।

"শ্রীকৃষ্ণনাম অশেষ বাধা-বিঘ্ন-হর। হৃদয়ে যতই কুসংস্কার থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। অবশ্য নামোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধনাম উচ্চারণ হয় না বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ-প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

"কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্বসুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে। কৃষ্ণনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অভিধেয় হউক।

"যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই।

"হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। যে যে-অবস্থায় থাকে থাকুক, সকলের অন্য সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন। একাঙ্গ নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—শ্রীনাম সংকীর্ত্তন। আমাদিগকে নাম-পরায়ণ করবার জন্যই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র গতি বা আশ্রয়। এতদ্ব্যতীত সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি বা চিরশান্তি লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি অষ্টাঙ্গ-যোগ, কি দান, কি যাগ-যজ্ঞ, কি তপস্যা, কি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, কি দেব-দেবীপূজা, কি বিদ্যাদান, কি জনহিতকর কার্য্য, কি বিভিন্ন পুণ্য-কার্য্য, কি দেশসেবা ও জনসেবা কোন কিছুর দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হইতে পারে না। কলিকালে কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় অকুতোভয় এবং অব্যর্থ পন্থা। **The only royal road approved by Sreemad Bhagabat is** নাম-কীর্ত্তন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত **alternate** কিছু আছে, ইহাই তর্কপথ বা অশ্রৌতপথ। তাই শাস্ত্র বলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত উক্ত শ্লোকের অর্থ, যথা—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥

(চৈঃ চৈঃ আদি ১৭।২২-২৫)

সজ্জনবর শ্রীতপন মিশ্র সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাই সেই সে সর্ব্বথা ॥
ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥
চারিযুগে চারিধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতি-তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজধামে চলে ॥
কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন বিপ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩২-১৩৪, ১৩৭-১৪৩)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও বলিয়াছেন,—

ভক্তি সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চৈঃ মধ্য ৬।২৪১)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রণতি

নমি তব পাদপদ্মে শ্রীভক্তিবিনোদ।
গৌরবাণীর মূর্ত্ত তুমি প্রচার-প্রমোদ ॥
যার লাগি' এ জগতে তব আগমন।
মহান্ উদ্দেশ্য সেই হ'য়েছে পূরণ ॥
প্রকাশিলে গৌরধাম-সহ ধামেশ্বরে।
বিনোদিলে ভকতিরে গৌরবাণী-দ্বারে ॥
রচিলে শতেক গ্রন্থ গৌরবাণীময়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

নমি তব শ্রীচরণে বিনোদ ঠাকুর।
জীবের লাগিয়া তব করুণা প্রচুর ॥
ত্রিলোক তারিতে ওহে ভুবনপাবন!
এ মর্ত্ত্যজগতে তব কৃপা-আগমন ॥
বৈকুণ্ঠ-আলোক প্রভু! জগতে প্রকাশি'।
শোধিলে জীবের হৃদি মায়া-তমঃ নাশি' ॥
করিলে সুজনে সবে প্রেমভক্তিময়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

নমি নমি তব পদে, ওহে প্রভুবর!
অতুল তোমার দয়া, করুণা সাগর ॥
ভোগ-মোক্ষ বাঞ্ছা-আদি, জ্ঞান, কর্ম্ম ছার।
প্রতিষ্ঠাশা, কুটিলতা, ছলভক্তি আর ॥
অজ্ঞান-তিমিরে জীব যখন মোহিত।
শুদ্ধভক্তি-রবিকর হ'ল আচ্ছাদিত ॥
হেন সন্ধিক্ষণে প্রভু তোমার উদয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

প্রণমি তোমার পদে পতিতপাবন।
দিব্যজ্ঞানদাতা তুমি অজ্ঞান-নাশন ॥
প্রকাশিলে সুসিদ্ধান্ত শ্রৌত-পরম্পরা।
ভক্তিসুধাকরালোকে স্নিগ্ধ করি' ধরা ॥
প্রবাহিলে প্রেম-ভক্তি পূত-মন্দাকিনী।
অশোক-অভয়ামৃত শুদ্ধ গৌরবাণী ॥
বিদূরিলে কুসিদ্ধান্ত অনর্থ-নিচয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

তব পদে নমি ওহে নদীয়া-প্রকাশ!
শ্রীধাম-বৈভবে তব একান্ত উল্লাস ॥
সহিলে যাতনা শত প্রিয়-সেবা তরে।
বরিলে অশেষ বাধা সানন্দ অন্তরে ॥
প্রচারিলে গৌরনাম, গৌরকামসেবা।
প্রকাশিলে গৌরধাম জগমনোলোভা ॥
গৌর-সরস্বতী-ধনে করিলে উদয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

তব পাদপদ্মে দেব করি' হে প্রণতি।
অমায়ায় কর কৃপা, দাসের মিনতি ॥
চির ক্রীতদাস করি' রাখ' শ্রীচরণে।
ভকতিবিনোদধারা-পীযূষ-প্রদানে ॥
হউক বসতি নিত্যপ্রিয় গৌরধামে।
থাকুক অচলা-মতি গৌরনাম-গানে ॥
বৈষ্ণবেতে প্রীতি দাও ওহে দয়াময়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয় ॥

কৃপাভিক্ষু—

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য

(বর্ষারম্ভে অর্ঘ্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কর্ত্তৃক বর্ণিত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিতপ্রধান শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের দোষ-বর্ণনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাণীর বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে মায়াবাদভাষ্যের মিথ্যাত্ব ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধত্ব উপলব্ধ হয়।—

প্রভু কহে,—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই,—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সা অভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ (হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

বঙ্গানুবাদ—যে যে শ্রুতি ভগবদ্বস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ স্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥
(ঐ ৩।১৯)

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ (ঐ ৬।৮)

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।
(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।১)

'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥
স ঐক্ষত। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৫)
সেই কালে নাহিক জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

বঙ্গানুবাদ—নন্দগোপ ও ব্রজবাসিদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

'অপাণি-পাদ'—শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে -ব্রহ্ম-সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি জীবশক্তি; (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা—শক্তির নাম 'মায়া'।

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

অনুবাদ—ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল তাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করে। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

*　　*　　*

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস॥

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥
গীতা-শাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে॥
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী আমারই অপরাশক্তির বৃত্তিবিশেষ।

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল-জগৎ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ-জগৎ। এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া'; ইহার নাম 'মায়া-প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
'পরিণাম'-বাদ—ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি,—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি॥

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য॥
*　　*　　*
ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয়।
প্রেম—'প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কিছু কহে, সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করিয়ে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্ম পুঃ উত্তরখণ্ড ৬২।৩১)

অনুবাদ—ভগবান্ মহাদেবকে কহিলেন—কল্পিত মায়াবাদদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥ (ঐ ২৫।৭)

অনুবাদ—মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি (আচার্য্যশঙ্কর) ধারণ করিয়া অসচ্ছাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত এই সত্যকেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অনাদর করত অনেকেই বিপথগামী হইয়া সত্যভ্রষ্ট হইতেছেন - ইহাই ভগবন্মায়া। বেদ-বেদান্তাদির সারশিক্ষা কবিরাজ মহাশয়-কর্ত্তৃক অতি সুন্দররূপে, সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইলেও মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা বিবর্ত্তবাদ হইতে আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-গণকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতেছে না—ইহাই ভগবদ্ভক্ত শঙ্করের অসামান্য নৈপুণ্য। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ স্বকীয় উক্তিতেই পরিচিত—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ইহাকে নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদও বলা হয়। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য বেদ স্বীকার করিলেও বেদের সামগ্রিক বিচার গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার কুসিদ্ধান্তের অনুকূল বাক্যগুলিকেই অবলম্বন করত অন্যায়রূপে তাহাদিগকে মহাবাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ একদেশিক বাক্যগুলির সামঞ্জস্য প্রকাশ না করিয়া তাহাদিগকে স্বমতের পোষকরূপে প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ তাঁহার ঐ চতুরতা উদ্ঘাটিত করত ঐ একদেশিক বাক্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য

জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সোঽহং', 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যগুলি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাচক নহে, ইহারা সবিশেষ ব্রহ্মবাচক। এইগুলিই তাঁহার অপ্রাকৃত শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাতে কোন প্রাকৃত বা মায়িক সংশ্রব নাই, ইহাই সুষ্ঠুভাবে বিচারিত হইয়া ব্রহ্মকে প্রেমময়রূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই কারণেই আচার্য্য শঙ্করের এই অসুরমোহন সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করত প্রকৃত সত্য বিচার করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদের স্ব স্ব বিচারও সুষ্ঠুতা লাভ করিতে না পারায় আপাত দৃষ্টিতে মতানৈক্য বোধ হইলেও তাহা অনৈক্য নহে, পরন্তু কিঞ্চিৎ অসম্যকতাহেতু ভিন্নাকার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অসম্পূর্ণতা পূর্ণায়িত করত তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বরূপ সিদ্ধান্তে চিন্ময় মাধুর্য্য ব্রজপ্রেমের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করত বেদের চরম ও পরম গোপ্য শিক্ষা আচরণমুখে প্রকাশিত করিয়া অনন্ত চিদচিৎ বিশ্বকে ধন্য করত মহাবদান্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন।—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদকন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আরতি দর্শন

জয় জয় গুরুদেব আরতি দর্শন।
যাঁহার দর্শনে হরে অবিদ্যা-বন্ধন॥
বিনোদ কুঞ্জেতে নিত্য তোমার সেবন।
সৌন্দর্য্যে মোহিত যত ভক্ত-অলিগণ॥
ভকতি-বেদান্ত-রসে সিদ্ধ যত জন।
রাধা-প্রিয়জন জেনে করে আরাধন॥

গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপ করিয়া অর্পণ।
শঙ্খজল-বস্ত্র দেয় প্রীতির কারণ॥
কুসুম-অঞ্জলি কৈল, চামর-ব্যজন।
শঙ্খ-ঘণ্টা-নাদে করায় আনন্দিত মন॥
ঝাঁঝর-কাঁসর বাজে, বাজে করতাল।
বৃহৎ-মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
ভক্তগণ নাচে, গায় করেন কীর্ত্তন।
তোমার মহিমা-গুণ করে বিতরণ॥
সুচারু বদন শোভে হাসিত লোচন।
তিলফুল-জিনি নাসা সুস্মিত বদন॥
কনক-জিনিয়া অঙ্গ অরুণ-বসন।
আজানুলম্বিত বাহু ভাবে বিভূষণ॥
সুগন্ধ-ধূপের গুণে জগতে বন্দন।
জ্ঞান-রূপ দীপ-শিখায় দুরিত-খণ্ডন॥
শঙ্খজল কৃপা-দৃষ্ট্যে যাহারে বর্ষণ।
গুণময় চিত্তগুহা সবারে শোধন॥
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বস্ত্র যাঁহাকে পরান।
ভকতি-কুসুম-বৃক্ষ হৃদয়ে রোপণ॥
বায়ুরূপে অনুকূল যাহে হইলেন।
মোহমায়া-ভবসিন্ধু পার করিলেন॥
শঙ্খনাদ-শব্দব্রহ্ম করাল শ্রবণ।
কৃষ্ণের চরণসীধু পায় সেইক্ষণ॥
প্রেমেতে পূরিল ভক্ত তোমার দর্শন।
কৃষ্ণ-মনোবাঞ্ছা পূরে গায় দাসগণ॥
এইরূপ আরতি সে কুঞ্জের দর্শন।
ভক্ত-সঙ্গেতে আরতি গায় প্রিয়জন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপোপদেশ অবলম্বনে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বিচার দুই প্রকার—শ্রেয়ঃপর ও প্রেয়ঃপর। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ আমাদের সম্মুখে পাশাপাশি রহিয়াছে। যে পথ অবলম্বন করিলে আমরা শ্রেয় বস্তু লাভ করিতে পারি, তাহা শ্রেয়ের পথ; আর যে পথে আমরা প্রেয় প্রাপ্ত হই, তাহা প্রেয়ের পথ। শ্রেয়ের অনুসন্ধানই আমাদের প্রয়োজনীয়। প্রেয়ঃ অতি সুলভ; কিন্তু শ্রেয়ঃ সহজলভ্য নহে। শ্রেয়ের কথা অনেক সময় প্রেয়ের ন্যায় রুচিকর না হইতেও পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর।

যাহা আপাততঃ রুচিকর না হইলেও পরিণাম সুখপ্রদ, তাহা শ্রেয়ঃ। আর যাহা আপাততঃ রুচিকর বা মনোরম, কিন্তু পরিণাম দুঃখকর, তাহাই প্রেয়ঃ। যাহাতে আমাদের বাস্তবিক সুবিধা হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ। আমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহাই প্রেয়ঃ, আর যাহাতে আমাদের ভাল হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ।

অপরিণামদর্শী অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা আপাতমধুর আহার-বিহাররূপ প্রেয়তে মত্ত থাকিয়া দুঃখই লাভ করি। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহারা জগতের সকল বস্তু বা সুখ-সুবিধা ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য জানিয়া অশোক-অভয় অমৃতের আধার নিত্যানন্দবস্তু শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তিরূপ শ্রেয়ের অনুসন্ধান করত তদ্‌বিষয়ে যত্নপর হন। শ্রুতিতে দেখা যায়, শ্রীযমরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥
(কঠোপনিষৎ ১।২।২)

[শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটী মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তি উভয়ের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া একটী মুক্তির কারণ ও অপরটী বন্ধনের কারণ বিবেচনা করত প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন। আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি তিনি আপাতমধুর আহার-বিহারাদি সুখকে বড় মনে করিয়া তজ্জন্য বিষয় সংগ্রহ ও তৎসংরক্ষণাদিতে ব্যস্ত থাকেন।]

মানুষের রুচি রকম রকম। যিনি যেরূপ পরিবেশে বা সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত, তাঁহার অনেকটা সেইরূপ ভাবই ভাল লাগে। তাহার বিরুদ্ধ কথা হইলে বড়ই বিরুদ্ধ অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদ্ভুত মনে হয় বা ভাল লাগে না। শ্রোতা বা পাঠক অধিকাংশ-

স্থলেই মনে করেন—আমি যাহা ভালবাসি বক্তার মুখ হইতে বা লেখকের লেখনী হইতে তাহাই বহির্গত হউক। কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্যকথাই আমি শ্রবণ করিব।

আমরা যদি মঙ্গল চাই তাহা হইলে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। আমরা যদি আত্মকল্যাণ, নিত্যকল্যাণ বা বাস্তব সুখের প্রার্থী হই, তাহা হইলে নিজের যাবতীয় ক্ষুদ্র চিন্তাধারা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধুগুরুর নিকট শাস্ত্র-প্রতিপাদিত শ্রেয়ের কথা ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব। তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী ভোগসুখরূপ প্রেয়ের দিকে ধাবিত হইব না। শাস্ত্রের কথা —শ্রেয়ের কথা আপাততঃ প্রীতিপ্রদ না হইলেও তাহাই ধীর স্থির চিত্তে শ্রবণ করত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতবাণীই গ্রহণ করিব। শ্রুতি বলেন,—

"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

(মুণ্ডক উপনিষৎ ১।২।১২)

ভগবদ্বস্তু লাভ করিবার জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উপহারহস্তে (অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি লইয়া) বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবেরই আশ্রয় করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন ব্যক্তি বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ ভগবন্নিষ্ঠা-পরায়ণ ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট নিষ্কাম শান্ত গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

সাধু-গুরু-শাস্ত্র প্রকৃত মঙ্গলরূপ শ্রেয়-কথারই কীর্ত্তনকারী। তাঁহারা আপাতঃ-রুচিকর মনযোগান কথা বলিয়া লোককে বঞ্চনা করেন না। তাঁহারা আমাদের নিষ্কপট বান্ধব। তাঁহারা নিখুঁত সত্য কথা—বাস্তব কল্যাণের কথা কীর্ত্তন করেন।

জগতে অধিকাংশই শ্রেয়োবিমুখ। জগতের জনগণ লোকপ্রিয়তার অনিসন্ধিৎসু, বাস্তব সত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া জাহির করিতেছেন, তাঁহারা মানুষের অপ্রিয় হইবার ভয়ে সকলের মন রক্ষা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য ব্যস্ত। সত্যকথা বলিলে ও সত্যকথা—শ্রেয়ের কথা শুনিলে লোকপ্রিয়তার (Popularity) পরিচর্য্যা করা যায় না। এজন্য আমরা বহির্ম্মুখ গণমতের Support (সহানুভূতি) চাই না।

গুরু কখনও প্রেয়ঃপন্থী স্বীকার করেন না, তিনি শ্রেয়ঃপন্থী। তাঁহার গুরুর

নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—'গুরুদেব, আমি মদ খাইতে চাই।' গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময় গুরু করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়লাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা। আর একশ্রেণীর মধ্যে একটা ফ্যাসন্।

লোকের নিকটে 'নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিলে, পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়—এই ভয়ে আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক—নাস্তিক হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয় বা চরম কল্যাণের জন্য যত্ন করিবেন। আহার-বিহারাদি বিষয় সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে।

আমাদের যে কোন জন্ম হউক না কেন, আহার-বিহারাদি বিষয়লাভ প্রত্যেক জন্মেই হইবে। মনুষ্য না হইলেও বিষয় সব জন্মেই পাওয়া যাইবে। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

মনোধর্ম্ম ও স্বরূপতত্ত্ব

বদ্ধজীবের মন স্বয়ং অনাত্মবস্তু হওয়ায় সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং রূপ-রসাদি অনাত্ম-বিষয়সংগ্রহে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বক্ষণই পরিচালিত করিবার জন্য ব্যগ্র, ফলস্বরূপে আত্মার আনুকূল্যসাধনে পরাঙ্মুখ থাকিতে বাধ্য হয়। মনকে নিগৃহীত না করিতে পারিলে জীবের স্বরূপোপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত —এই ষোড়শ কলার মধ্যে মন প্রধান। মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বশে শুভাশুভ কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া সংসারের মধ্যে নানা যোনিতে নিক্ষেপ করে এবং সংসারে সহস্র সহস্র সুখদুঃখের সৃষ্টি করে। যাবৎ জীবের মন সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের অধীন থাকে, তাবৎ তাহার মন ভগবৎসেবাবৈমুখ্যরূপ ভোগে আচ্ছন্ন হইয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা পাপ, পুণ্য ও মিশ্রকর্ম্মের বিস্তার করে। প্রাকৃত কর্ম্মসমূহকে জীব কারণরূপ মনের কার্য্য বা ফল বলিয়া ভুল করে। কখনও মনুষ্য, কখনও দেবতা, কখনও রাজা, কখনও ধনপতি, কখনও বিদ্বন্মন্যাভিমান সেই বদ্ধজীবকে গ্রাস করে। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ, তথা বন্ধ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত মন ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় অভিনিবিষ্ট হইলে আত্মার অপ্রাকৃত অনুভূতি সেইকালে বিস্মৃত হয়। জগতের ভোগী বা জগৎ হইতে ত্যাগী হইবার প্রবৃত্তি জীবকে আত্মবিস্মৃত করাইয়া কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটায়, ইহাই মনোধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের বশেই জীব লোক-ব্যবহারকে বহুমানন করিয়া থাকে। বহুজন্মের সংস্কার-বিশিষ্ট মন সর্ব্বজীবেরই রহিয়াছে। মনোমধ্যে সকল জড়বিষয়েরই স্মরণ ও বিস্মরণ হইয়া থাকে। নিদ্রাদোষে যেরূপ পর্ব্বতোপরি সমুদ্র, দিবসে নক্ষত্র প্রভৃতি অসম্ভব বিস্ময়াদির প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কখন কখন অদৃষ্ট, অশ্রুত বিষয়ও মনোমধ্যে উদিত হয়। বদ্ধজীবের মন সঙ্কল্প ও বিকল্পের অধিনায়ক। রাগ ও দ্বেষ, প্রণয় ও বিরোধ সকলই মনের ধর্ম্ম। দুর্জ্জয় মনই মানবের ক্লেশের কারণ হইয়া শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ইত্যাদি হইবার বিচার করিয়া থাকে।

মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম কখনও সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। ছায়া বা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেরূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হয় না, তদ্রূপ মনোধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম বলিয়া কোন শাস্ত্রই স্বীকার করেন না। প্রতিফলিত প্রতিবিম্বসদৃশ মনোধর্ম্ম কখনও জীবের

আত্মমঙ্গল বিধান করিতে পারে না। কারণ মনোধর্ম্ম বাস্তব বস্তুকে কোন সময়ে অনুকূল ও কোন সময়ে প্রতিকূল ধারণা করিয়া থাকে এবং অবাস্তব প্রতীতিতে বাস্তববস্তুর সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া জীবের চরম সর্ব্বনাশ করে। জড়ধ্যান-মনেরই ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ না শুদ্ধ চিন্ময় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। জড়ধ্যানের ধ্যাতা ও ভোগময় ব্যাপারের বক্তা ভদ্রাভদ্রবিচার-সুনিপুণ হইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে। জীবাত্মার কোনও অচিদ্বৃত্তি বা মায়ার ধর্ম্ম নাই। আত্মার নিত্যধর্ম্ম সুপ্ত হইলে মনই অণুজীবাত্মার বিকৃতিযোগ্যতা লাভ করে। এইক্ষেত্রে অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে ভগবৎসেবা-রহিত ব্যক্তিগণ জড়বিচিত্রতা ও জড়বৈশিষ্ট্যের আদর করিয়া থাকেন। জীবাত্মা-স্বরূপে কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাস-মনের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব ভ্রম॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

উপরিউক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর সত্য নিত্যই বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজের মঙ্গল বা অমঙ্গল নির্ণয় প্রভৃতি সকলই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া জীবের ভোক্তৃ-অভিমানে অক্ষজ-জ্ঞানে ভাল-মন্দের বিচারচেষ্টা নানাপ্রকার ভ্রম উৎপাদন করে।"

মনোধর্ম্ম কখনও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না

বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম বা জনসেবা তথা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে-সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড় আদরের ও ধর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে, তাহা নাস্তিক ভোগী সম্প্রদায়ের কৈতবপূর্ণ অক্ষজ ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র। তাহাতে ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা ব্যতীত ভগবানের সেবার লেশমাত্র নাই। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়", "যত মত তত পথ" প্রভৃতি নাম দিয়া ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ নাস্তিক সম্প্রদায় মনঃকল্পিত মত বা মনোধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া নিজেরাও বঞ্চিত হইতেছেন এবং অপরকেও বঞ্চিত করিতেছেন। মনোধর্ম্ম কখনও পরমধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম নহে, উহা বাস্তব সত্য হইতে কোটী কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ"—অসংখ্য লোকের অসংখ্য মনের খেয়াল বা রুচি। লোকের মনের

খেয়ালে যে মত ও পথের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা কখনও আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। আত্মধর্ম্ম বাদ দিয়া অন্যান্য ধর্ম্মমত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী মানবগণ ঐ সকল প্রেয়ঃ মত ও প্রেয়ঃপথকেই মত ও পথ বলিয়া বরণ করেন।

অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরিতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেবাই জীব-মাত্রের পরমধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। তদ্দ্বারাই আত্মা সন্তুষ্ট লাভ করেন। আত্মধর্ম্মই একমাত্র কৈতবশূন্য শ্রৌতধর্ম্ম এবং ইহা কোন মানুষের সৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের মধ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সনাতন ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার মানবজ্ঞানোত্থ ধর্ম্মে কাল্পনিক চিত্র ও কৈতব (বঞ্চনা) নিহিত আছে। ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল আত্মধর্ম্মই একমাত্র প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম, তাহা নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত ও আচরিত সনাতন—শ্রৌতধর্ম্ম। আজকাল যে-সব ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে, তাহা মানবকল্পিত বা মানব-মনঃসৃষ্ট মনোধর্ম্ম মাত্র—আত্মধর্ম্ম নহে। আত্মধর্ম্ম নিত্যবস্তু। আত্মা নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য ও ভগবৎপ্রণীত। দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত আর কেহই সেই ধর্ম্মের কথা জানেন না। অতএব ধর্ম্ম মানুষের সৃষ্ট কি করিয়া হইবে ?"

আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মনোধর্ম্মের বশীভূত নহেন

প্রাকৃত মন সর্ব্বদাই ভোগপরবশ, কখনও কখনও বা জড়ত্যাগ-পরবশ। জড়ভোগ ও জড়ত্যাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মনের অধীন ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে স্তব্ধ করিতে হয়। মন বশীভূত হইলে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। মনঃ-কল্পিত মতবাদ বা মনোধর্ম্ম মনকে বিচলিত করে। বহির্বস্তুসমূহদ্বারা সংসার-তাপের মূল দুর্জ্জয় মনকে জয় করা সম্ভবপর নহে। মহাশত্রু মন অবাস্তব হইলেও ইহার প্রভাব অসামান্য। ইহাকে দমন না করিলে ইহা আত্মস্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে। 'আমি কৃষ্ণদাস', 'কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম'—এই কথা জীব একেবারেই ভুলিয়া যায় এবং বিষয়-সেবাতেই নিমগ্ন হয়। একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণসেবারূপ নিশ্চিত খড়্গই মন তথা মনোধর্ম্ম মহাশত্রু-সংহার করিতে সমর্থ। সাধনাদি যাহা কিছু আছে, তাহা মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। ভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ।" মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই আত্মবৃত্তি বিকাশলাভ করে। আত্মার হরিভজন-বিচার ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ হইলেই

তাহা মনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করায়। মনের গতিকে নিজ ভোগের পথে চালনা না করিয়া নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিলেই আনুষঙ্গিকক্রমে মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া জীবের মঙ্গল হয়।

ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পরমপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধ মন। শুদ্ধ মন ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে না। ভগবৎপ্রীতিই আত্মধর্ম্ম। আত্মা—অজ। আত্মার বৃত্তি ভোগ বা ত্যাগ চাওয়া নয়, 'দেহী' 'দেহী' মনোধর্ম্মের কথা আত্মায় নাই। পরতত্ত্বের সুখকামনাই আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা মনোনিগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা "বকের চক্ষে ঘি চালিয়া বক ধরিবার চেষ্টার" ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাত্মা ন শাম্যতি॥ (ভাঃ ১।৬।১৬)

"মুকুন্দসেবাদ্বারা অনুক্ষণ কামাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।" ভাগবতের (১১।২৯।২) "প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ" শ্লোকেও পাওয়া যায়, "যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনো-নিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন, কারণ তদ্দ্বারা তাহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।"

বদ্ধজীবের বদ্ধ মনোবৃত্তি হইতে জাত প্রাপ্য-চতুর্ব্বর্গকে প্রয়োজন বলিয়া ভ্রান্তি-মূলে যে বিচার আছে, তাহা ভক্তিপ্রভাবেই সংশোধিত হয়। তখন জীব কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। আত্মার ভূমিকায়ই প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের ক্রিয়া। মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না। তাই আত্মধর্ম্ম ব্যতীত জীবের কল্যাণের আর কোন দ্বিতীয় পন্থা থাকা সম্ভবপর নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

স্বরাট্, ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্

স্বয়ং ভগবান্ কে? যাঁহার ভগবত্তার স্বীকৃতির জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না, যিনি নিজেই নিজের ভগবত্তায় পরিপূর্ণ, যিনি অসমোর্দ্ধ্ব—অর্থাৎ যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই; এ কারণে তিনি স্বরাট্ বা সকলের ঈশ্বর বা পরমেশ্বর এবং যিনি ইচ্ছাময়; অর্থাৎ তিনি যেমন ইচ্ছা করেন নিজ যোগমায়া শক্তিবলে তেমনই করিতে সমর্থ—"কর্ত্তুম্, অকর্ত্তুম্, অন্যথাকর্ত্তুম্"। পরিদৃশ্যমান চিৎ, অচিৎজগতের সকল কিছুর অস্তিত্ব যাঁহার উপর নির্ভর করে, তিনি যাহাকে যেমন শক্তি, যেমন বুদ্ধি দান করেন, তাঁহারই ইচ্ছা, বুদ্ধি ও শক্তিবলে অন্যান্য সকলেই কেবলমাত্র ততটুকুই করিতে সমর্থ হন। যাঁহা হইতে সকল কিছুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, সকল কিছুর অস্তিত্বের অবশেষে একমাত্র যিনি বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই স্বয়ং-ভগবান্—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ ইচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছাশক্তিবলে ইচ্ছা করেন এবং ক্রিয়া-শক্তিবলে সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মাকে মোহগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা ক'রলেন এবং ব্রহ্মাদ্বারা সখা ও গো-বৎসগণকে হরণ করাইলেন। কেন তাহা করাইলেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার সকল সময়ে এই 'কেন'—ইহার উত্তর মিলিবে না; কারণ তিনি স্বরাট্ ইচ্ছাময়। তথাপি এখানে ব্রহ্মাকে মোহগ্রস্ত করিবার পিছনে কিছু কারণ আছে। তাঁহার সখাগণ সকলেই ব্রজগোপীগণের সন্তান, কিন্তু গোপীগণের নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অধিক। তাঁহাদের সকলের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা,—প্রত্যেকেই সাক্ষাৎভাবে মা-যশোদার ন্যায় কৃষ্ণকে সেবা করিবার। যদিও সখাগণ প্রত্যেকেই কৃষ্ণেরই অংশ, তথাপি মাতৃগণ নিজ নিজ সন্তান হইলেও অংশের সেবায় পরিতৃপ্ত নহেন। এ-কারণে নিজ সন্তান অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ তাঁহাদের অধিক। পূর্ণতম কৃষ্ণের সাক্ষাৎভাবে সেবা করিবার বাসনা ব্রজ-মাতৃবৃন্দের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবাসিনী-মাতৃবর্গের সেই বাসনার পরিপূর্ত্তি ঘটাইবার ইচ্ছা করিলেন। ফলে ব্রহ্মাকে মোহগ্রস্ত করিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মার অহংকার জাগিল এবং কৃষ্ণকে গোপশিশু মনে করিলেন। আবার ব্রহ্মার মনে সংশয়ও সৃষ্টি হইল,—যে কৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিলেন, সেই কৃষ্ণ কিভাবে পুলিন-ভোজনে সখাগণের সঙ্গে বসিয়া সাধারণ বালকের

ন্যায় আহার করিতে পারেন ? ইহা তাঁহার নিকট বিস্ময় বোধ হইল। ফলে তিনি কৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং গো-বৎস ও সখাগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন।

স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং-ভগবান্ নিজেই পূর্ণভাবে নিজ যোগমায়া-শক্তিবলে সখা ও গো-বৎসরূপে প্রকটিত হইয়া এক বৎসর-কাল বিলাস করিতে লাগিলেন। ব্রজমায়েরা বা গো-মাতাগণ কেহই এই এক বৎসরে জানিতে পারিলেন না যে, এ'গুলি তাঁহাদের সেই সন্তান নহে। অধিকন্তু নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষা কৃষ্ণের পূর্ণরূপে প্রকটিত এই সন্তানগুলির প্রতি তাঁহারা কৃষ্ণের মতই আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। এ'বার নিজ নিজ সন্তানগণকে লালন-পালন করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণসেবার ন্যায় সুখ বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকের সন্তানই এক একজন পূর্ণ-কৃষ্ণ। সুতরাং তাঁহারা পূর্ণ-কৃষ্ণের সেবার আনন্দ নিজ-সন্তান-সেবার মধ্যে অনুভব করিলেন। স্বরাট্ ইচ্ছাময়ের কি অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস! এইভাবে এক বৎসর ধরিয়া ব্রজবাসিনী-মাতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিল।

ব্রহ্মা এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ এক বৎসর পূর্ব্বে সখা ও গোবৎস লইয়া যেরূপভাবে লীলা করিতেছিলেন, এক বৎসর পরেও সখা ও গো-বৎস লইয়া ঠিক একইভাবে লীলা করিতেছেন। আবার যেখানে তিনি সখা ও গো-বৎসদের লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাহারা তেমনই আছে। তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বৃন্দাবনেও সখা-গোবৎসসহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব ?

স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার মধ্যে যে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মুখে 'ব্রহ্ম-বিমোহন-লীলা' প্রকাশিত করিলেন, যাহাতে ব্রহ্মা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রজ্ঞানে মোহিত হইয়া গেলেন। যে ভগবান্ সর্ব্বসমর্থ, তিনি এইবার কি লীলা ব্রহ্মাকে দর্শন করাইলেন ?

"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ,"—শুকদেব-বাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি॥
এক এক গোপ করে যে বৎস-চারণ।
কোটী অর্ব্বুদ পদ্ম-শঙ্খ তাহার গণন॥
বেণু-বেত্র-দল-শৃঙ্গ-বস্ত্র-অলঙ্কার।
গোপগণের যত—তার নাহি লেখা পার॥ **(ক্রমশঃ)**

— শ্রীমতী মায়া সরকার

———

শ্রীপত্রিকার নববর্ষ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীপত্রিকার সেবা-সঙ্কল্প

বিগত ষট্-চত্বারিংশ বর্ষকাল শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের সেবা করিয়া শ্রীপত্রিকা অদ্য নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের শিক্ষামৃত যাঁহাদের বিশেষ রুচিকর, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্যই আমরা সর্ব্বদা ব্যগ্র। দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক গৌড়ীয় গুরুবর্গ ও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথে শ্রীপত্রিকা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের সুষ্ঠু সেবা-বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-পথত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মীর প্রাকৃত কর্ম্মলাভ-চেষ্টা, জ্ঞানীর নৈষ্কর্ম্ম্যের অহমিকা ও ভক্তের কর্ম্ম-জ্ঞানাগ্রহিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও কর্ম্ম-জ্ঞানাবরণমুক্ত হইয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত ভক্তিবৃত্তি ব্যাপ্তি লাভ করে। আবার পরম চমৎকারিতাপূর্ণ মধুর রসের অধিকারীর নানারূপ বিঘ্ন ঘটাইয়া শুদ্ধাশুদ্ধভেদে শ্রদ্ধা ও রতির তারতম্যে আমাদের ভক্তিপথে অনেক সময় নানাপ্রকার অশুদ্ধতারূপ কণ্টক আরোপিত হয়। মৎসর-সম্প্রদায় ও আনুকরণিক-দলের বৃথা বাগাড়ম্বর ও কপটতাপূর্ণ চেষ্টার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মের আরাধ্যদেব অধোক্ষজ শ্রীগৌর-নৃসিংহ ভাগ্যবন্ত জনগণের হৃদয়াকাশে প্রকটিত হইয়া সাধন-ভজন-পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তিরূপ কণ্টক বিদূরিত করেন, ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট মানবজাতির আত্মকল্যাণ-চিন্তা

গৌড়ীয়াশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের আচার-ব্যবহার, ভাষা, রুচি, নীতি-আদর্শ, ধর্ম্ম-বিশ্বাসাদি সজ্জন ও শাস্ত্রানুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। গৌড়ীয়ের আদর্শের সহিত অগৌড়ীয়গণের কোনরূপ বিরোধ থাকা উচিত নয়, কারণ তাঁহারাও একদিন শুদ্ধ গৌড়ীয়ের বিচারধারায় অনুপ্রাণিত হইবেন। গৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত হইয়াছিল। একদিন সকলেই প্রেমধর্ম্মের উপাসক হইয়া মিলিয়া-মিশিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসমান হইয়াছিল। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মবৈরিতা, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—ষড়্‌রিপুর প্রাবল্য স্বাভাবিকভাবেই অবদমিত হইয়া প্রেম-বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমাদের সামগ্রিক দুর্গতিতেই পরস্পরের আচার-ব্যবহারে বৈষম্য ঘটিয়াছে। পুনরায় প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, অপরের অপকার ও অনিষ্ট-চিন্তা

হইতে বিরত হইলে আমাদের আর অভাব-অভিযোগ, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-শোকরূপ অশান্তি থাকিবে না। প্রেমময় শ্রীভগবানের সেবার অভাবই আমাদিগকে আজ বিপথে লইয়া যাইতেছে। আমরা পুনরায় আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বৈব মঙ্গল ও আত্যন্তিক কল্যাণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাসমন্বয়-বাণীই বাস্তবশান্তি-লাভের একমাত্র উপায়

আমাদের বাস্তব মঙ্গলের উপায় জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে হৃদয়ের সহজ-সরল ভাব লইয়া মনে-প্রাণে মূল বাস্তব নীতি-আদর্শকে আদর ও গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তরিকভাবে উহা গ্রহণ করিলে অন্তর-বাহিরে সম-ব্যবহারের কোনরূপ কার্পণ্য বা অভাব হইবে না। গৌড়ীয়-অগৌড়ীয় সকলের জন্য প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে মহাসমন্বয়-বাণী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক অনুগমন ও অনুসরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। যতদিন না আমরা নিজ নিজ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রচেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌরহরির প্রেম-সৌন্দর্য্য অনুসরণ না করি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোনরূপ বাস্তব মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা বাহ্যজগতের উপকার বা সেবা-প্রবৃত্তিই আমাদিগকে প্রেমরাজ্য হইতে সুদূরে নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম-প্রেমময়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের সর্ব্বৈব মঙ্গল। ইহাই আমাদের বাস্তব সুখ-শান্তি।

দেবতান্তর উপাসনায় আত্যন্তিক কল্যাণ-লাভ অসম্ভব

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ কখনই স্বতন্ত্রভাবে আধিকারিক দেব-দেবীর পূজা বা দেবতান্তর উপাসনা করেন না। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহুদিন যাবৎ দেব-দেবীর পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানারূপ অভাবগ্রস্থ হইয়া বিবিধ কামনা-বাসনার আবাহন করেন। ব্যবহারিক ও লৌকিক কামনা-বাসনাদ্বারা দেব-দেবীর নিকট হইতে যে কর্ম্মফল লাভ হয়, বদ্ধাবস্থায় তাহাই স্থূল-সূক্ষ্মভাবে ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা তাদৃশ, কর্ম্মফলভোগী নহেন। ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা মায়াসেবা-নিরত, তাহারা ইতর কামনার হস্ত হইতে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। বিষ্ণুপূজাদ্বারা জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, কিন্তু মায়িক দেবতান্তরের পূজার দ্বারা অনিত্য দেব-লোক, পিতৃলোক প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুমায়া বদ্ধজীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া, তাহাদের প্রাকৃত গুণাত্মক অভিমান প্রবল হইলে নিজেদের বৈষ্ণব অভিমান বিস্মৃত হন। শ্রীভগবানে প্রপত্তিলাভ করিলেই তাহাদের মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার অবসর হয়।

সমাজবদ্ধ মানবগণ কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে বহুভাগে বিভক্ত

এ সংসারে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে পরস্পরের সুবিধার জন্য সামাজিক আইন-কানুন অবশ্যই মানিয়া চলিতে হয়। যাহারা সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীনতা স্বীকার করেন না, তাহারা পাপাচারী। পাপিষ্ঠ অসামাজিক-গণকে সংশোধনের জন্য সমাজ দণ্ড বিধান করেন। তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া সমাজের অহিত-সাধনেই তৎপর হন। একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচার-আচরণ ও ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া সমাজ বহুভাগে বিভক্ত, দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ-বিচারে, সামাজিকগণ বিধি-নিষেধ অনুবর্ত্তন করিয়া পরস্পর সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াই বাস করেন। তথাপি ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম্মভেদে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের এই বিশাল ভারতভূমিতেও বিভিন্ন সমাজ পরিলক্ষিত হয়।

পারমার্থিক সমাজ পরমোপাস্য শ্রীভগবানেরই একান্ত আশ্রিত

সমাজগুলির মধ্যে লৌকিক-ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক উভয় সমাজই বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কয়েকটী সমাজ কেবল পারমার্থিক আচার-বিচার ও নীতি-আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণদেশে শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সমাজ এবং পশ্চিম-ভারতে মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত তত্ত্ববাদিগণের সমাজও স্বতন্ত্র। এইরূপ চারিটী পারমার্থিক সম্প্রদায়ে ভারতবর্ষে ৪।৫ কোটী বৈষ্ণব বাস করেন। ইঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের উপাসক। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দার্শনিক ও আচারগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে এবং ইঁহারা বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া স্ব-স্ব অনুশাসন-অনুসারে সাধন-ভজন করিতেছেন।

জাতি-গোস্বামিগণ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজের আনুগত্যকারী

আমাদের বাংলার বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে, মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদনুগত গৌড়ীয়-গোস্বামীবর্গ তাঁহাদের নিজস্ব শাস্ত্রীয় আচরণ-দ্বারা প্রচারাদি করিয়াছেন। যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে প্রভু সন্তান বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়াচার্য্য' সাজিয়া বংশানুক্রমে 'গোস্বামী' উপাধি চালাইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়ের বিচারধারা অবলম্বন না করায় অগৌড়ীয় বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। এইরূপ তথাকথিত আচার্য্যগণ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকাদি সাত্বত-স্মৃতির বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সমাজের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহারা শুদ্ধাচার-বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অসদাচারী 'সংযোগী-বৈষ্ণব' নামে বৈষ্ণব-সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আউল, বাউল, সহজিয়া, বাবাজী শ্রেণীও উহাদের অনুবর্ত্তন করিতেছেন।

স্মার্ত্ত-পদাবলেহী প্রভু-সন্তানগণ অগৌড়ীয় ও অবৈষ্ণব

এই সুযোগে স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনীয় সমাজও সুবিধাবাদী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে নির্য্যাতন করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক সদাচার পরিত্যাগ করাইয়া স্মার্ত্তানুশাসন গ্রহণে বাধ্য করিতেছেন। শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জানেন, শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ গোস্বামীই বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চিরকুমার থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার লৌকিক বা জাগতিক বংশ বলিয়া কিছুই হইতে পারে না। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অন্যান্য পুত্রগণ অবৈষ্ণব থাকায় তাঁহাদের অবৈষ্ণব-বংশ বলিয়া পরিচিতি। যদি সেই বংশে কেহ বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিয়া পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ হন, তবে সেই ব্যক্তিবিশেষকে 'গোস্বামী' বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি নাই। প্রকাশ থাকে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র নব্যস্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্বীয় শিষ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রপৌত্র) তাঁহার প্রপিতামহের কুশপুত্তলিকা দাহান্তে স্বীয় প্রবর্ত্তিত স্মার্ত্তবিধি অনুসারে পুনরায় শ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ এইরূপে সকলকে পারমার্থিক সদাচার-পালনে চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং স্মার্ত্ত সমাজের অধীন থাকিয়া কেহই কখনও পারমার্থিক আচার-নিষ্ঠা সংরক্ষণ করিতে পারেন না বা তাঁহারা 'শুদ্ধবৈষ্ণব—গৌড়ীয়' বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। তাঁহাদের কপটতা ও ধৃষ্টতা তাঁহাদিগকে 'অগৌড়ীয়' করিয়া নির্দ্দেশ করেন, স্মার্ত্ত-বিচারের বহুমাননকারী কখনই শুদ্ধভক্তি-পথাশ্রয়ী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্যের অভাবে বহ্বীশ্বরবাদী প্রাকৃত-সহজিয়াদির উৎপত্তি

দশ-নামাপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনামগ্রহণ করিতে পারিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিষ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারিলে ভগবদ্-বিমুখতা গর্হণের প্রবৃত্তি লাভ হয়। গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বদ্ধজীবের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিহার করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে হরিভক্তিলাভের সম্ভাবনা। তাঁহাদের সান্নিধ্যে থাকিতে পারিলেই শ্রীনাম-গ্রহণ ও হরিকথা-প্রচার সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগত নিষ্কপট ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণালাভ করেন। জড় অহং-মম আসক্তির দ্বারা কখনই ভগবানের কৃপালাভ হয় না। বদ্ধজীব গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়াই নরক-গমনের পথ প্রশস্ত করে। শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে রক্ষা করাই

গৌড়ীয়গণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের ও তৎপার্ষদ্ ও পরিকরগণের নিষ্কপট আনুগত্যের অভাবে বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তি স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, নির্জ্জন-ভজনানন্দী, অষ্টকালীয়লীলা-স্মরণপন্থী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৃহী-বাউল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা প্রচ্ছন্ন পঞ্চোপাসক ও বহ্বীশ্বরবাদী, তাহাদের কোনদিনই বাস্তব শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে পারে না। দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হইয়া পড়িলে ভগবদ্ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া চিরতরে বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে অপরাধিগণই অন্যাভিলাষী, কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী ও কুযোগী

ভক্ত ও ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধী হইলে কোনদিনই ভক্তিবৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন বা বাস্তব আনুগত্যই প্রকৃত মঙ্গললাভের উপায়। স্বীয় অযোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভক্ত-ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ হয়। শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তজ্জন্য ভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা-দর্শনাদিদ্বারা আমরা জীবন ধন্য করিতে পারি। "আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥" সুতরাং নির্জ্জন ভজনের ছলনায় মানব আজ প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভগবৎ-ভাগবতসেবা বাদ দিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া শ্রীনামগ্রহণের ছলনায় বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছে। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ গুরু-বৈষ্ণবগণের অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিতে গেলে সাধন-ভজন হইতে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হন। হরিকথা কীর্ত্তন বা হরিসেবা না করিয়া কেবল শ্রীনাম করিতে থাকিলে সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় বঞ্চনাই লাভ হয়। অর্চ্চনের দ্বারাই শ্রীনাম-ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত কামনা-বাসনা-বর্জ্জিত না হইলে চিত্তস্থির হয় না। সাধনে কৃত্রিম পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই স্বাভাবিকভাবে ভগবল্লীলা-স্মরণ সম্ভব হয়। বৈকুণ্ঠ নাম-শ্রবণেই চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয় এবং যাবতীয় ভোগ-ত্যাগরূপ অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মাগ্রহিতা বিদূরিত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনাম সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। ভগবৎপ্রেমই জীবের পক্ষে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

সৎসমালোচনামূলক ভক্তিগ্রন্থাদির প্রকাশ ও কৃপা-প্রার্থনা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে এই বৎসর "শ্রীপ্রেমপ্রদীপ"-গ্রন্থের ২য় সংস্করণ ও "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"-নামক গবেষণামূলক গ্রন্থ "পরিশিষ্ট"-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধা বিনোদবিহারীজীউ এবং শ্রীনৃসিংহদেব আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে তাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া এ জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math.
   Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math.
   Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 95

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ২৮ বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪০১, ইং ১৪/৪/৯৫ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১২)

আনন্দ মুকুন্দারবিন্দনয়ন।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ॥ ১॥

হে আনন্দময়! মুকুন্দ! কমলনয়ন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি॥ ১॥

সুন্দরী-মন্দির গোবিন্দ বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ॥ ২॥

হে সুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি॥ ২॥

চন্দ্র-সুরেন্দ্র-সুবন্দিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্রচন্দ্র-বন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

চন্দ্রক-মন্দির নন্দক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৪ ॥

হে কোটীচন্দ্র-নিবাস! হে আনন্দন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

বৃন্দারকবৃন্দ-সুবন্দিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৫ ॥

হে দেববৃন্দ-বন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

মন্দার-সুন-সুচর্চ্চিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৬ ॥

হে মন্দার-কুসুম-সুচর্চ্চিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

ইন্দিরানন্দক সুন্দর বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৭ ॥

হে ইন্দিরানন্দ-দায়ক! হে সুন্দর! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

মন্দির-স্যন্দনস্যন্দক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৮ ॥

হে হৃদয়-মন্দির-রথ-চালক! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

আনন্দ-চন্দ্রিকা-স্যণ্ডক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥ ৯ ॥

হে আনন্দ-চন্দ্রিকা-বর্ষিন্! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠার পর]

৩। ব্রহ্মসূত্রের কয়টী বিভাগ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

"ব্রহ্মসূত্র—চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। *** ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয় ; দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার ; তৃতীয়ে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু শম দমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য ; সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-বিষয়—নিরবদ্য-বিশুদ্ধানন্ত গুণগণ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ বিনাশ-পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ-বিশেষের নামই—'ন্যায়' ; বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম—'বিষয়' ; এক-ধর্ম্মিত্বে পরস্পর-বিরোধী নানা-অর্থের বিচারের নাম—'সংশয়' ; প্রতিকূল অর্থের নাম—'পূর্ব্বপক্ষ' এবং প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম—'সিদ্ধান্ত'।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৪। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে আচার্য্যগণ কি কি দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন ?

"উপনিষদ্ বাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায় চতুষ্টয়-সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে-সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল বেদান্তসূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না ; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয় ; বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্তবাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্র-সকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করত বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটী মতবাদ ; তাহাতে

সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ স্থাপক বেদমন্ত্র-সকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদ-মন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বনপূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি-বচনের সম্মানপূর্ব্বক যেমন সারসিদ্ধান্ত হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম—'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্ব। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সার-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। —জৈঃ ধঃ ১৮শ অঃ

৫। বেদান্ত কি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানশাস্ত্র?

"বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র।"

—তঃ বিঃ

৬। বেদান্তভাষ্যের ক্রম-বিকাশ বা মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব আবিষ্কারের ইতিহাস কি?

"সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুরপ্রদেশে এই গোবিন্দভাষ্যের আবিষ্কার করেন।" —'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

৭। বৈষ্ণবের পক্ষে গোবিন্দভাষ্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি?

"অনেকেই মনে করেন,—'আমি বৈষ্ণব'; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব বৈষ্ণব-পদ-বাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য-নিধি।"

—'সমালোচনা' (বেদান্তদর্শন), সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

স্মৃতি-প্রস্থান

১। পুরাণে যখন সকলের অধিকার, তখন ঐ শাস্ত্র বেদ হইতে ন্যূন নহে কি?

"সকল নিগমবল্লীর সারতত্ত্বরূপ কৃষ্ণনামে যেমত সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায় তাহাদের মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা স্বীকার করা যায় না। যে ব্যাস বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ও ইতিহাসের সংগ্রহকর্ত্তা; অতএব তাহাতে পুরাণসকলের মাহাত্ম্য ও বেদতুল্যতা উপলব্ধ হয়।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

২। গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি? গীতাতে ভক্তিবিষয়ক বিচার মধ্যস্থলে রক্ষিত হইল কেন?

"গীতাশাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয়-অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ এবং অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়-অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৩। গীতার বিচারে জীবের চরম উদ্দেশ্য কি?

"বিশুদ্ধভক্তিই গীতাশাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে ভগবৎশরণাপত্তিই যে 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।"

—'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৪। গীতা কি যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে?

"অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নিষ্ঠারই উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়।" — 'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৫। গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

"গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যে-স্বভাব সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি-কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত।" —'অবতরণিকা', গীঃ রঃ রঃ ভাঃ

৬। সাত্বতী শ্রুতি কি?

"ভাগবতকে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলা হইয়াছে।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

৭। কোন্ কোন্ গ্রন্থপাঠ করিলে আত্মমঙ্গল হয়?

"যে-সকল গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ,

স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। কোন্ গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ ?

"গীতাশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ। যিনি গীতাশাস্ত্রের অমৃতময় উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অন্য শাস্ত্রের ভার বহন করার অন্য নাম শাস্ত্র-গর্দ্দভতা মাত্র।" —'সমালোচনা,' সঃ তোঃ ১২।২

৯। বেদের যথার্থ অর্থপ্রকাশক শাস্ত্র কি ?

"পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ-প্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই সৎ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।"

—তঃ মুঃ ২

১০। প্রকৃত বেদতাৎপর্য্য কোথায় পাওয়া যায় ?

"বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ জগতে বেদবাক্য-তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৪৩-১৪৮

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকার সহিত কর্ম্মিগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থের পার্থক্য কি ?

"শ্রীমদ্গোপাল ভট্টগোস্বামী ভক্তগণের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ এই সারদীপিকা-পদ্ধতি রচনা করিলেন। বৈদিকানুশাসনক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভীমভট্ট ও শ্রীমদ্গোবিন্দানন্দ ভট্টাদি কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট কর্ম্মিগণের এবং শ্রীভবদেব ভট্ট বেদানুষ্ঠাতৃগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমান্তর্গত ও অন্ত্যজবর্ণোৎপন্ন গোবিন্দভক্তগণের জন্য বেদপুরাণ ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যদ্বারা সেবা ও নামাপরাধ বিচারপূর্ব্বক পিতৃদেবার্চ্চনপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এই সৎক্রিয়াসারদীপিকা পদ্ধতি রচিত হইল।"

—সঃ সাঃ দীঃ, (বঙ্গানুবাদ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এ' তিনে যাঁ'রা যোগদান করেন, তাঁ'রাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক বিচার হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানবজগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণকাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম সেবা হ'তে মায়াবাদ অর্থাৎ আমি প্রভু, ঈশ্বর, ভগবানের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা-তদ্রূপবৈভবাদি নেই'—এই ভীষণ অসৎমতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ্ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায়, কামগায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ধামসেবা হ'লে শ্রীনাম-সেবা হ'বে, শ্রীনামসেবা হ'লে কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হ'বে। ধামে যিনি সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছেন, তাঁ'র গ্রামে-রতি—গ্রাম্যসম্বন্ধ বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শ্রীনাম-সেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানব-জীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব। একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা ক'রে ইহজগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যাঁ'র উপর আহিত, তাহা—শ্রীধাম। এই ধামের সেবার দ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণকাম-সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নামসেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকাম-সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করেন না।

স্থূলশরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে-সকল ইতর বাসনার উদয় হ'য়েছে—সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ভগবৎসেবা-চেষ্টায় উদাসীন হ'য়ে যে-সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হ চ্ছি, সেই মুখটী উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণকাম-সেবায় রতি উদিত হয়; সেই কৃষ্ণকাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

'ধাম'-অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই, যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। সেই ধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট ক'রেছেন।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

কেবল-চেতনের ধর্ম্ম যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায় চৈতন্যজন্যগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তা'হ'লে অন্ধকার-রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হ'তে আমরা উদ্ধৃত হ'তে পারি। দেশের এমন ভাগ্যহীনতা যে, সত্যের কথা আলোচনায় অনেকেই অন্যমনস্ক! তা'দের যেন অন্য কত কি কাজ প'ড়ে গেছে! ঐরূপ ইতর প্রয়াস কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ গ্রহণে পরাঙ্মুখতার নিদর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব অসুবিধার হাত হ'তে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন; আর মায়ার মূল শুদ্ধস্বরূপ যোগমায়া জীবকুলকে বংশীধ্বনি-শ্রবণে মনোযোগ দিবার জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে মহাপ্রেম প্রদান করেন। মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত শাক্তসমূহের প্রার্থিত ফলদান করেন; যোগমায়াদেবী শুদ্ধশাক্তগণকে সুনির্ম্মল ভাববিশিষ্ট করিয়ে, রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁ'দের নশ্বর ভোগের প্রবৃত্তি নাই; অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির বন্ধন নাই, তাঁ'রাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শু'নতে পারেন, যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'তে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যা'র উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখ-বিমোহিনী অচিৎশক্তি বা ছায়াশক্তি। শুদ্ধ শাক্তগণ চিৎশক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়ে' কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি যা'দের কর্ণে পৌঁছায় না, তাঁ'তে যাঁ'রা আকৃষ্ট হন না, তাঁ'রা ইতর কামনায় আকৃষ্ট হন। কামাখ্যাদেবীর আখ্যায়িকা হ'তে আমরা জা'নতে পারি, কামাখ্যাদেবী যাঁ'কে অকপট কৃপা করেন, তিনি মদনগোপালের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য কামনা ক'রতে পারেন। আর যাঁ'র প্রতি কপট কৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত মদনের বা কামের দাস হ'য়ে ধর্ম্ম-অর্থাদি কামনা ক'রে থাকেন। আর কামাখ্যাদেবী যাঁ'দিগকে অত্যন্ত অকৃপা বা বঞ্চনা করেন, তাঁ'রা মোক্ষকামী হ'য়ে পড়েন।

———

শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর]

বড় বড় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের মন পা'ন নাই। ইহা আমরা তাঁহার প্রকটকালে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। অতিমর্ত্ত্য পুরুষের **'মন'** পাইতে হইতে কিরূপ চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের আলোচনা না থাকিলে কি-প্রকারে মন পাওয়া যাইবে? গুরুপাদপদ্মের মন যোগাইয়া চলাই গুরু-সেবকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যদি গুরুদেবকে মনে করি, তাঁহার প্রচুর অর্থের অভাব হইয়াছে, প্রচুর সামর্থ্যের দরকার; আমরা যেমন করিয়াই হউক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলেই বোধ হয় প্রভুপাদের মন পাইব। উৎসবাদি ব্যাপারে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব দিবারাত্র 'গায়ে খাটিয়া' দিলেই সেবা হইবে—এইরূপ মনে করি। কিন্তু অতিমর্ত্ত্য পুরুষের কৃষ্ণসেবাময়ী চেষ্টা 'অর্থ-সামর্থ্যের দ্বারা' পরিপূরণ না হইলে, তাহার দ্বারা গুরুদেবের 'মন' পাওয়া যাইবে কেন? গুরু-পাদপদ্মের 'মন' পাইতে হইলে তাঁহার নিরঙ্কুশ আভ্যন্তরীণ মনের গূঢ় ইচ্ছাটুকু অনুসন্ধান করিয়া তদনুকূলে সর্ব্বতোভাবে সেবা সমাপন করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলায় তাঁহার নিগূঢ়তম সেবা-প্রবৃত্তি নিখুঁত অনুশীলন করিবার যাঁহাদের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধন্য। আমরা নিজেদের মনগড়া ধারণাগুলি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবার উপর চাপাইয়া দিলে তাহা কখনও সেবা বলিয়া গণ্য হইবে না। আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাটী গুরুদেবের চিন্তাধারার সহিত এক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া তদনুসারে আমাদের যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা নহে—ইহা এক প্রকার **auto suggestive nature.**

পার্থিব জগতের চিন্তাস্রোত অপার্থিব জগতে চাপাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ চেষ্টাতেই আমরা প্রকৃত পথ হইতে বিচলিত হইয়া পড়ি। সেবার ইঙ্গিত বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। আমরা পার্থিব জগতের ভোগ-প্রবণতা লইয়া যে সেবা-চেষ্টা দেখাইয়া থাকি, তাহার মূলে ইন্দ্রিয়-তর্পণই পরিলক্ষিত হয়, অথবা তাহার বাধা-স্বরূপ প্রাকৃত বৈরাগ্য প্রস্ফুটিত হয়। ইহা কিন্তু আদৌ সেবা নহে। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে আমাদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, সরলভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও গুরু-পাদপদ্মের সন্তোষ-

বিধান করা যায় নাই। শ্রীগুরুদেবের অন্তরাদেশের সহিত বাহ্যিক আদেশ ও লৌকিক নির্দ্দেশের পার্থক্য বুঝিয়া যিনি তাহা পালন করিবেন, তিনিই প্রকৃত-প্রস্তাবে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন, বর্ত্তমানে তিনি প্রকট নাই। তাঁহার জীবনে আমরা তাঁহার কোন বাহ্যিক কর্ম্ম-কুশলতা আদৌ লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার সমসাময়িক 'হোমড়া-চোমড়া' পাঠক ও বক্তা সন্ন্যাসী-বৃন্দ দুই একদিন তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি কিছু কটাক্ষ করিলে গুরুপাদপদ্ম সিংহ-গর্জ্জনে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'আমি খুব বড় বক্তা, আমি খুব ভাল পাঠক, সমস্ত লোককে পাঠ-বক্তৃতার দ্বারা আমি মুগ্ধ করিতে পারি, আমার প্রচুর ক্ষমতা, আমার বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক মঠে চলিয়া আসিতেছে, অতএব আমি একজন 'প্রিয় ও প্রধান শিষ্য'—এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ সেবকের আসন দেন নাই। ভক্তিবৃত্তি পৃথক্ বস্তু। তাহা অতি সৌভাগ্যের ফলেই লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনে তাঁহার আচরণ হইতে আমরা কতকগুলি আপাত-বিরোধ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা বাহ্যতঃ তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বৎকুল-বরেণ্য, সিদ্ধান্তমার্ত্তণ্ডস্বরূপ দেখিতে পাইতাম। অথচ, সর্ব্বাপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিকেও তিনি 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা প্রভুপাদকে সাক্ষাৎ বাণীস্বরূপ বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। তাঁহার বাণী-বিলাস-লীলার প্রধান সহায়ক-রূপে কোন একজন সুবোধ-লেখক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যহেতু হঠাৎ মঠ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া 'ঢাকা' গেলে তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হন নাই। অপরপক্ষে, তাঁহার কোন নিরক্ষর সেবক-পঞ্চানন চক্ষুর বিন্দুমাত্র অন্তরালে গেলেও তিনি খুব উদ্বেগ অনুভব করিতেন। ইহা আপাততঃ অত্যন্ত **startling** ও **perplexing** বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহা আদৌ সেরূপ নহে। এই ব্যবহারের অন্তরে ভক্তিবৃত্তির পূর্ণধারা প্রকাশিত রহিয়াছে। লেখনী-পরিচালনার দ্বারা জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়া প্রভুপাদের যতটুকু সেবা করা হইয়াছে, তাহার অনন্ত-গুণে সেবাবৃত্তি নিরক্ষর ব্যক্তির প্রাণের টানে প্রকাশিত। গুরুপাদপদ্মে আসক্তিই ভক্তিবৃত্তির মূল-সূত্র।

আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি,—অনেকেই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনায় মতিচ্ছন্ন হইয়া পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি লিখন, গ্রন্থ-প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য্যে বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি নিজের কিছু প্রাপ্তিযোগ অথবা প্রশংসাস্বরূপ প্রতিষ্ঠাটুকুও না পাই, তাহা হইলে আমাদের আর গুরুসেবা করা হয়

না। আমরা সর্ব্বদাই গুরুদেবের নিকট হইতে উৎসাহের নাম করিয়া প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়া থাকি। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে গুরুসেবা বা শরণাগতির লক্ষণ নহে। যিনি গুরুদেবে যতটা আসক্ত, তিনি ততটাই গুরুসেবক। আমরা মহাজন পদাবলী হইতে শিক্ষা পাই যে,—"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউ চরণে তোমার॥" মায়িক বিষয়কে 'আপনার'-জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি এত আসক্ত হইয়াছি যে, তাহাকে বিন্দুমাত্রও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করি। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বস্তুতে ঐ প্রকার 'আমার'-বোধ না হইলে ভগবদনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? 'হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু আমার জিনিসটী ঠিক থাকুক'—এইরূপ বুদ্ধি সেবাবুদ্ধি নহে। এমন কি, 'মায়িক জগতের যাবতীয় জিনিস ধ্বংস হয় হউক, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার দ্রব্যের কণামাত্রও আমি ধ্বংস হইতে দিব না'—ইহাই প্রকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ।

শ্রীল প্রভুপাদ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বহরমগঞ্জে সহস্র সহস্র লোক-সমক্ষে বিরাট্ সভায় বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন,—"আমি ভগবানের এক কপর্দ্দক রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ অনর্থগ্রস্ত জীবের বিনাশ সাধনের প্রশ্রয় দিতে পারি।" সে আজ বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ঐ কথাটী শুনিয়া হৃদয়ের মধ্যে বিরাট্ 'তোলপাড়' হইতে লাগিল। যে মহাপুরুষ আজীবন নিরামিষ আহার করিয়া সমস্ত জৈব-জগৎকে অপ্রাকৃত অহিংস-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার মুখে আজ প্রকাশ্য সভায় এইরূপ কথা কি শুনিলাম! ইহা সত্যসত্য অত্যন্ত **revolting** বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাই যাবতীয় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির সার-শিক্ষা-স্বরূপ মহাবাক্য। (**ক্রমশঃ**)

বেতন, পারিশ্রমিক বা জীবিকার বিনিময়ে ভক্তিযাজন হয় না

শ্রীগুরুদেবের সেবাব্যতীত ভগবানকে লাভ করা যায় না—এরূপ বাক্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রধানরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেবের সেবাই ভগবৎসেবা, ইহা সুপ্রচারিত।—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়া অনুবৃত্ত্যা যৈঃ তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

এমন কি,—"কৃষ্ণ রুষ্ট হৈলে গুরু রক্ষা করে।
গুরু রুষ্ট হৈলে কৃষ্ণ রক্ষিবারে নারে॥

—প্রভৃতি বাক্যও শ্রীগুরুসেবার মাহাত্ম্য-সূচক রহিয়াছে। শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত শিষ্যের গত্যন্তর নাই। পরন্তু গুরুসেবা কিরূপভাবে কর্ত্তব্য, তাহা অধিকাংশক্ষেত্রে যথার্থভাবে আচরিত হয় না। বেতন, পারিশ্রমিক বা জীবিকার বিনিময়ে যে গুরুসেবা, তাহা ভক্তিপর নহে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখা যায়,—**"Wanted devotees; remuneration—according to merit."**—এরূপক্ষেত্রে গুরুসেবার পরিবর্ত্তে জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যই প্রবল থাকায়, তাহা প্রকৃত ভক্তিসাধক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের পরমোন্নত পারমার্থিক চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদাশ্রয় করাই প্রকৃত শিষ্যের পরিচয়। বেকার-জীবনের অবসান-কল্পে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা পারমার্থিকতার পরিচায়ক নহে। অভ্যাসদ্বারা অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগুলি আয়ত্ত করিলেও প্রচারক হওয়া অসম্ভব। শ্রীল রূপ গোস্বামীর উক্তি,—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ॥

সৎসঙ্গের প্রভাবে ভোগপর-বিচার পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন সুকৃতিমান্ মনুষ্যের পারমার্থিক প্রবৃত্তির উদয় হইলেও, নিম্নাধিকারীর সঙ্গফলে তাহা অসম্ভব। শ্রীগুরুদেবের অনুকরণদ্বারা কখনও শ্রীগুরু হওয়া যায় না। অন্যাভিলাষ ভক্তির বাধক ও পরিত্যাজ্য।

সেবা কখনও কর্ম্ম নহে।—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।"

সেবারাজ্যে বিনিময়ে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ নাই; জীবিকার্জ্জন বা পরিবারবর্গ-পোষণ-ব্যাপার নাই। পরিবারের সকলেই গুরুগৃহে নানাবিধ কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেও তাহাকে গুরুসেবা বা ভক্তি বলা যায় না, তাহা জীবিকার্জ্জন বলিয়া গণ্য হইবে। বেতন লইয়া, কমিশন প্রথায় বা চুক্তিমূলে শ্রীগুরুদেবের বিগ্রহসেবা, রন্ধনকার্য্য, গো-পালন, পুষ্পোদ্যান সংরক্ষণ, ভূমিকর্ষণ ও চাষাবাদ, নানাবিধ রুচিকর খাদ্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়করণ, ধর্ম্মগ্রন্থাদি বিক্রয়, এজেন্সি-পদ্ধতিতে অর্থসংগ্রহ বা অর্থের বিনিময়ে পাঠ-কীর্ত্তন বা লীলাভিনয়াদি প্রকৃত গুরুসেবা বলিয়া বিবেচিত হওয়া অনুচিত। শ্রীগুরুদাস্য এবং কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দাস্য সমফলপ্রসূ নহে।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,—

"স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

—ইহা হরিকে উদ্দেশ না করিয়া ভোগপর হইলে সার্থকতা লভ্য হয় না। অধিকন্তু নিম্নাধিকারে ইহা পরাভক্তি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরাভক্তি অর্থে শুদ্ধাভক্তি এবং প্রেমভক্তি প্রকাশ পায়। নিম্নাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মমিশ্রা, বিদ্ধাভক্তি বা প্রাকৃত-ভক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রচারক শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন-লীলায় পরিষ্কারভাবে এই বিদ্ধাভক্তি পরিত্যাগে ঐকান্তিক যত্ন-গ্রহণ আবশ্যক বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, বিদ্ধাভক্তিকে প্রশ্রয় দান করেন নাই।—

"তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লইয়া ফেলায় বাহির করিয়া॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে॥
প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছে সম্মার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্মধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর॥

শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রে তজ্জন্য বিদ্ধাভক্তির আদর পরিদৃষ্ট হয় না। মায়াবদ্ধ জীব আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রুচিযুক্ত বলিয়া নানাবিধ ভোগপর মিশ্রভক্তি ও অন্যাভিলাষকে সমাদর করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাহাদের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।—

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥

নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল-শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৮-১৬১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় স্ত্রীসঙ্গকে প্রধানরূপে বর্জ্জন করিতে উপদেশ রহিয়াছে,—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" বৈষ্ণবমতে বিবাহ করিলে স্ত্রীসঙ্গ-জনিত দোষ স্পর্শ করে না—এরূপ বিচার যাহারা পোষণ করেন, তাহারা ভ্রান্ত। পরন্তু পত্নীকে কৃষ্ণের ভোগ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি ভোগবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত তাঁহাকে পূজ্যবুদ্ধি করাই বৈষ্ণবমতে বিবাহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা -"এবং ব্যবায় প্রজয়া ন তু রত্যৈ" বাক্যেও বৈষ্ণবদর্শন প্রকাশিত নহে। বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রবিহিত বাক্য হইতেও উন্নত অধিকার জ্ঞাপন করে।

"নিজের পোষণ কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
তব সুখ যাহে করিব যতন,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥—ইহাই ভক্তের আদর্শ।

উদ্দালক আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে অনাহারে থাকিয়া সেবা করিতে করিতে ক্ষুধার-জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করে এবং তৎফলে অন্ধ হইয়া কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছিল। —ইহাই ভারতীয় গুরুসেবার আদর্শ। গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে গুরুসেবা—বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ব্যবহার। ইহা প্রকৃত সেব্য-সেবকের পরিচায়ক বৃত্তি নহে। ইহা একপ্রকার **Business policy**, ইহা বহির্ভারতের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের আচরণ। তাঁহারা নানাবিধ শিল্পকার্য্য, সুখকর বাসস্থান ভাড়া এবং সুস্বাদু খাদ্যাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা শিষ্যদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঋষি-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় পারমার্থিক কেন্দ্রে এরূপ ব্যবস্থা গর্হিত। ইহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা নহে। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহীদের অতিথিসেবা বাধ্যতামূলক। রন্তিদেবের চরিত্র তাহাতে সমুজ্জ্বল আদর্শ। ইহা **Guest house** পদ্ধতি নহে।

সাধু-সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণ্য কার্য্য নহে। পারমার্থিক জগতে তাহা নির্গুণ-বৃত্তি এবং বাধ্যতামূলক। অগৃহীর পক্ষে ইহা চিত্তশোধক ও পারমার্থিক অনুশীলন। পাশ্চাত্ত্যজগৎ ইহার মাহাত্ম্য-বিষয়ে অজ্ঞ। আচার্য্য শিষ্যকে উপনীত

করিয়া তাহাকে ভিক্ষায় প্রেরণ করিয়া থাকেন। "রে বট! ভিক্ষাঘট, গাঞ্চানয়"। —ইহাই শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের আদেশ। পরমোন্নত ভক্তের প্রার্থনা,—

"শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।"
"সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।"

মায়াবদ্ধজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি ভোগপর অথবা ত্যাগপর। তাহার সেবাবৃত্তির অভাব। বিশ্বকে সে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করিতে চাহে। সে সাধু-গুরু-ভগবান্ —সকলকেই ভোগ করিতে সুখ পায়। যে-গুরু তাহার দেহ-মনের তৃপ্তি বিধান করেন, সেই গুরুকেই সে উত্তম বলিয়া বিচার করে। এইরূপ গুরুভোগী কখনও প্রকৃত শিষ্য নহে। যে ভগবান্ তাহার ভোগপর কামনা-বাসনা পূরণ করেন, তিনি তাহার নিকট প্রিয়। মঠ-মন্দিরাদিও তাহার ভোগী দেহ-মনের সুখদায়ক হইলে আকর্ষণের বিষয় হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বা গুরুকে সে আদর করিতে পারে না। রাজসিক ঐশ্বর্য্যপর অট্টালিকাবহুল গৃহাদিতেই তাহার রুচি। সে গুরুদেবের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আচরণের মহত্ত্ব তাহার নিকট দুর্জ্ঞেয়।

শিষ্যপক্ষে গুরুভোগ যেরূপ দোষণীয়, গুরুপক্ষেও শিষ্যভোগ তদ্রূপ নিন্দনীয়, অসঙ্গত ও অন্যায়। শিষ্যের ধনাঢ্যতা, ভোগপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠাদ্বারা প্রলুব্ধ গুরু প্রকৃত গুরুপদবাচ্য নহেন। গুরুদেব শিষ্যের ভোগপর গৌরব বা মহত্ত্বে গৌরবান্বিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রকেও দর্শনদানে অনীহা প্রকাশ করিতেন। রাজাকে শিষ্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদর্শে প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার বিচার,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

ধনী-শিষ্যের প্রাচুর্য্যদ্বারা সদ্‌গুরুর মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। বরং তদ্বিপরীতার্থ-বোধক হইয়া থাকে। শাস্ত্রপ্রমাণ,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥ (ভাঃ ১।৮।২৬)
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড় অভিমান॥

ধনীভক্ত অপেক্ষা দরিদ্রভক্তের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহাধিক্য,—

"কাথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্যপ্রধান।

যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর-ভগবান্॥

"শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল"—ইহা নিম্নাধিকারী সাধকপক্ষে প্রযোজ্য নহে; পরন্তু ইহা পরমমুক্ত শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য। ইহা সাজা-ভক্তের আচরিতব্য নহে, মুক্তের আচরণীয়। ইহা **Rehearsal**-মূলক আচরণ নহে। শ্রীগুরুদেবের মন্তব্য:—"আমরা ইট, কাঠ, পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই; আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠার পর]

সত্যযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর যজ্ঞ, দ্বাপরের যুগধর্ম্ম শ্রীহরির পূজা আর কলিযুগের ধর্ম্ম—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইহা কলিযুগবাসী সকলেরই অবশ্য করণীয় ধর্ম্ম। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি সধবা, কি বিধবা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যবন, কি খ্রীষ্টান, কি কুকর্ম্মী কি সৎকর্ম্মী; কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি যোগী, কি ভোগী, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই ধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিযুগবাসী কাহারও পরমা শান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই বা থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া পুরুষ যাহা লাভ করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া যে ফল হয়, দ্বাপরে শ্রীহরি পূজাদ্বারা যে ফল হয়, কলিযুগের হরিনাম-কীর্ত্তন হইতে সেই সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ-নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী, ভক্ত সকলের পক্ষে অনুক্ষণ হরিনামকীর্ত্তনই নিত্য কর্ত্তব্য-রূপে নির্ণীত হইয়াছে। হরিনাম-কীর্ত্তন অকুতোভয় পন্থা অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সাধনে কোন ভয় বা হতাশার কিছু নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগে পূজার দ্বারা যে ফল হয়, কলিকালে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সে-সমস্ত ফল হইয়া থাকে।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিকালে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কলিকাল সকল দোষের আকর হইলেও এইটীই (নাম-কীর্ত্তনই) মহদ্‌গুণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ কলিযুগে কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম) লাভ হয়।

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৭)

সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভজনক অন্য কিছুই নাই, যেহেতু নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই পরমা শান্তি লাভ এবং সংসার দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই যে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারাই যে জীবের সংসার হইতে মুক্তি হইবে তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনও বলিতেছেন,—

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।' (বেদান্ত সূত্র ৪।১।১)
'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' (ঐ ৪।৪।২২)

শ্রীনারায়ণ-সংহিতাও বলেন,—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমন্ত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন। কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীহরির আরাধনা হইয়া থাকে।

কলিকালে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই যে মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদও বলিতেছেন,—

হরিঃ ওঁ॥ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা—'সাধু পৃষ্টোঽস্মি। সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি-সংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি।' নারদ পুনঃ পপ্রচ্ছ—'তন্নাম কিমিতি।' স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

—ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণ-বিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ—নাস্য বিধিরিতি। (যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষৎ)

অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে শ্রীনারদ নিজপিতা জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার নিকট গমন করিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে প্রভো! ঘোর কলিকাল উপস্থিত। পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কি উপায়ে এ কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহাদ্বারা কলিকালে উদ্ধার লাভ করা যায় সেই সর্ব্বশ্রুতিরহস্য গোপ্যকথা বলিতেছি শ্রবণ কর—**'কেবল আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নাম উচ্চারণদ্বারাই জীব কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে।'** এই কথা শুনিয়া নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রভো, সেই নাম কি?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ —এই ষোলনাম কলিকল্মষনাশন অর্থাৎ সর্ব্বপাপহারী। এই নামকীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় বেদে দেখা যায় না। নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা জীব মায়া-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থ হয়।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রভো! **এই নাম-কীর্ত্তনের কি বিধি?'** তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—**'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কোন বিধি নাই।'**

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত 'শ্রীচৈতন্য-উপনিষদে'ও আমরা পাই,—স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি। মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ। নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমং রহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই 'হরি-কৃষ্ণ-রাম' অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।

এই আট আট ষোল নাম পরম সুন্দর; যাঁহারা এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারেন না। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণ এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রুতি আরও বলেন,—

"কৃত-ত্রেতা-দ্বাপরেষু ধ্যান-যজন-সেবাভির্যদশ্নুতে তৎ কলৌ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যা॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা যে ফললাভ হয়, কলিকালে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা সে-সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে।

পরমকরুণাময় শ্রীহরি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য চঞ্চল-চিত্ত কলিহত জীবগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া অতি সহজ স্বভজনরূপ পরমগোপ্য হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছেন। এই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন মঙ্গললাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবদারাধনা মহাভাগ্য সাপেক্ষ। হরিনাম-কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত ধার্ম্মিক বা সাধু। হরিনাম-কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এমন কি, শ্রীহরির পূজাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহও নাম-কীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত না হইলে সুষ্ঠু ফলদায়ক হয় না। কেননা, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগ-ধর্ম্ম। এজন্য জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তি-সন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ (কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি) সংযোগেনৈব ইত্যুক্তম্ (ভাঃ ১১।৫।৩২)। 'যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নাম-কীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্।"　　(ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৩ অনুচ্ছেদ)

যদিও কদর্য্য-স্বভাব, বিক্ষিপ্তচিত্ত, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের জন্য অর্চ্চনাদির আবশ্যকতা আছে, তথাপি সেই অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তন-সহকারেই করিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—সুবুদ্ধিমান জনগণ কলিকালে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান ভক্ত্যঙ্গদ্বারা অর্থাৎ নিরন্তর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই কলিযুগে স্বতন্ত্র নাম-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠার পর]

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব আমরা কান দিয়া শুনিতে পারি এবং শ্রুতবিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু পশুদের পরস্পরের আলোচনার ক্ষমতা নাই। যাহাতে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, নিত্য কল্যাণ লাভ হয়, সে বিষয় লাভ করিতে পারি মনুষ্যজন্মে। যাহাতে আত্মমঙ্গল হয়, সে বিষয় চিন্তা না করিলে নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বিচার হইয়া যাইবে।

আমরা একটুও সময় নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুখের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব। তৎফলে আনন্দমূর্ত্ত শ্রীভগবানের দর্শনের বাধাগুলি কাটিয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-দ্বারা আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব ভগবান্ আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। এ জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই। শ্রুতি বলেন,—

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

—মুণ্ডক উপনিষৎ ৩।১৫

সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারিলেই—দুঃখ-চিন্তা-শোকপূর্ণ সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিত্যসুখী হওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

সত্য জানিবামাত্র আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্বাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, —"আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বাকী আছে, কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ" অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সকলজন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য কোন জন্মে সম্পন্ন হইবে না। আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এইদণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহার কথা শুনিব না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনে বাস্তবিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্‌কে ভুলে সংসার-সুখের যে চেষ্টা, তাহাতে শুধু অমঙ্গলের কথা।

আমরা চিরদিন এ পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য।

বাস্তব বস্তু ভগবানকে না জানার জন্য যত অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এ অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্যজন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহজগতের রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন আনন্দময় ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব।

নিত্যবস্তু ভগবানের আলোচনা করা দরকার। কি করিয়া আলোচনা করিব? সাধুসঙ্গপ্রভাবে। সাধুগণের সঙ্গ করা দরকার। যিনি সৎবস্তু—নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে জীবনসর্ব্বস্ব করিয়াছেন, তিনি সাধু। বদ্ধজীবের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হইলে শ্রীহরিপাদপদ্মে মতি হইবেই। সাধুসঙ্গের অভাব হইলে মায়াশক্তির দ্বারা—জগতের ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর দ্বারা প্রতারিত হইব।

ভগবান্‌ই পূর্ণবস্তু—নিত্য আনন্দময় বস্তু—জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তু বা আশ্রয়স্বরূপ। তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সন্ধানদাতা প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রেয়বস্তু—ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিবার যত্ন না করিলে, শ্রীহরির আরাধনা না করিলে, ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই থাকিবে না। আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাই পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

[এই নরদেহটী সকল প্রয়োজনের মূল; ইহা সুদুর্ল্লভ হইলেও বর্ত্তমানে আমাদের সুলভ হইয়াছে, ভবসাগর পার হইবার ইহাই পটুতর নৌকা এবং গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত

হইয়াও যিনি ভগবদ্ আরাধনাদ্বারা এই জন্ম-মরণাদি দুঃখ-চিন্তা উদ্বেগপূর্ণ সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী মহাপাপী।]

শ্রীহরিই সকলের মূল (**Fountain head**) ; আমরা সকলে সেই শ্রীহরির সেবক—সন্তান। তাঁহার সেবাই আমাদের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য। তাঁহার সেবা করিলে সকলের সেবা হইয়া থাকে। তথা "তরোর্মূলনিষেচনেন"—ভাগবতের (৪।৩১।১৪) শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন উহার স্কন্ধ, শাখা-উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (অর্থাৎ মুখে আহার্য্য প্রদান করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয় ; সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজার দ্বারাই নিখিল দেবপিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শ্রীশিবজীও দেবীকে এই কথাই বলিয়াছেন,—

বেদান্ত বেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিত।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥
তরোর্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥

শ্রীহরির আরাধনাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। হরির আরাধনা করিলে ধন-জন-বিদ্যা-দেহ-মন-প্রাণ সবই সার্থক, আর হরির আরাধনা না করিলে মনুষ্যজন্ম সবই বৃথা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥
(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

[ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম নোঽস্মাকং যত্তদ্ধিক্, ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং। ক্রিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাণি। যে বয়ং অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে তু বিমুখা এব—(শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)।]

অর্থাৎ যাঁহারা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের প্রতি বিমুখ ; তাঁহাদের উচ্চ জন্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত এবং নিত্য-নৈমিত্তকাদি কর্ম্ম সবই অকিঞ্চিৎকর বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেন্কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১।২।৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পালনরূপ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা শ্রীহরির কথা শ্রবণাদি ভজনে রুচি উৎপাদন না করে, তবে এইরূপ

ধর্ম্মানুষ্ঠান অনিত্য ফল প্রসব করিলেও ফল অনিত্যহেতু নিশ্চয়ই কেবল বৃথা শ্রম মাত্র। শ্লোকে নিশ্চয়ার্থক 'এব', 'হি' ও 'কেবল'-এই তিনটী প্রয়োগ থাকায় ঐ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহিত বলা হইতেছে।

এইজন্যই শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদ স্বকৃত "চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্রে" নিজের হৃদ্‌গত ভাব প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥

এই সংসারে একবার জন্ম হয়, পরে মরণ হয় এবং পুনর্ব্বার জননী-উঠরে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এই জন্ম-মরণ-দুঃখ-চিন্তা-ভয়-শোক পূর্ণ দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। একমাত্র শ্রীহরির উপাসনা করিলেই হরি তাহাকে রক্ষা হরি থাকেন। অতএব হে মূঢ়মতে, তুমি সেই গোবিন্দের ভজন কর, গোবিন্দের ভজন কর। মরণকাল উপস্থিত হইলে তোমার পাণ্ডিত্য, ধন-জন, পৌরুষ প্রভৃতি কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শাস্ত্র আরও বলেন,—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥

(ভাঃ ৪।২৯।৪৯-৫০)

যাহাদ্বারা হরির সন্তোষ হয়, তাঁহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যাহাদ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা।

শ্রীহরি দেহধারী জীবগণের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র সকলের কারণ ও নিয়ন্তা। অতএব এই সংসারে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই মনুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয় বস্তু। শ্রীহরিচরণাশ্রয় হইতেই জীবের সকল প্রকার মঙ্গল হয়।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যাঁ'র দাস্য লাগি' শেষ অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥

জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৯।১৭)—

"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।"

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু কেশবভট্ট-নামক কাশ্মীর-দেশীয় সরস্বতীর বরপুত্র এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে উদ্ধার করত কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন,—

দিগ্বিজয় করিব,— বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ়চিত্ত করি'॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥' (চৈঃ ভাঃ আদি)

শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন,—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥ (ভাঃ ২।১।৫)

হে ভরতবংশাবতংস! যিনি সর্ব্বভয়-নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থলাভরূপ অভয় ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে সকল জীবের আত্মা অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করাই কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

প্রকৃত পুত্র কে ?

ইহজগতে পুত্র না থাকিলে যে-কোন দম্পতিকে অত্যন্ত মনঃকষ্টে দিনযাপন করিতে দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা নারীগণকে স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীগণের নানাবিধ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। এমন কি, কাকবন্ধ্যা নারীগণের যে-কোন মুহূর্ত্তে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন কারণবশতঃ 'অন্ধের যষ্টি' একমাত্র পুত্রের পুত্রের মৃত্যু হইলে কাকবন্ধা নারীকে সকলপ্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। পুত্রহীনা অথচ অনেক কন্যার জননীও সহজে কাহারও আদর-যত্ন লাভ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও গর্ভস্থ সন্তান কন্যা জ্ঞাত হইয়া ভ্রূণ-হত্যা করিবার নিষ্ঠুর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক নারী পুত্রলাভের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্রতাদি করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আবার বিভিন্ন মন্দির, পীরের দরগায় পূজা দিয়া থাকেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগিতে পারে, "ইহ জগতে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের এত গুরুত্ব কেন ? আবার পুত্রের যদি এতই অপরিসীম গুরুত্ব হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রাদির স্থানে স্থানে পুত্রই কুল বা বংশ ধ্বংসের একমাত্র কারণ বলিয়া কেন উল্লেখ রহিয়াছে ?"—এই বিষয়ে আলোচনা করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

যে পুত্র 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতৃ-মাতৃকুলকে ত্রাণ করিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রে 'পুত্র' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত পুত্র ব্যতীত অন্য কেহই পিতৃ-মাতৃকুলকে 'পুৎ' নামক নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। তাই ভগবদ্ভক্ত পুত্রই যথার্থ পুত্র। ভক্তিযুক্ত পুত্রের পিণ্ডের আশায় পিতৃপুরুষগণ সংসারের মাঝে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড-তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥

(স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড)

"যে-পর্য্যন্ত বংশে ভক্ত-পুত্র না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডের আশায় সংসারে বিচরণ করেন।" শ্রীভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে চিত্রকেতু মহারাজ অঙ্গিরা ঋষিকে বলিয়াছেন,—"ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যেমন স্রক্‌চন্দনাদি সুখপ্রদ বিষয়ও সুখ দিতে পারে না, সেইরূপ অপুত্রক ব্যক্তিকেও লোকপালগণের অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদও সুখ দিতে পারে না। হে মহাভাগ, যাহাতে আমি

পুত্রলাভ করিয়া পিতৃপিতামহের সহিত দুরন্ত নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারি, আমায় সেই উপায় বিধান করুন।"

ভগবদ্ভক্ত পুত্রই প্রত্যেক পিতামাতার কাম্য হওয়া উচিত। সকল শাস্ত্রেই ভগবদ্ভক্তের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৭।৯।১৮) "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ" শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে, "শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ভক্ত স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।" বৃহন্নারদীয়পুরাণ বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে চণ্ডাল আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং চণ্ডালকুলে জাত হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আদিপুরাণে পাওয়া যায়,—

তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি হরেঃ প্রিয়ঃ।
তদ্দেশং সফলং মন্যে যত্রাস্তে ভগবৎ-প্রিয়ঃ॥

"যেস্থানে হরিভক্তগণ বাস করেন না, সেইস্থান পতিত; আর যেস্থানে ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণ বিদ্যমান, সেইস্থানই অত্যন্ত পবিত্র।" হরিভক্তগণ যেস্থানে বাস করেন, সেইস্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সিদ্ধগণ, দেবগণ নিত্যকাল অধিষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বশ্রেয়ঃ, সকল তীর্থ ও তপোবনসমূহ সর্ব্বদা বিরাজ করেন—ইহা বৃহন্নারদীয় পুরাণের—"হরিভক্তি-পরো যত্র তত্র ব্রহ্মাঃ হরিঃ শিবঃ" শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে। বিষ্ণুভক্ত যদি পাঁচদিনও জীবিত আছেন, তবে তাহাতেই জগতের মঙ্গল হয়; আর বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়া সহস্রকল্প বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

ভক্তশ্রেষ্ঠ ভগীরথ কপিল-মুনির অভিশাপে ভস্মীভূত সগর-বংশের ষাট হাজার সন্তানকে, মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বিষ্ণুভক্ত নহেন বলিয়া বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা আনয়ন করা ত' দূরের কথা, তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্যই লাভ করেন নাই। ভগবদ্ভক্তগণ পিতা-মাতার কি কথা, তাঁহারা ত্রিজগৎ উদ্ধার ও পবিত্র করিতে সমর্থ।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

"যে কুলে বৈষ্ণবপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল অত্যন্ত পবিত্র হয়। জননী কৃতার্থা, ধরিত্রী ও বসতিস্থল ধন্যা হন এবং পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।" পদ্মপুরাণের অন্যত্রও উল্লেখ রহিয়াছে,—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

"আমাদের বংশে যে বৈষ্ণবপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই আমাদিগকে ভবিষ্যতে উদ্ধার করিবে—এই চিন্তা করিয়া পিতা, পিতামহ সকলেই আনন্দে আস্ফালনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন। পিতৃপুরুষগণ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের বংশজাত ঐ কৃষ্ণভক্ত সন্তানের ভজনবলেই তাঁহারা উদ্ধার পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারিবেন।" কৃষ্ণভক্ত না হইয়া পুত্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তাহার দ্বারা কুল বা বংশের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। গান্ধারীর দুর্য্যোধনাদি শতপুত্রের দ্বারা কৌরব-বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বেণ রাজা বংশ উদ্ধার ত' দূরের কথা, নিজেই সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া নরকগতি লাভ করিয়াছিল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, কালযবন প্রমুখ কোন না কোন বংশের পুত্র হইয়াও বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হন নাই; বরং তাহারা বংশের মুখে চুণকালি মাখাইয়াছিলেন। প্রবাদ-বাক্যে পাওয়া যায়,—

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিণা।
দহ্যতে যদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেন কুলং তথা॥

"একটী কুবৃক্ষের কোটরাগ্নিতে যেমন সমস্ত বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই কুপুত্রের দ্বারা সমস্ত কুল ধ্বংস হয়। কুপুত্র কুলের কলঙ্কস্বরূপ।"

কেবল কৃষ্ণভক্ত পুত্র কেন, সধবা বা বিধবা নারীগণ কৃষ্ণভক্ত হইলে তাঁহারাও কুল উদ্ধার করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত রহিয়াছে,—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণু-ভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥

"সধবা হউক বা বিধবা হউক, যিনি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা; তিনি অতি অবশ্যই অনায়াসে একশত এক কুলকে উদ্ধার করিতে পারেন।"

যে পুত্র 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতৃ-মাতৃকুলকে উদ্ধার করিতে অক্ষম হন, তিনি বৃথাই পিতা-মাতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাস এক স্থানে বলিয়াছেন,—

এক রাহুমে হোতে হৈয়্ তুলসী মৃত আউর পূত্।
রাম ভজেতো পুতহিঁ, নহি তো মৃতকা মৃত্॥

"পুত্র যদি ভগবদ্ভজন না করিয়া পিতা-মাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সেই পুত্র মৃত্র-সদৃশ; যেহেতু পুত্র ও মৃত্র উভয়ে একই স্থান হইতে নির্গত হইয়া থাকে।" ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী পিতামাতাই বৈষ্ণব পুত্র লাভ করিয়া থাকেন।—

বৈষ্ণব সন্তান যার সেই ভাগ্যবান্।
পুত্রবতী সেই নারী, পিতা পুত্রবান্॥

এই প্রসঙ্গে পাদ্মোত্তরখণ্ডে পাওয়া যায়,—

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃনান্তু ধুরন্ধরঃ॥

"কলিতে যে (ভক্তিমান্) পুরুষের নাম ভগবৎসম্বন্ধবিশিষ্ট (কৃষ্ণদাস, হরিচরণ প্রভৃতি) হয়, তাহার মাতা সৎপুত্রের জননী বলিয়া কথিত হন, সেই পুত্র পিতৃগণের উদ্ধারের কারণ হন।"

অভক্ত পুত্রের দ্বারা জনক-জননীর কখনও প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না

আজকাল অধিকাংশ পিতা-মাতাই বৃদ্ধকালে পুত্রের নিকট হইতে সেবালাভের আশায় পুত্রকে শিশুকাল হইতে অত্যন্ত যত্নের সহিত লালনপালন করিয়া থাকেন। যে পুত্র পিতামাতাকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন, সেই পুত্রই পিতামাতার প্রচুর আদর লাভ করেন। পুত্র হরিভজন করিয়া কুল বা বংশকে উদ্ধার করুক—ইহা সহজে কেহই চাহেন না। পুত্র হরিভজনার্থে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পিতা-মাতা ও সমাজের নিকট তিনি কুলাঙ্গার বলিয়া পরিচিতি লাভ করেন,—ইহা প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণবিমুখ পিতা-মাতা পুত্রের নিকট যাহা আশা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আশা বিফল হয়। আশার মুখে ছাই পড়িলে অনেক পিতামাতাকেই অনুতাপে দগ্ধীভূত হইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। অর্থ না থাকিলে পুত্র পিতা-মাতার অবাধ্য হয়। জমি ও অর্থের জন্য পুত্রের হস্তে পিতামাতার মৃত্যু—ইহা প্রায়শঃই সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা যায়।

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ', 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই দুইটী নীতিমূলক বাক্যকে বহুমাননপূর্ব্বক অনেকে ভগবানের সেবা বাদ দিয়া পিতামাতার সেবায় রত থাকেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সমাজকর্ত্তৃক তাহারা 'সুসন্তান', 'আদর্শ পুত্র' প্রভৃতি উপাধির স্বীকৃতি লাভ করেন। এই সকল আদর্শ পুত্রেরা শ্রীভাগবতে কথিত পুরু-কর্ত্তৃক যযাতি মহারাজের প্রতি উক্তিটিকে বহুমানন করেন। পুরু পিতা যযাতি মহারাজকে বলিয়াছিলেন,—"হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার কৃপায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, সেই দেহোৎপাদক পিতার প্রত্যুপকার করিতে ইহলোকে কেই বা সমর্থ? যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় সম্পাদন করেন, তিনি উত্তম এবং যিনি পিতা আদেশ করিলে পালন করেন,

তিনি মধ্যম। পিতা আদেশ করিলে যে পুত্র অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করে, সে অধম এবং যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার পুরীষসদৃশ।" যযাতি মহারাজের প্রতি পুরুর উক্তিটির মধ্যে পৃথক্ তাৎপর্য্য রহিয়াছে—পিতৃভক্তাভিমানিগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণাদিবস্তুসমূহ যেরূপ মনুষ্যের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করে। কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই 'আমি অমুকের পুত্র', 'আমি অমুকের মাতা' প্রভৃতি জাগতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। ইহজন্মে যিনি পিতা হইয়াছেন, পরবর্ত্তী জন্মে তিনি পিতা না হইয়া শত্রুরূপেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। আবার ইহজন্মের শত্রু পরের জন্মে পিতাও হইতে পারেন। ইহজগতে কোন পুত্রই পিতার সেবাসুখ চিরকালের জন্য লাভ করিতে পারে না, যেহেতু পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পিতার সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৯।২৫) 'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ' শ্লোকে 'পিতৃভক্তগণের পিতৃলোকে এবং ভগবদ্ভক্তগণের ভগবল্লোকে গতি হয়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বারা পিতৃভক্তগণ অপেক্ষা যে ভগবদ্ভক্তগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিযুক্ত না করিয়া নিজের ভোগের ইন্ধন যোগাইবার কার্য্যে নিয়োগ করেন, তিনি 'পিতৃ'-পদবাচ্য নহেন। প্রকৃত পিতা-মাতা নিজেরা ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া পুত্রকেও ঐ পথের পথিক করেন। পিতা-মাতা কৃষ্ণভক্ত হইলে পুত্রের পিতা-মাতার সেবা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। প্রকৃত পুত্র গৃহস্থ বা সন্ন্যাস যে আশ্রমে থাকুন না কেন, তাহার দ্বারা পিতৃকুল-মাতৃকুল উভয়কুলেরই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধিত হয়।

প্রকৃত পুত্র নিত্যপুত্র কৃষ্ণের সেবায় পিতা-মাতাকে নিযুক্ত করেন

পার্থিব ধন-সম্পত্তি, পিতা-মাতা কাহাকেও প্রকৃত সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে না। বদ্ধ পিতা-মাতা ক্ষুদ্র অর্থের কাঙ্গাল হইতে গিয়া অসীম অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ পরিত্যাগ করেন। ফলস্বরূপে তাহারা কখনই প্রকৃত মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। ধন-পিতা-মাতা-পুত্র সকলেই অস্থায়ী, সুতরাং অস্থায়ী বস্তুর প্রতি মমতা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক। স্বয়ং কৃষ্ণকে পুত্ররূপে জানিতে পারিলে সাধারণ পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার মমতা আপনা হইতেই ক্ষীণ হইয়া যাইবে। যিনি বাৎসল্যভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর পুত্র-বিয়োগের আশঙ্কা নাই। সুতরাং কোন পিতা-মাতাকেই কখনও পুত্রবিচ্ছেদ-জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সে-কারণে প্রকৃত পুত্র পিতামাতাকে পার্থিব

ধন-সম্পত্তি প্রদানের দ্বারা মোহিত না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম ধনের সন্ধান দেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন,—

আনের তনয় আনে রজত-কাঞ্চন।
আমি আনি' দিব মাতা কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

নিত্য, অব্যয়, সনাতন কৃষ্ণের ভজন করাই সকল মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহাতে জীবের নিজ-চরম-কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বংশের গৌরব বৃদ্ধি ও মঙ্গললাভার্থে ভগবানের নিকট ভক্তপুত্র ব্যতীত কোন অভক্তপুত্র কখনও কামনা করেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

স্বধামে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রথমাবস্থায় বিশেষ কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদকের মধ্যে পূজনীয় শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ বাবাজী মহারাজ, শ্রীমুকুন্দ গোপাল-ভক্তিমধুরের পর, আমরা সুকবি ও সুগায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণের সহিত শ্রীযুক্ত সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারীকে বিশেষভাবে স্মরণ করি। বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ইং ১৯৪২ সাল হইতেই প্রথম দুইজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমরা লাভ করিয়াছিলাম। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ইং ১৯৪৪ সাল হইতে শেষোক্ত দুই মহাত্মার সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদিগের স্মৃতিপটে বিশেষভাবে জাগরূক হয়। শ্রীসমিতির শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব, শ্রীঊর্জ্জব্রত এবং পরিক্রমা, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও রথযাত্রা-মহোৎসবাদিতে শেষোক্ত দুই-সতীর্থের কীর্ত্তনাদি সেবায় শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীরাগভূষণ প্রভুর অবর্ত্তমানে শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী প্রভু উভয়ের সেবা একাই নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আশ্রিত ও একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ প্রভুই পরবর্ত্তিকালে **"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ"** নামে পরিচিত হন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজের অপ্রকটের কয়েক বৎসর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ-সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও, তিনি পূর্ব্ববৎ সমিতির বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবা চালাইয়া যাইতেন।

ব্রহ্মচারী-অবস্থায় মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী প্রচারকগণের সহিত তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রচারাদিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। গৃহস্থ-জীবনে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের সান্নিধ্যে আসিবার পর তিনি আচার্য্যদেবের সহিত মেদিনীপুর, সুন্দরবনাদি বিভিন্ন-স্থানে প্রচারে থাকিয়াও সাহায্য করিতেন। ইং ১৯৪৪ সালে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমার প্রাথমিক ব্যবস্থা লইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার-পার্টিতে উপস্থিত থাকিয়া তিনি বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, রণপুরগড়, নয়াগড়, খণ্ডপাড়াগড়, কন্টিলো (নীলমাধব) প্রভৃতি গড়জাত রাজ্য-সমূহে প্রচারকালে তাঁহার কীর্ত্তনাদি সেবায় যত্নের ত্রুটী করেন নাই।

শেষ বয়সে তিনি নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেই অবস্থান করিতে থাকেন। সকল মঠবাসী সেবকগণ তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপন ইচ্ছায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার্থে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্থানীয় সকল গৌড়ীয়-মঠের আমন্ত্রিত সেবকগণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদাদি সেবা করাইয়াছিলেন। হয়ত পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার গোলোকবিজয়ের সংবাদ পাইয়াছিলেন। বিগত ১৮ই আশ্বিন, ১৪০১ (ইং ৫।১০।১৯৯৪), বুধবার বিকাল ৫ ঘটিকায় কাহাকেও কোনরূপ উদ্বেগ না দিয়া শ্রীহরিনাম ও গুরুবর্গকে স্মরণ করিতে করিতে তিনি স্বীয় ধামে যাত্রা করেন। শ্রীমঠের দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ সহায়তায় শ্রীবেদান্ত সমিতির "শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রমে" তিনি সমাধিস্থ হন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি আমাদের অকপট মতি হউক—এই আশীর্ব্বাদ তিনি নিত্যকাল আমাদিগের উপর বর্ষণ করুন।

— নিজস্ব সংবাদ

স্বধামে শ্রীরসিককৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একনিষ্ঠ সেবক, গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী মথুরাস্থ ব্রজবাসী শ্রীরামপ্রকাশজী অগ্রবাল (শ্রীরসিককৃষ্ণ দাসাধিকারী) গত ৬ই কার্ত্তিক, ১৪০১ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪।১০।৯৪), সোমবার ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভজনোচিত ধামে গমন করেন। প্রয়াণকালে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে চির-নিদ্রিত হইলে তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীমতী মুন্নী দেবী, চারপুত্র—শ্রীসুরেশ, শ্রীমহেশ, শ্রীবাঁকে-বিহারী ও শ্রীরাকেশচন্দ্র অগ্রবাল এবং দুই কন্যা—শ্রীমতী অমরলতা ও কুমারী বীণাপাণি দেবীসহ অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব মহা শোকসাগরে নিমজ্জিত হন। তাঁহার প্রয়াণ-বার্ত্তা অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন-বর্গের নিকট এবং মঠ-মন্দিরে Telephone মাধ্যমে প্রেরিত হয়। তাঁহার ধামপ্রাপ্তি-সংবাদ তাঁহার একান্ত প্রিয় ও প্রেমাস্পদ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের হৃদয়েও দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে।



শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারীকে তাঁহার কার্য্যক্রম পরিবর্ত্তন করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মথুরায় প্রেরণ করেন।

শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে লইয়া শ্রীপাদ রসিককৃষ্ণ প্রভুর উদ্দেশ্যে সাত্বত-বিধানে হোম-যজ্ঞাদি সম্বলিত শ্রদ্ধানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। যজ্ঞান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন হয়।

শ্রীরামপ্রকাশ অগ্রবাল ছিলেন মথুরার অন্তর্গত দাউজীস্থ শ্রীচাঁদামালজীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল—শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী। তিনি

ইং ১৯৮৪ সালে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়স্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষাদি গ্রহণান্তে **শ্রীরসিককৃষ্ণ দাসাধিকারী** নামে পরিচিত হন।

ইং ১৯২৮ সালে শ্রীধাম মথুরান্তর্গত দাউজী-গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ধার্ম্মিক ও ভক্ত পরিবারের সরল-সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন-পদ্ধতি পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ভক্তিপথের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভক্তিমান্-ভক্তিমতী পুত্র-কন্যার সুব্যবস্থা করিয়া তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন।

মাত্র ১২ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি মথুরায় আগমন করেন। প্রথম জীবনে তিনি মুনিমের কার্য্য করিয়া সংসার পরিচালনা করিতেন। পরবর্ত্তিকালে বিষয়-কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জ্জন করেন। ধীরে ধীরে সকল ভ্রাতাগণের দায়-দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। আর্য্য সমাজ রোডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুদীর দোকানই তাঁহার ব্যবসাকেন্দ্র। তিনি মথুরা বাজার কমিটির সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তখন বহু ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করিতেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মথুরা আর্য্যসমাজ রোডে 'শ্রীগিরিধারী মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ ও সমিতির সহ-সভাপতি মহারাজের নিকট তাঁহার প্রচুর হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধ-ভক্তিধারা অভিস্নাত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্গে নিজ পারমার্থিক পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনবর্গকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের অশেষ পারমার্থিক কল্যানসাধন করেন। কন্যাগণের মধ্যে যিনি শ্রীহরির আরাধনায় প্রযত্নশীলা, তাঁহাকে ভজনে উৎসাহ প্রদানের অভিপ্রায়ে ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ সুনিশ্চিত করিতে তাঁহার নিমিত্ত সুনির্দ্দিষ্ট সঞ্চয়-সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার স্বল্পভাষিতা, মধুর ব্যবহার এবং অপ্রতিহত হরিকথা-প্রচার-প্রচেষ্টার জন্য 'ব্রজের প্রচারক ধন'-স্বরূপ ব্যক্তিত্বের তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁহার পরিচিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ব্যক্তিবর্গকে তিনি পূজনীয় বৈষ্ণবগণের সন্নিকটস্থ করিয়া তাহাদের ভক্তিপথের বাধা অপসারণ করাই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অঙ্গ ছিল। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদেশ হইতে মথুরায় ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার মানসে অবস্থানরত বৈষ্ণবগণের সম্মানে বর্ষাণায় উৎসব করিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণকালে তাঁহার নিকট পর্য্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তিনি তাঁহার একান্ত বান্ধব বল্লভ-সম্প্রদায়ের শ্রীবনোয়ারীলাল মাহেশ্বরীকে সকল বিষয় অবগত করাইয়া উক্ত মঠের দায়-দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ম্মাণকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। ব্রজের সর্ব্বত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কথা প্রচারে তিনি সদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাই অসমর্থ হইলেও আপন জন্মস্থান দাউজীতে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

শ্রীরসিককৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর প্রসঙ্গে তাঁহার মহৎ আদর্শ ও সেবা-প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে প্রকাশ না করিলে অবিচার হয়। প্রসঙ্গতঃ গৌড়ীয় মঠ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথা ব্রজমণ্ডলেও বহু শাখামঠ স্থাপন করিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্রজবাসিগণ যাঁহাকে বাঙ্গালীর ঠাকুর বলিয়া দূরে অবস্থান করিতেন, শ্রীরসিককৃষ্ণ প্রভু সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই যে 'প্রাণ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ', তাহা প্রচারে দক্ষতা, সাহসিকতা ও উৎসাহ প্রদর্শন করেন। সেইজন্য তিনি নিজ প্রচেষ্টায় সেবানুকূল্য সংগ্রহ করিয়া মথুরানগরে ঝাঁকি ও ব্যাণ্ডপার্টি লইয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয়কে উর্দ্ধ হইতে অধিক উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে সাহায্য করেন। মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার এবম্বিধ প্রচেষ্টা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীরাধাষ্টমীতে 'রাধা চাপ' সহ প্রতি বৎসর শ্রীমঠে গমন করিয়া যে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী।

তাঁহার পরিবারের সকলেই অপসম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনে প্রযত্নশীল হইয়া তাঁহার হৃদ্‌গত ভাবের পূর্ণতা বিধান করেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণকে অর্থবণ্টন করিয়া অবশেষে নিজ অংশ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য উইল্ করিয়া যান। হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিজে সকল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যমুনার কূলে হরিনাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। অন্তিম ইচ্ছাস্বরূপ পরম পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সমগ্র ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও দর্শনাদি সম্পূর্ণ করেন। কোন এক সময়ে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যেন বৈষ্ণবমতেই বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রজে জন্মগ্রহণ, অপসম্প্রদায় ও ব্রজবাসী অভিমান বর্জ্জন ও শাস্ত্রীয় শুদ্ধ-ভক্তি-

সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ধামসেবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়াছেন – ইহাই শুদ্ধ শ্রীনাম গ্রহণেচ্ছু প্রেম-ভক্তি-অভিলাষী ভক্তের লক্ষণ।

পরিশেষে তাঁহার নিকট প্রার্থনা,—তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধামে বিরাজ করত আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহার সেবাময় জীবনাদর্শ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত হই।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

এক শতাব্দীর অধিক হইতে চলিল বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এবং তৎপাদপদ্মভৃঙ্গ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরচন্দ্রের বিশেষ প্রেরণায় গৌরপ্রণয়িজনের প্রবল আর্ত্তি পূরণার্থে, গৌরভোগীকুলের ভোগোন্মত্ততা নিবারণকল্পে শ্রীগৌরধাম প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় আম্নায়ের তৎকালীন একমাত্র সংরক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমার যে সূচনা করিয়াছিলেন, আজও তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সংস্থাপক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুর অনুগামিগণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব-পদাঙ্কিত প্রেমভূমির অপ্রাকৃত রজঃকণিকায় স্নাত হইতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সহস্র সহস্র সুমেধাগণের সমাবেশ হইয়াছে। শ্রীসমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজত্রয়ের সদয় উপস্থিতি পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্তসমাজের যেমন অত্যন্ত আনন্দবিধায়ক হইয়াছিল, অপরদিকে শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ এবং স্বধামগত শ্রীল ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজের এই প্রথমবারের মত সকরুণ-অনুপস্থিতি তেমনই বেদনাদায়ক।

বিগত ২৭শে ফাল্গুন, ১৪০১ (ইং ১২।৩।৯৫) রবিবার হইতে, ৩রা চৈত্র, ১৪০১ (১৮।৩।৯৫) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা এবং শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজের আনুগত্যে, সহ-সভাপতি মহারাজের পরিচালনায়, অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদ এবং ব্রহ্মচারিগণের দায়িত্বে এবং গৃহস্থ ভক্তগণ যে সেবা-সৌষ্ঠব প্রকাশ করেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। অপরদিকে পরিক্রমায় যোগদানকারী যাত্রীসকল অত্যন্ত-জন-সমাগমজনিত অসুবিধাদি হাসিমুখে সহ্য করিয়া এই মহা-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আহূত হইবার যে অসীম ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা প্রশংসনীয়।

গত ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৯৫) শনিবার সকাল হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে শ্রীধাম-পরিক্রমাভিলাষী যাত্রিগণের শুভাগমন হইতে থাকে। সন্ধ্যায় অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণমুখে পরিক্রমার বিধি-নিষেধ, উদ্দেশ্য, কৃষ্ণার্থে অখিল ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি উপস্থিত গৌরাঙ্গ-সমাজের নিকট ব্যাখ্যাত হয়।

পরদিবস ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৯৫), রবিবার অতি প্রত্যুষেই শ্রীশচীনন্দনকে পালকীতে করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীমঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। গঙ্গাদেবীর করুণায় কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমে প্রবেশাধিকার লাভান্তে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর উদ্দেশ্যে সকলে দণ্ডবৎ-প্রণতঃ হন। পশ্চাৎ গৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুভাশীষ কামনায় তাঁহার স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে পরিক্রমামণ্ডলী প্রবেশ করেন। তথায় তৎসমাধিস্থলী দর্শন এবং তাঁহার অপূরণীয় অবদান কীর্ত্তনমুখে তৎকৃপাভিক্ষান্তে সুবর্ণবিহার হরিহরক্ষেত্রাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পাদপীঠে উপনীত হন। শ্রীনরহরি সরকার বিরচিত 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' গ্রন্থাদিতে বর্ণিত শ্রীধামের অপ্রাকৃত চিন্ময় মহিমাবলী ত্রিদণ্ডিপাদগণ-কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়া সহস্র সহস্র শ্রোতার কর্ণপুট ধন্য করেন। পরিশেষে উপস্থিত পরিক্রমাকারী ও ধামবাসিগণকে খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে পরিক্রমামণ্ডলী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।২।৯৫), সোমবার অর্চ্চনাখ্য শ্রীঋতুদ্বীপান্তর্গত শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন রাতুপুরে মূল বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমতি রাধারাণীর অর্চ্চন, পুষ্পাঞ্জলি সমাপনান্তে কোলদ্বীপের সমুদ্রগড়স্থ রাজাসমুদ্রসেনের লুপ্ত বাসস্থলী-সমীপে পরিক্রমামণ্ডলী উপস্থিত হন। সেখানে রাজা সমুদ্রসেনের পক্ষে শ্রীল সহ-সভাপতি মহারাজ এবং পাণ্ডব ভীমসেনের পক্ষে শ্রীপত্রিকার সম্পাদক মহারাজের

মধ্যে তত্ত্বসিদ্ধান্তবাণ সহযোগে অনুষ্ঠিত অভূতপূর্ব্ব প্রেমসমর যে আনন্দবন্যা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হন নাই। অবশেষে অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর পাদস্পর্শধন্য চাঁপাহাটীতে গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রভু-সেবিত শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ দর্শনান্তে উক্তদিবসের জন্য পরিক্রমার বিরাম ঘটে।

২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৯৫), মঙ্গলবার হইতে ১লা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৯৫), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান ও ব্যাসগাদি, শ্রীজহ্নুমুনির অবলুপ্ত আশ্রম, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপান্তর্ভুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন ; চতুর্থ দিবসে শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ প্রৌঢামায়াস্থান—পোড়ামাতলা, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, রুদ্রদ্বীপে অবস্থিত শ্রীরুদ্রদেব এবং তৎপ্রাণপতি শ্রীগৌরসুন্দর দর্শন ; পঞ্চম ও শেষ দিবসে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন, শ্রীসঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলী—শ্রীবাসভবন, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকেন্দ্র—শ্রীঅদ্বৈতভবন, আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, বৈরাগ্যবিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক পরিশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, তথায় গৌরবিহিত কীর্ত্তন, গৌরকথা পরিবেশন ও সর্ব্বসাধারণে খেচরান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে পরিক্রমামণ্ডলীর শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের মাধ্যমে বাৎসরিক পরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

২রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৯৫), শুক্রবার নদীয়াচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির আবির্ভাববাসর উপলক্ষে সমগ্রদিবস নিরম্বু উপবাস থাকিলেও যাত্রিগণ সকাল হইতেই মঠস্থ সন্ন্যাসি ও ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক পরিবেশিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিরন্তর পান করিয়া উপবাসজনিত ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অপরদিকে অনুপ্রাণিত হরিভজনেচ্ছুগণ স্ব স্ব অধিকারানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীনাম প্রাপ্ত এবং পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ-পার্ষদ আসামস্থ শ্রীনিমানন্দ প্রভুর চরণাশ্রিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী মহোদয় কায়মনোবাক্যে শ্রীমুকুন্দসেবায় নিযুক্তেচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করত **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ**-নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশচীসুতের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত —অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চ্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিক দর্শন সম্পন্ন হইলেন।

পরদিবস ৩রা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৯৫), শনিবার শ্রীজগন্নাথোৎসব উপলক্ষে যাত্রিগণ, স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যক্তিগণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পরিবেশনের মাধ্যমে শুভ নবগৌরাব্দের সূচনা হয়।

পরিশেষে শ্রীপরিক্রমার এই বিশাল আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা যাঁহারা শ্রীসমিতির সেবাকার্য্যে অশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমপ্রয়োজন বাণী-দ্বারা তাঁহারা নিরন্তর সঞ্জীবিত হউক্—ইহাই প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

(তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত)

এবং

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

প্রেম-প্রদীপ

(পারমার্থিক উপন্যাস)

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

ফোন : ৩৩-৮৯৭৩

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ১৮ই বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ২।৫।১৯৯৫) মঙ্গলবার, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে কলিকাতা মহানগরীস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ১৭ই বৈশাখ (ইং ১।৫।৯৫) সোমবার হইতে ১৯শে বৈশাখ (ইং ৩।৫।৯৫) বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহতত্ত্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।
ইতি—১৭ই চৈত্র, ১৪০১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে হইলে **শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস ব্রহ্মচারীর** নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

১৭ই বৈশাখ (ইং ১।৫।১৯৯৫), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্ত্তন এবং ধর্ম্মসভা।

১৮ই বৈশাখ (ইং ২।৫।১৯৯৫), মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—প্রাতঃ ৪-৩০ টায়।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯শে বৈশাখ (ইং ৩।৫।১৯৯৫), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি-কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীমঠ-মিশনের প্রয়োজনীয়তা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে ভাষণ।

বিঃ দ্রঃ—(১) দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ১ ত্রিবিক্রম, সঙ্কর্ষণ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ বৈশাখ, সোমবার, ১৪০১, ইং ১৫/৫/৯৫ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্

(সংগৃহীতম্)

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥ ১॥

যিনি ব্রজে (গোপীগণের) নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনাগণের বসন-চোর বলিয়া প্রসিদ্ধ ও যিনি (স্বভক্তগণের) অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসকল হরণ করেন, সেই চোর-শিরোমণিকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদ-শ্যামল-কান্তি-চৌরম্ ॥
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত চৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥

যিনি রাধিকার চিত্তচোর, যিনি নবমেঘের কান্তিচোর ও যিনি স্বচরণাশ্রিত ভক্তগণের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, সেই চোর শিরোমণিকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্ ।
কেনাপ্যহো ভীষণ-চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েঽপি ॥ ৩ ॥

যিনি স্বচরণাশ্রিত জনগণকে (তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া) অকিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহহীন ও পথের ভিক্ষুক করেন, তাঁহার ন্যায় ভীষণ চোর জগতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই ॥ ৩ ॥

যদীয়নামাপি হরত্যশেষং
গিরি-প্রসারাণপি পাপরাশীন্ ।
আশ্চর্য্যরূপো নন্থ চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥ ৪ ॥

যাঁহার নাম মাত্রই লোকের পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিঃশেষে হরণ করেন, এরূপ আশ্চর্য্যরূপ চোর আমি কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥ ৪ ॥

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব ।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিবদ্ধঃ ॥ ৫ ॥

হে চোর, তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত হরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ ? আমি তোমাকে অদ্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি তোমাকে ভক্তিরজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলাম ॥ ৫ ॥

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্ ।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত-বন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতন্তু বন্ধম্ ॥ ৬ ॥

তুমি মনুষ্য মাত্রেরই ঘোর যমপাশ ছিন্ন করিতে পার, এমন কি সকলের সর্ব্ব-প্রকার বন্ধনই ছিন্ন করিতে পার বটে, কিন্তু স্বভক্তকৃত নিজবন্ধন ছিন্ন করিতে পার না ॥ ৬ ॥

যন্মানসে তামসরাশি-ঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়
স্বচৌর্য্যদোষোচিত-দণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

অতএব হে চোর হরে! তুমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহরূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া নিজের চৌর্য্যকার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়
মদ্ভক্তিপাশ-দৃঢ়বন্ধন-নিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়-কোটিশতান্তরেঽপি
সর্ব্বস্বচৌর হৃদয়ান্ন হি মোচয়ামি ॥ ৮ ॥

অতঃপর তুমি আমার হৃদয়-কারাগারে আমার ভক্তিপাশদ্বারা দৃঢ়রূপ বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্ব্বস্ব-চোর! শতকোটি প্রলয়াবসানেও কখনও হৃদয় হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

প্রকরণ—প্রস্থান

(মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

১। মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থসমূহ আদরণীয় কেন ?

"শুদ্ধভক্তগণ মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থগুলিকে মধুচক্র বলিয়া জানেন। সেই-সকল মধুচক্র যত প্রকার নূতনভাবে নিকটবর্ত্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়।"　　—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

২। মহাজনগণ কি মনোধর্ম্মোত্থ কল্পনার সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন ?

"বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্ন শক্তা মে সরস্বতী।
বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্মনঃ॥
তথাপি সারজুষ্টবৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।
বর্ণিতা ভগবদ্বার্ত্তা ময়া, বোধ্যা সমাধিনা॥

চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাসবর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা; যেহেতু যে-বাক্য-সকলের দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব, ঐসকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি **সারজুষ্ট বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম।** বাক্য-সকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না, এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক এতত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকৃষ্ট সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যুক্তিপ্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম; যেহেতু অপ্রাকৃত-বিষয়ে তাহার গতি নাই। কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি 'সহজ সমাধি' নামে লক্ষিত হয়; আমি যেমত সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও সেইরূপ তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন।" —কৃঃ সং ১।৩২-৩৩

৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সর্ব্বশাস্ত্রের সার কিরূপ?

"ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, সে সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে।"

—'বিবোধন', চৈঃ শিঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কাঁহার প্রেরণায় 'শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন?

"যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে।
তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', শ্রীভাঃ মঃ

৫। 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশটী কি?

"শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।
অনুভবে আসি আজ্ঞা দিলা অতঃপর॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।
সম্বন্ধাভিধেয়-ক্রম দেহ' দেখাইয়া॥
গ্রন্থ নিত্যপাঠ্য হ'বে বৈষ্ণব-সভায়।
ভাগবত-পদ্যমালা প্রভুর কৃপায়॥
'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা॥
সেই ত' প্রেরণাক্রমে এ অধম দাস।
ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥
বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে।
পড়ি' কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট-মনে॥" —'উপসংহার', শ্রীভাঃ মঃ

৬। 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' গ্রন্থাস্বাদনের ফল কি?

'শ্রীমদ্‌গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপন-তৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা॥
নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন **লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা**॥
দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সুযত্নেন রসং ভাগবতং পিব॥"

—'উপসংহার', শ্রীভাঃ মাঃ, ২০শ কিঃ

"উপসংহারে সংগ্রাহক বহু মিনতিপূর্ব্বক কহিতেছেন,—এই শ্রীগৌর-গদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুম্ফিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে-ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সদ্যঃ শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়-ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইল।" —'উপসংহার', শ্রীভাঃ মাঃ, ১-২ অনুবাদ

৭। 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ কিরূপে আবির্ভূত হইলেন?

"শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্।
বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগ্রহম্॥
সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥

কিন্তু মে হৃদয়ে কোঽপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণম্ ॥"

—কৃঃ সং, ১ম অঃ ১-৩

৮। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্মত গীতাভাষ্য আছে কি ?

"দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত ; বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধরস্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তিপোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটী সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দবৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তশিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুযায়ী 'রসিকরঞ্জন' নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত একটী গীতাভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতিরস, এতদুভয় বিষয়ই পরিপূর্ণ ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত। চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃতভাষা প্রাঞ্জল"। —গীঃ, রঃ রঃ ভাঃ

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিদ্বদ্রঞ্জন'-ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা কি ?

"মায়াবাদ-মেঘাবৃত, গীতাতত্ত্বচন্দ্রামৃত,
ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণ।
পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে, প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,
পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ ॥
তাঁ'র ভাষ্য অনুসারে, গীতামৃত ভাষ্যাকারে,
ভক্তিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি।
বিদ্বদ্রঞ্জন আখ্যা, করিয়াছে ভাষা ব্যাখ্যা,
শুদ্ধভক্তে করিয়া প্রণতি ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হন, গীতারত্ন-মহাজন,
তাঁ'র পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

এ দাসেরে কৃপা করি',　　মস্তকে চরণ ধরি',
শক্তিদানে পূর্ণ করুন কাম ॥
জগজ্জীবে কৃপা করি',　　যে আনিল গৌরহরি,
যে শিখাল গীতাতত্ত্বসার।
তাঁ'র কৃপা যদি পাই,　　তত্ত্বসিন্ধু-পারে যাই,
ইথে কি সন্দেহ আছে আর ॥
হে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ,　　হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ,
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া গদাধর।
হে জাহ্নবা, বংশী, রূপ,　　সনাতন, হে স্বরূপ,
রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর ॥
আমি অতি দীন হীন,　　তব কৃপা সমীচীন,
মূঢ়ে সিদ্ধিসার দিতে পারে।
কৃপা করি' বিঘ্ন নাশি',　　প্রকাশিয়া তত্ত্বরাশি,
দেহ' শক্তি ভাষ্য রচিবারে ॥"

—'মঙ্গলাচরণ', বিঃ ভাঃ

১০। 'ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশনী' টীকার উদ্দেশ্য ও ভূমিকাটী কি ?

"প্রচুর-সিদ্ধান্ত রত্ন,　　সংগ্রহে বিশেষ যত্ন,
করি' ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণে স্তবিল।
এই গ্রন্থে সেই স্তব,　　মানবের সুবৈভব,
পঞ্চম অধ্যায়ে নিবেশিল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাসিন্ধু,　　কলি-জীবের একবন্ধু,
দাক্ষিণাত্য ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এ 'ব্রহ্মসংহিতা' ধন,　　করিলেন উদ্ধরণ,
গৌড়-জীবে উদ্ধার করিতে ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া,　　তার টীকা বিরচিয়া,
শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়।
শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণে,　　মহা-কৃপাপূর্ণ মনে,
এ গ্রন্থ অর্পিলা সদাশয় ॥
সেই ব্যাখ্যা অনুসারে,　　আর কিছু বলিবারে,
প্রভু মোর বিপিনবিহারী।
আজ্ঞা দিলা অকিঞ্চনে,　　এ দাস হর্ষিত-মনে,
বলিয়াছে কথা দুই চারি ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদি', শুদ্ধবুদ্ধি-সহ যদি,
ভক্তগণ করেন বিচার।
কৃতার্থ হইবে দাস, পূরিবে তাহার আশ,
শুদ্ধ ভক্তি হইবে প্রচার॥
ভক্তজন-প্রাণধন, রূপ, জীব, সনাতন,
তব কৃপা সমুদ্র সমান।
টীকার আশয় গূঢ়, যাতে বুঝি আমি মূঢ়,
সেই শক্তি করহ বিধান॥
শ্রীজীব-বচনচয়, পুষ্পকলি শোভাময়,
প্রস্ফুটিত করিয়া যতনে।
গুরু-কৃষ্ণে প্রণমিয়া, শুদ্ধভক্ত-করে দিয়া,
ধন্য হই, এই ইচ্ছা মনে॥"

—ব্রঃ সং প্রঃ, 'মঙ্গলাচরণ'

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা বুঝিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবার পূর্ব্বে গুরুসেবা; সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা না হইলে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ বুলি আওড়ায়, আমরা সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করিলে কোন মঙ্গল লাভ হইবে না, কিন্তু কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থাকিয়া যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ করিয়াছি মনে করি, তাহা হইলে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নাম দৈন্য। আর সেই অবস্থা উপলব্ধি না করার নাম দম্ভ।

ভগবানের আরাধনা সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁহার আরাধনা ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সেবা অনেকেই করেন, তদীয়গণের সেবা—যাঁহাদের সেবার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ও ব্যস্ত, সেই বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য অজ্ঞ প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—বৈষ্ণবের সেবা। যেখানে মূর্ত্ত-ভগবদ্বিগ্রহ, যেখান হইতে ভগবদ্বিগ্রহের জীবন্ত কথা প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাওয়া যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও বড়। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার করিয়াছেন। চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু—পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যেইকালে আমরা বুঝিতে না পারি, সেইকাল পর্য্যন্ত মনে হয়, তিনি একজন ভক্ত বা অন্যান্য মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্য-বিশেষ, ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র; কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ; তিনি পরমেশ্বর-বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণাম-শীল কোন বস্তু-বিশেষ নন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনি থাকিবেন। তিনি সকলের কারণের কারণ বস্তু। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তাঁহার রূপ—গৌরকান্তি, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান, তাঁহার স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না, যা অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার মহাবদান্যতা-গুণের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। যখন বস্তুর একত্ব থাকে, তখন সম্বন্ধ বলিয়া কোন শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। বস্তুর বৈচিত্র্য একের অধিক হইলেই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হয়। সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হইলে জীব জানিতে পারেন যে, সেই বহু—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মূল আকর বস্তু; ইহা যিনি বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের হরিকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫১ পৃষ্ঠার পর]

আমরা গণিত-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—**Plus one is greater than minus any large amount or infinity** অর্থাৎ **minus** (বিয়োগ) **power** এর সংখ্যা কোটী কোটী নির্দ্ধারিত হইলেও, উহা **plus** (যোগ) 'এক' অপেক্ষা বহু নিম্নে অবস্থিত। মায়িক জগৎ 'অভাবের' দ্বারাই নির্ম্মিত। সুতরাং ইহা সর্ব্বদাই **minus power** ; কিন্তু অপার্থিব অপ্রাকৃত জগৎ পূর্ণ। সুতরাং সে-স্থানের একটী বালুকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বস্তুও পূর্ণ-স্বরূপ। তাহাতে মায়িক অভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার একটী বালুকণা-স্বরূপ কপর্দ্দকও পূর্ণ বস্তু, এবং তাহা অভাবপূর্ণ মায়িক জগতের কোটী কোটী অপূর্ণ অর্থস্বরূপ প্রাণী অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষাই অপ্রাকৃত জগতের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পার্থিব জগতেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন নহে। কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট্ তাঁহার নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সৈনিকের প্রাণবধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সম্রাটের ঐরূপ ইচ্ছাপূরণই তখন সৈন্য-সেনাপতিগণের জীবন উৎসর্গের হেতু হয়।

সাধারণ সৈনিকগণ নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অথবা স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই বন্ধুগণের-অনিত্য অস্থায়ী ভোগ-বিলাসের জন্য মাসিক সামান্য কয়েকটী মুদ্রা লাভের আশায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হয়। এমন কি, স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, ভালবাসা যাহা কিছু সমস্তই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখা যায়। কিন্তু আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য তাহার কতটুকু করিয়া থাকি ? যে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির দ্বারা আমার অনন্তকাল সুখ-সম্পদের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ কথা দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা কি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের লক্ষণ ? প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁহার হৃদয় কত উদার, কত প্রশান্ত, কত মহান্! আমরা ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকগণের বৈষ্ণব-প্রীতির পরিমাণ বুঝিয়া লইতে পারি।

আমাদের মধ্যে কেহ যদি **Contagious** বা **infectious** (সংস্পর্শজ বা সংক্রামক) কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখনই ধরা পড়িয়া যায় কাহার কতদূর বৈষ্ণবে প্রীতি। আমরা তখন পুনরায় ঐ ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ভয়ে বা

প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অন্যত্র যাইতে দ্বিধাবোধ করি না। ইহা কি অনিত্য পূঁজ-রক্ত-মিশ্রিত মাংসপিণ্ড-স্বরূপ শরীরের প্রতি মমতার লক্ষণ নহে?—যে শরীর অদ্য বা বর্ষশতান্তে অবশ্যই পতিত হইবে। আমরা সর্ব্বদাই পাঠে, কীর্ত্তনে, বক্তৃতায় বলিয়া থাকি,—'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়,' অথচ সর্ব্বদাই তাহার প্রাধান্য দিয়া থাকি। কথা ও কাজে যদি একরূপ না হইল, তবে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া লোক ঠকাইয়া লাভ কি? সত্যসঙ্কল্প বৈষ্ণবের প্রধান গুণ। আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি,—বৈষ্ণবের জন্য প্রাণ দিতে হইবে, বৈষ্ণবের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবার জন্যই করিতে হইবে। ইহা কি কেবল বাক্যবিন্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে? কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকে কোন পাষণ্ড তাহা হইতে বাধা প্রদান করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে—ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আপনারা "জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়" গীতটী শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে একটী ঘটনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। যথা, "কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যারা, তা' সবার দোষ ক্ষমা করি" ইত্যাদি। এই পদটী কুলিয়ার যে ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আমার স্মরণ হইতেছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ সেবকগণের সেবা প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বহু যাত্রীসঙ্ঘের সহিত শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা লইয়া চাঁপাহাটী যাইবার পথে নবদ্বীপ কুলিয়া-সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে কুলিয়ার কতকগুলি পাষণ্ড তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈষ্ণবের ইচ্ছামাত্রে সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত হইলেও জগতে সেব্য ও সেবকের মহিমা প্রকাশ করাই আচার্য্যের আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই সেই সময়ে কলির তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ কোন এক শুঁড়ির গৃহে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সেবকগণের আর্ত্তি ও আসক্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। তখন দুই একজন ব্যতীত ঐরূপ দুরবস্থার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্যগণ স্ব-স্ব জীবন লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা সহস্র সহস্র গুণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। এমন সময়ে, তাঁহার কোন সেবক পরস্পর বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে ছদ্মবেশে সেস্থলে দুর্দ্দান্ত কলির চরগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে নিরাপদে লইয়া গিয়াছিলেন।

ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই গুরুসেবকের প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে। যাঁহারা

গুরুপ্রেষ্ঠ, প্রভুপ্রেষ্ঠ বা আচার্য্যপ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত এবং যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অনুগত জন বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, অথবা যাঁহারা মঠ-মিশনের সৃষ্টিকর্ত্তা বা তাঁহার প্রধান সহায়ক বলিয়া গৌরব করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাহাকেও সেই অশুভ মুহূর্ত্তে গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। গুরু-সেবায় প্রাণ বিসর্জ্জন করাই গুরুসেবকের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনারা আচার্য্যের এই প্রকার একটী লীলা-বিলাসের প্রতি মর্ত্ত্য ধারণা করিবেন না। যেহেতু, এইরূপ ঘটনাই আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য মহিমা-প্রকাশক।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীরামানুজের জীবনী স্মরণ করুন। তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিপক্ষদল তাঁহাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, একনিষ্ঠ প্রধান শিষ্য আচার্য্য কুরেশ শ্রীরামানুজকে স্বীয় বেষ পরাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও কাপালিকের হস্তে হত হইতে উদ্যত হইলে আচার্য্য পদ্মপাদ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গুরু-সেবকের ইহাই আদর্শ। এইরূপ প্রত্যেক আচার্য্য-লীলাতেই তাঁহাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য স্বভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অপরপক্ষে, সেবকের তারতম্য-মূলক বিচারও জগজ্জীবের শিক্ষার নিদর্শন হইয়া থাকে। তাই বলি, ক্ষেত্র উপস্থিত হইলেই সেবকের সেবা-প্রবৃত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৯ পৃষ্ঠার পর]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্য-জাতি-গুণ-ক্রিয়াভির্দীনজনৈক-বিষয়াপার-করুণাময়ীতি শ্রুতি-পুরাণাদি-বিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥ ইতি

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লেকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগ-গত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষ ভবতি—

তথা চৈবোক্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

ইতি স্কান্দ-চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্যানুসারেণ। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭০ অনুচ্ছেদ)

যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া-বিষয়ে দীন অর্থাৎ অযোগ্য বা অসমর্থ, ভগবান্ তাহাদের একমাত্র অবলম্বনরূপে অপার করুণারূপিণী এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন ; ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই কলিযুগে মানবগণের দীনত্ব বা অযোগ্যতা বর্ণিতও হইয়াছে, যথা—তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কলিযুগে সুনিপুণ পুরুষগণ-কর্ত্তৃক আচরিত হইলেও তাহা সুষ্ঠু হয় না। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃই অতিদীন-ভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপা ভক্তি অনায়াসে অন্যান্য যুগগত মহাসাধন-সমূহের ফল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যেহেতু হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগে বিশেষভাবে ভগবানের সন্তোষ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যেও এইরূপ উক্তি আছে যে,—শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই উত্তম-তপঃস্বরূপ। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য কলিযুগে বিশেষরূপে তাহার অনুষ্ঠান জগতে করা কর্ত্তব্য।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

ন চ কলাবল্পসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি, ন তু তস্য গরীয়স্তেনেতি মন্তব্যম্। "যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥"—ইতি সমাধি-পর্য্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্ত্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অতএবোক্তম্—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" ইত্যাদি। তথাচ—

"অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেন কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥" ইতি

বৈষ্ণব-চিন্তামণৌ।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

ইত্যন্যত্র। "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদি নামাপরাধস্তোত্রে চ, তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র প্রশংসেতি স্থিতম্। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৩ অনুচ্ছেদ)

কলিযুগে অন্য সাধনবিষয়ে মানবগণের সামর্থ্য নাই বলিয়াই অল্প সাধনস্বরূপ

হরিনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই মহাফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, পরন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন নহে—এইরূপ মনে করা উচিত নহে। যেহেতু—"যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে পুরুষ নরকগামী হয় না, যাঁহার ধ্যানে স্বর্গ-সুখও বিঘ্নরূপে অনুভূত হয়, যাঁহার প্রতি আত্ম-মনঃসংযোগ করিলে পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্মলোক ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন হইতে যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি ?" এই বাক্যে সমাধি পর্য্যন্ত স্মরণ হইতেও কৈমুত্যন্যায়ানুসারে বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠসাধনত্ব দর্শিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে—"এ অভয় হরিনাম-কীর্ত্তনই সংসার-বিরক্ত, কামী ও যোগী সকলের পক্ষে কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত আছে"—এইরূপ বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে পাওয়া যায়,—"বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপ বিনাশন, উহা বহু প্রয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু **ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রদ্বারা যে কীর্ত্তন তাহা উক্ত স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ**। শাস্ত্র আরও বলেন,—"যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতজন্ম বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বিরাজমান থাকেন।" নামাপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রেও "শ্রীহরির চরণে অপরাধ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট হয়"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীহরি-কীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জানিতে হইবে। পরন্তু কলিযুগে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে উহা গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাহার প্রশংসা শুনা যায়; ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন নিখিল সাধন-শিরোমণি। এই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ স্বভক্তি ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" "কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সঙ্কীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥"—(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।২২)। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু নিজে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া সকলকে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও নাম-প্রেমপ্রদাতা। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহাই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ। আমরা নিম্নে তাঁহার আরও কতিপয় অমূল্য উপদেশ উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে বলিয়াছেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৮)

গৃহস্থভক্তগণকেও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (ঐ ১৬।৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী-ভক্তগণকেও বলিয়াছেন,—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ (ঐ ৬।১৩।১২১)

শ্রীচৈতন্যদেব আরও বলিয়াছেন,—

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৮)
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৭)

সিদ্ধমহাত্মা নামাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"**শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি, তাঁহার আজ্ঞা পালনে তাঁহার তত চেষ্টা।** জীবনটী কৃষ্ণনামময় করাই প্রভুর উপদেশ। শ্রীমহাপ্রভুতে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কৃষ্ণনামে তাঁহার অবিশ্বাস হয় না। প্রভু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস

করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কৃপাভিখারিণী বেশ্যাকে বলিয়াছেন,—

নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীনারদও নিজশিষ্য ব্যাধকে বলিয়াছেন,—

তুলসী পরিক্রমা কর, তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৫৫)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর]

ভারতীয় ধর্ম্ম বলিতে মূলতঃ সনাতন ধর্ম্মকেই বুঝায়। বর্ত্তমানে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্ম এই সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ও নানারূপ আংশিক প্রকাশ। এই সনাতন ধর্ম্ম নিত্যবর্ত্তমান, উৎপত্তি-বিনাশহীন এবং বেদ-বর্ণিত। বেদ অপৌরুষেয় বাণী বিধায় ইহার সার্ব্বিক ধারণা জীববুদ্ধির অতীত। জীব আপাত ও খণ্ডিত-বিচারদ্বারা তাহার সম্যক্ অভিজ্ঞান লাভে অযোগ্য। এই হেতু বেদ-প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম'-বিষয়ে নানারূপ মতবাদ বর্ত্তমান। "বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়"—এই বাক্য সুসত্য। আপাত-বিচারে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ব্রহ্ম' হইলেও প্রকৃত বিচার—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"—(গীঃ ১৫।১৫), "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"—(ঐ ১০।৮), "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" (ঐ ১৪।২৭), "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"—(ঐ ৭।৭) ইত্যাদি বাক্যগুলি পরব্রহ্ম, পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত।—এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের অসম্যক্ প্রকাশ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্বের বাক্য নহে। শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম বলিয়া

শাস্ত্রে সর্ব্বত্র উক্তি আছে ; কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-তত্ত্বকে কোথাও 'কৃষ্ণ' বলিয়া উক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব যে চতুর্ব্বিধ গুণাবলী তাহা ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম। তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মুরলী বাদনাদি করিতে সক্ষম নহেন। রূপ-গুণ-লীলা ও প্রেম মাধুরীতে তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নহেন। "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলরারিধি, অতুল্য মধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল, ত্রিজগন্মনসাকর্ষিমুরলীকলকুজিত এবং অসমোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর"—এই চতুর্ব্বিধ গুণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ। এই গুণ চতুষ্টয় শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং আংশিক বা অসম্যক্ প্রকাশকে শাস্ত্র বা বেদ পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বর্ণন করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করোক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয় ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণবাচক নহে। এতদ্বিষয়ে বেদ ও তদনুগত পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রচুর প্রমাণোক্তি বিদ্যমান। সর্ব্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকটী এ বিষয়ে প্রমাণ শিরোমণিরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

তথাপি বেদনিষ্ঠ আচার্য্যগণ বেদোক্ত 'ব্রহ্ম'-তত্ত্বের সুষ্ঠু ধারণা প্রদান করিবার জন্য নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই দার্শনিক জগতে কেবলা-দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব নামে প্রখ্যাত। এতৎপূর্ব্বকাল হইতে চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিকাদি কতিপয় নাস্তিক ও আংশিক আস্তিক্যবাদও ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। পরন্তু যাবতীয় মতবাদের উৎপত্তি বিচার করিলে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭।২৩।১ মন্ত্রটীতে দেখা যায়—**'সুখ' বস্তুটীকে** জ্ঞাত হইবার চেষ্টামূলেই দার্শনিক প্রবৃত্তি। —"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য।" অর্থাৎ যাহা ভূমা (সর্ব্বাধিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম, অসমোর্দ্ধ ও পরাৎপর) তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকেই বিশেষভাবে জানা আবশ্যক।

চার্ব্বাক-মতবাদ—চার্ব্বাক=চারু+বাক্, অর্থাৎ আপাতমনোরম বাক্য। ইহা মনোরম হইলেও সত্য নহে। পরিণামে ইহা দুঃখজনক। চার্ব্বাকমতে স্থূল মায়িক দেহ ব্যতীত আত্মার চিৎকণত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য কুতঃ পুনরাগমনম্।" এই মতে পুনর্জন্ম মিথ্যা। দেহ ভস্মে পরিণত হইলে তাহার পুনরাগমন অসম্ভব। অতএব, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং

জীবেৎ।" সুখভোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকিলে ঋণ করিবে, পরিশোধের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। পরকাল কোথায়? উহা মিথ্যা। শাস্ত্র বা বেদ—ধূর্ত্তের বাক্য। প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণ নাই। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। স্থূল দেহের বিনাশ হইলেই মুক্তি লাভ হয়। স্ত্রীসম্ভোগই সুখ; কণ্টকাদি-জনিত দেহের দুঃখই নরক। এই মতের অন্য নাম—'লোকায়ত'। অর্থাৎ সাধারণ লোকের মধ্যে সহজেই যাহা বিস্তার লাভ করে। বৃহস্পতি এই মতের আদিগুরু। তাঁহার ভ্রাতা উতঙ্কের পত্নী মমতাতে বলপূর্ব্বক গর্ভসঞ্চার ইহার নিদর্শন। এই মতে রাজাই পরমেশ্বর। পরমেশ্বর বলিয়া অন্য কোনও তত্ত্ব নাই। সুতরাং এই মত নাস্তিক্যবাদ।

জৈনদর্শন—ইহাতে চার্ব্বাকের ভোগবাদের বিপরীত শুষ্ক-বৈরাগ্যদ্বারা স্থবিরত্বলাভই মুক্তি বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মতে ঈশ্বর ও বেদের স্বীকৃতি নাই। ঋষভদেবের ভাগবত-পরমহংসলীলা ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের রাজন্যবর্গ বেদ-বিরোধী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের স্বীকার নাই বটে কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও দেবতার স্বীকার আছে। সর্ব্বজ্ঞকে জৈনমতে তীর্থঙ্কর এবং স্বর্গবাসী জীবগণকে দেবতা বলা হয়। জৈনগণ দুইভাগে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী এবং দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ। এই দুই সম্প্রদায় মধ্যে দার্শনিক ভেদ নাই; পরন্তু আচারগত ভেদ আছে। ইহাঁরা ঋষভদেবকে আদি তীর্থঙ্কর এবং মহাবীরকে শেষ তীর্থঙ্কর বলেন। এই মত গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া ধারণা করা হয়। জৈনমতে মুক্তি হইলে দুঃখের অবসান হয়। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে মায়ামোহ-নামক একটী তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া কতিপয় অসুরগণকে অর্হৎ (জৈন)-ধর্ম্ম এবং অন্য অসুরগণকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধদর্শন—অনেকেই বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার জ্ঞান করেন। দশাবতার-মধ্যে বুদ্ধেরও উল্লেখ বর্ত্তমান। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ ও গৌতম-বুদ্ধ বা শাক্যসিংহ-বুদ্ধ যে পৃথক্ তাহা অনেকেই অবগত নহেন। কবি শ্রীজয়দেব দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধদেবের বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্-বুদ্ধ কীকট দেশে অর্থাৎ গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং গৌতম-বুদ্ধ নেপালের সন্নিকট কপিলাবস্তু নগরের লুম্বিনী বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম-বুদ্ধের জননীর নাম 'মায়াদেবী' এবং পিতার নাম শুদ্ধোদন। ভগবান্-বুদ্ধকে অঞ্জনাসুত বলা হয়। ভগবান্-বুদ্ধের জন্মস্থান গয়াতে। গৌতম-বুদ্ধ তথায় সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, গয়াতে গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গৌতমবুদ্ধ ন্যূনাধিক আড়াই হাজার বৎসর

পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবান্-বুদ্ধের আবির্ভাব-কাল জ্যোতিষমতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। নিজকে কেহ নাই বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে না। গৌতমবুদ্ধ ভগবান্ ছিলেন না বলিয়াই ভগবান্ নাই বলিয়াছেন। তিনি অতিজ্ঞানী জীব ছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞ আচার্য্যগণের বিচার।

গৌতমবুদ্ধই শূন্যবাদের প্রচারক। বেদ বর্ণিত ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে জগদাদির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমস্তকিছুই ভগবানে আশ্রিত ও তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—একথা গৌতমবুদ্ধ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জগৎ, জীব এবং ঈশ্বর কোনটীই সত্য নহে। অতএব শূন্যই সত্য। বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, একক্ষণের অধিক কাহারও স্থিতি নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কাল ক্ষণস্থায়ী ; অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই দীর্ঘস্থায়ী। গৌতমবুদ্ধের সার উপদেশ "সর্ব্বং অনিচ্চং, সর্ব্বং দুক্খং, সর্ব্বং অনাত্মং"—সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাত্ম। "জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সঙ্খার পরমদুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নির্ব্বাণং পরমং সুখম্।" পরন্তু এই মত আকাশ-কুসুমবৎ অলীক কল্পনামাত্র। কারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বিনাশ বা নির্ব্বাণ হইলে সুখ এবং উহার অনুভবকর্ত্তাও বিনষ্ট হয় না কি? অতএব শিরশ্ছেদ করত শিরঃপীড়া হইতে অব্যাহতিলাভের ন্যায় ইহা মূঢ়তা-ব্যঞ্জক।

সাংখ্যদর্শন—ইহাকে প্রকৃতিবাদ বলে। প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি ; ঈশ্বর বলিয়া মূল-কর্ত্তা কেহ নাই। এই মত অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল ঋষির। ইনি প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ১১টী ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন), ৫টী তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), ৫টী মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) এবং পুরুষ—মোট ২৫টী তত্ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু কর্দ্দম-দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবান্ কপিল ২৬টী তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনিই সাংখ্য-সিদ্ধান্তের মূল-প্রবর্ত্তক। নিরীশ্বর কপিলের মতে ঈশ্বর বলিয়া কোন তত্ত্বদ্বারা জগতের সৃষ্টি হয় নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের উল্লেখ তাহা মুক্ত পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অন্ধ-খঞ্জ-ন্যায়রূপে প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিত হইয়াই জগতের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর বলিয়া কোন তত্ত্বের কর্তৃত্ব ইহাতে নাই। পুরুষ নিজ তত্ত্ব উপলব্ধি করিলেই মায়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

পাতঞ্জল দর্শন বা যোগদর্শন—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাকে যোগ বলে। মায়িক রজোগুণ হইতে চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা কেবল জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয় না বলিয়া পতঞ্জলির মত। তজ্জন্য যোগসাধনদ্বারা চিত্তকে বিশীর্ণ করা

প্রয়োজন। পতঞ্জলি ঋষি সাংখ্যের ২৫টী তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত পরমাত্মাকে স্বীকার করত ২৬টী তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরমাত্মা বা ঈশ্বর জীব-জগতের কারণ নহেন। সাংখ্যের মুক্তিই পাতঞ্জল-সাধ্য। যোগ-সাধনকালে কতকগুলি অলৌকিক শক্তিও সাধকের লাভ হইয়া থাকে। ঐগুলি অণিমাদি আখ্যায় অষ্টাদশ সংখ্যক। এই মতে কেবল দুঃখনিবৃত্তিই চরম ফল। দুঃখ নিবৃত্তির পর পরমানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের নিত্যসেবা ও তজ্জনিত প্রেমতত্ত্বের কোন সম্পর্ক ইহাতে নাই। এই মতোক্ত পরমাত্মাকে ভগবানের আংশিক প্রকাশ বলিয়া শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন—ইহা গৌতম ঋষির প্রণীত। পরন্তু অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় ইহাও অনাদিসিদ্ধ; গৌতম ঋষি সূত্রাদি রচনাদ্বারা এই দর্শনকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন মাত্র। ইহার অপর নাম—'অন্বীক্ষিকীবিদ্যা'। অর্থাৎ নানাভাবে বিচার বা পর্য্যালোচনাদ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ইহার স্বরূপ। নৈয়ায়িকগণ দশপ্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই ৪টী স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে অনুমান প্রমাণের উপর বিশেষ বিচার প্রধানরূপে লক্ষ্য করা যায়। এই মতে বিচারদ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া বুদ্ধির নাশ হয়, তখন আর কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না। প্রবৃত্তিহীনতাই আত্মার সহিত দেহ-মনের সংযোগকে ধ্বংস করে। এইভাবে আত্মা সুখ-দুঃখাদির অতীত অবস্থা লাভ করে। ইহাই ন্যায়দর্শনের অপবর্গ। ঈশ্বরসম্বন্ধজনিত নিত্যানন্দ বা প্রেমানন্দের বিচার ইহাতে নাই। যদ্যপি এইমতে সৃষ্টিকর্ত্তারূপ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে পরন্তু তাঁহার আনন্দস্বরূপের আলোচনা এই শাস্ত্রে নাই। ন্যায়মতে জগৎকারণ ঈশ্বরকে দর্শন না করিলেও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তিকালে নব্যন্যায় উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই উভয় ন্যায় ও ষড়্‌দর্শনের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বিচার-ধারাকে খণ্ডন করত তাঁহাকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। স্বীয়-রচিত বন্দনায় শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয় তাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন।—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

বৈশেষিক দর্শন—উলুক-পুত্র কণাদ ঋষি এই বৈশেষিক দর্শন রচনা করেন। কণ + অদ = কণাদ। তণ্ডুলকণ ভক্ষণদ্বারা জীবন ধারণ করিতেন বলিয়া তিনি

কণাদ নামে বিখ্যাত। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি লাভ হয় তাহাই কণাদ ঋষি ধর্ম্ম বলিয়াছেন। পদার্থ বা দ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি-লাভ ঘটে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মাদি ছয়টী পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে অভাব ৪ প্রকার।—প্রাক্-অভাব, ধ্বংস-অভাব, পরস্পর-অভাব ও আত্যন্তিক-অভাব। তিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের স্বীকার নাই। আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে এবং কৃতকর্ম্মের উন্নতির দ্বারা আত্মা মুক্ত হইতে পারে বলা হইয়াছে। বেদোক্ত দেবতাগণকে বেদবক্তাগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেও ঈশ্বরকে মূল কারণ বলিয়া উক্তি তাঁহার মতে নাই। বৈশেষিক ও ন্যায়-মতে পরমাণু মূল-কারণ এবং তাহাদের সংযোগেই জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে আরম্ভবাদ বা পরমাণুকারণবাদ বলা হয়। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

"রাধিকার দাসী যদি হোয় অভিমান"

বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতি অখিল শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরাৎপর তত্ত্ব; তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বেতাশ্বতর)। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—"অদ্বয় জ্ঞান কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় ব্রহ্মা স্তব করিয়াছেন, —"**ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ** সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ **সর্ব্বকারণ-কারণম্**॥" ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপের পরিচয়-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ সেবাই জীবের প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ॥" উক্ত শ্লোকের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয়,—জীবের আরাধ্য একমাত্র ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহার প্রেমই পরম-পুরুষার্থ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা—ব্রজবধূগণের ভাবানুগমন।

বিচার্য্য বিষয়,—পরাৎপর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তিনি সর্ব্বজীবের আকর্ষণকারী। তাঁহাদের জড়ীয় সুখভোগ হইতে নিবৃত্তি করাইয়া পরমানন্দ ও পরমাশ্রয় প্রদানকারী। তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সেব্যতত্ত্ব হইয়াও প্রেমবশ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"অনুব্রজমহং নিত্যং পুয়েয়ত্যঙ্ঘ্রি রেণুভিঃ" ভক্তের চরণরেণু অঙ্গে মাখিয়া পবিত্র হইবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন।

কুঞ্জের অভ্যন্তরে শ্রীমতী রাধারাণীর "যাবক"-চিহ্নিত শ্রীপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপন মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া নিজকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন,—"যাবক"-চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের শিখিপিচ্ছ-শোভিত মস্তকের শিরোভূষণ হইয়াছে এবং "যাবক রস" শ্যাম-বক্ষঃস্থলে মুদ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্রীকবি কর্ণপুর "অলঙ্কার-কৌস্তভ"-গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন,—"শ্রীবৎস চ কৌস্তভস্য চ রমাদব্যশ্চ গর্হাকরো রাধাপদসরোজ যাবক-রসো বক্ষঃস্থলস্থো হরেঃ।"

শ্রুতি "রসো বৈ সঃ" আনন্দ-ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া যে ভগবৎস্বরূপের ইঙ্গিত করেন, সেই রস বা আনন্দের ঘনবিগ্রহ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীর চরণ-প্রান্তে লুণ্ঠিত—"রসঘনমোহন মূর্ত্তিং বিচিত্র কেলিমহোৎসবোল্লাসিতাম্ রাধাচরণ-বিলোড়িত-রুচিরং শিখং হরিং বন্দে"। (রাধারসসুধানিধি)।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী 'গীতগোবিন্দ' রচনাকালে, শ্রীমতীজীর দুর্জ্জয়-মানভঙ্গে অসমর্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অতঃপর শ্রীজীর চরণকমলে সকাতরোক্তি—"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লব মুদারম্" লিখিতে সক্ষম হইলেন না। পরাৎপর শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিরূপে অধীন শক্তিতত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করিবেন, এই চিন্তায় হৃদয় কম্পিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া সেই শ্লোকের পাদপূরণ করিয়া বিশ্বে শ্রীমতীজীর প্রেম-মহিমা বিঘোষিত করিলেন। "প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভৎর্সন। বেদ-স্তুতি হৈতে হরে মোর মন॥" (চৈঃ চৈঃ)

তত্ত্বদর্শনে আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বনিয়ন্তা। কিন্তু রসগত-বিচারে ভক্তের নিকট তিনি বশীভূত, তাঁহাদের প্রেমের নিকট তাঁহার স্বতন্ত্রতা, ঈশিতা যেন হারাইয়া যায়। বিশেষ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বচূড়ামণি শ্রীমতী রাধারাণীর পরিপূর্ণতম প্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে বশীভূত, পরাভূত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চিত্তরূপী অতিপ্রবল হস্তী শ্রীমতীর কুটিল-কটাক্ষরূপ বারী-দ্বারা নিরুদ্ধ,—"অলঘু-কুটিল-রাধাদৃষ্টিবারী-নিরুদ্ধঃ ত্রিজগৎ-পরতন্ত্রোদ্দাম চেতো-গজেন্দ্রঃ" (স্তবমালা)। কন্দর্পকোটী-বিমোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও যাঁহার রূপ-গুণ-বিমোহিত হইয়া থাকেন,—"জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।" (চৈঃ চঃ)।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্,—"কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যঃ" (ব্রহ্মসংহিতা)। সেই পরমপুরুষ শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারাণীর দাসীর নিকট করজোড়ে চাটুবাক্যে প্রার্থনা জানাইতেছেন,— "যৎ কিঙ্করীষু বহুশঃ খলু কাকুবাণী, নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ড মৌলেঃ।" নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব যাঁহার করুণা-প্রার্থী, সেই অসমোর্দ্ধ, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমতী রাধিকার কুঞ্জদ্বারিণীর নিকট কৃপাপ্রার্থী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ পরিকর-ধামসহ অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম-শিবাদিরও অলভ্য ব্রজপ্রেম জগতে প্রদান করিলেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।" 'স্বভক্তি' অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-মধুরিমা আস্বাদন এবং "শ্রিয়ম্"-শব্দে শোভা, শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম-শোভারূপ মঞ্জরী বা কিঙ্করীভাব প্রদান করিলেন। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমসেবার চরম মূর্ত্তবিগ্রহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপ গোস্বামীর আনুগত্যে ভজনেচ্ছুকগণের চরম কাম্য এবং সাধ্য—শ্রীমতীজীর দাসীত্ব তথা পাল্যদাসীত্ব।

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর-দাস্যমেব, নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং, দাস্যায়তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥" (বিলাপকুসুমাঞ্জলি)। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রার্থনা জানাইতেছেন,— 'হে রাধে! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অন্য কোন যাচ্ঞা নাই, শুধু তোমার দাস্যপদে নিযুক্ত কর।' কিরূপ দাস্যপদ? 'বরদাস্য'—অর্থাৎ যতপ্রকার দাস্যপদ আছে, তাহার মধ্যে শ্রীরাধাদাস্যই শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করিয়া সখীগণেরও রহস্যময় নিভৃত-নিকুঞ্জ-লীলায় সেবার অধিকার নাই, মঞ্জরী বা দাসীগণের নিঃসঙ্কোচে সেই সেবার একমাত্র অধিকার। মঞ্জরীগণ সখীর কক্ষেতে থাকিয়াও সেবৈকনিষ্ঠত্বের জন্য দাস্য এবং সৌভাগ্যে সখীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। বিকশিত পুষ্পের শোভা বিস্তারকারিণী মঞ্জরীগণ ভ্রমরকে আকর্ষণ করিয়া পুষ্পের সহিত মিলিত করেন। ভ্রমর পুষ্পের মধু আহরণ করে, উহা মঞ্জরীর কার্য্য নহে। শ্রীমতী রাধারাণী "কৃষ্ণ ক্রীড়া-পূজার বসতি নাগরী" (চৈঃ চঃ)। সুতরাং সেই রাধিকা-দাসীগণের মহিমা অপার, বেদেরও অগোচর।

শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীরাধার দাস্যাভিলাষ করিতেছেন, —"আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ। শ্রীরূপচিন্তামলসপ্তি সংস্থো মৎস্বান্ত-দুর্দান্ত হয়েচ্ছুরাস্তাম্॥"

গোস্বামিপাদগণ শ্রীমতী রাধা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-স্তব-স্তুতি করিয়াছেন,—

"শ্যামসুন্দর শিখণ্ড-শেখর স্মেরহাস মুরলীমনোহর। রাধিকারসিক মাং কৃপানিধে স্বপ্রিয়াচরণে কিঙ্করীং কুরু॥ প্রাণনাথ বৃষভানুনন্দিনী-শ্রীমুখাব্জরস লোল ষট্‌পদ। রাধিকা-পদতলে কৃতস্থিতিং ত্বাং ভজামি রসিকেন্দ্রশেখর।"

জগতের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতীজীর চরণরেণুসেবা অভিলাষ করেন। সুতরাং শ্যামসিন্ধুতে অবগাহন অর্থাৎ শ্রীশ্যামের প্রতি প্রীতি লাভেচ্ছুক সাধক-সাধিকা শ্রীমতীর পদাশ্রয় করিবেন,—"অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্। অসম্ভাষ্য তদ্ভাব গম্ভীর চিত্তান্, কুতঃ শ্যামসিন্ধোর্রসস্যাবগাহঃ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"রাধিকার দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান॥" "বেণুঃ করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং, ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ। যস্যাঃ কটাক্ষ-শরঘাত-বিমূর্চ্ছিতস্য, তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন॥ (রাধারসসুধানিধি) "ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ গতে বৃষভানুজায়াঃ কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে ভজনকারীজনের ইহাই চরম হার্দ্দ কামনা।

—শ্রীযুক্তা উমারাণী দেবী

কার্ত্তিকব্রতে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের বক্তৃতার সারাংশ

শ্রীদামোদর মাসে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা ভক্তহৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শাস্ত্রালোচনা না করিলে তত্ত্বসিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

তিনি সাম্যবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে তাঁহার নির্ভীক ও বলিষ্ঠ দীপ্ত ভাষাদ্বারা প্রকাশ করিলেন যে,—শ্রীকৃষ্ণই সাম্যবাদের একমাত্র মূল প্রবক্তা। জগতে যে সাম্যবাদের রূপ দেখা যায়, তাহা নিরপেক্ষ নহে। নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই সাম্যবাদকে অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহার করিয়া থাকেন। এই তথাকথিত সাম্যবাদদ্বারা জগতের কোন কল্যাণ না হইয়া উৎপাতের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ শাস্ত্র বলেন,—'নিরপেক্ষ না হইলে **'ধর্ম্ম'** না যায় রক্ষণে।' 'নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে গিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাও আলিঙ্গন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণই সাম্যবাদের কথা নিরপেক্ষভাবে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। গীতায় তিনি বলিলেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ (৯।২৯)
বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (৫।১৮)

বর্ত্তমান জগতের সাম্যবাদের ব্যাখ্যা "সব-সমান"। শ্রীকৃষ্ণ এই মতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি গীতায় ও ভাগবতে জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বহু কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৪-২৫)
"ধর্ম্মস্তু বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।" (ভাঃ ১০।১৯।৪০)
"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম্।" (ভাঃ ৬।৩।১৯)
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীঃ ১৮।৬৬)

সাম্যবাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বর্ণন করিয়া, অন্যত্র শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজজী সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে হরিভজনের জন্য ব্যতিরেক পন্থাকেই প্রথমে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

তিনি বলিলেন,—যাঁহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ হরিভজনের প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া নিষ্কপটে ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শাস্ত্র বলিলেন,—

"সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ।
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" (চৈঃ চঃ নাটক ৮।২৪)

"মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সংসার-মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন।

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৯৫)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

এই সাধুসঙ্গের কথা প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজজী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে "সাধ্য-সাধন তত্ত্বের" আলোচনা করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দের প্রশ্নের উত্তরে চার চার বার 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর' বলিলে শ্রীরামানন্দ প্রভু জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধাভক্তির উল্লেখ করিয়া শাস্ত্র প্রমাণ দিলেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ব্রহ্মা বলিলেন,—"হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।"

প্রভু কহে,—'এহো হয় আগে কহ আর।'
রায় কহে,—'প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার॥'

শ্রীল মহারাজজী তাঁহার ভাষণে বলিলেন, সাধু মুখে শুধু ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই হইবে না যদি শ্রোতার প্রেমভাব না থাকে। সেই প্রসঙ্গে তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

"নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।"

অর্থাৎ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় গলিত হয়।

তিনি ধারাবাহিকভাবে তাঁহার বক্তব্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে 'সাধু' 'সাধু' বাদদ্বারা অভিনন্দিত হন।

—**শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, ভক্তিভূষণ

ছাত্রজীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

ছাত্রজীবনেই সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ বীজ রোপিত হইয়া থাকে। Foundation বা ভিত্তি মজবুত না হইলে যেরূপ কোন অট্টালিকার যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ ছাত্রজীবনে জীবন গঠনের ভিত্তি নড়বড়ে হইলে 'প্রকৃত মনুষ্যের' সংজ্ঞা লাভ করা কখনও সম্ভবপর হয় না। পারমার্থিক শিক্ষা বা পরাশিক্ষালাভই ছাত্রজীবনের প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত করাই পরাশিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, পরাশিক্ষার দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়; ধর্ম্মজীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পরাশিক্ষাই সুন্দর জীবনের পরশমণি-স্বরূপা এবং জীবনের মূল্যবোধের পরিচায়িকা। **"Spiritual Education is touchstone of the life and adds value to life."** সুস্থ ও সবল সমাজ গঠনের নিমিত্ত পারমার্থিক শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। **'Education binds & gives strength to society."** পরাশিক্ষালাভই ছাত্রজীবনের প্রকৃত সম্পদ, যাহা চোর বা অন্যকর্ত্তৃক অপহৃত হয় না। **"Education is the real wealth which cannot be stolen."**

পরাশিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকলপ্রকার শিক্ষাই অপরাশিক্ষা বা জাগতিক শিক্ষা। পদার্থবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির শিক্ষা, এমনকি আধ্যক্ষিক শিক্ষাও জাগতিক শিক্ষার অন্তর্গত। অপরাশিক্ষার দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহাতে ভগবদ্ভক্তি বা ধর্ম্মের কোন কথা থাকে না বলিয়া তাহাকে কুশিক্ষা বলিয়া অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। কুশিক্ষা, বিকৃত-শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্যই জগতে ও সমাজে নানা প্রকার অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এমনকি এই পুণ্যময় ভারতবর্ষেও নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন করিবার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ পরিলক্ষিত হইতেছে। লোকে শিক্ষা-দীক্ষার কলাকৌশল আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। বিদ্যাশিক্ষা এবং এই শিক্ষার পরিণামে সংসারে সুখে শান্তিতে বাস—ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য হওয়ায় আদর্শ ছাত্রজীবন গঠিত হইতেছে না। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—এই উক্তি ছাত্রদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। 'অয়ন' শব্দের অর্থ 'পথ'। যে অয়ন আমাদিগকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের আসক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তির

নিলয় বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। আবার 'ছাত্র' শব্দটি 'ছদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ছদ্' ধাতুর অর্থ নিবারণ করা বা ছেদন করা। যিনি পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত জীবের জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচাইয়া জগতে শান্তির এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ছাত্র। দূষিত পরিবেশ সৃজনকারীকে কিছুতেই 'ছাত্র' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

নিরীশ্বর অপরাশিক্ষাই বর্ত্তমানে ছাত্রসমাজের পতনের ও অশান্তির একমাত্র কারণ

যথার্থ দর্শনের বা জ্ঞানের অভাবই 'অবিদ্যা'। অপূর্ণবস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ-বৃত্তির ভূমিকাকে কেহ কেহ 'বিদ্যা' বা 'প্রকৃত শিক্ষা' বলিয়া অভিহিত করিলেও পূর্ণবস্তু ভগবজ্জ্ঞানেই বিদ্যা তথা প্রকৃত শিক্ষার অবস্থান। পরাবিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা-লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা—ইহা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা-বিষয়ক সাধন যদি নিত্য ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহার কুফল সমাজকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। **যে শিক্ষা নিজেকে স্বার্থান্ধ করিয়া তোলে, অপরকে ঠকাইয়া নিজেকে সুখী করিতে শিখায় এবং ছাত্রসমাজের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা কুশিক্ষা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।** কৃষ্টিগত শিক্ষা (**cultural education**) থেকে যদি ভগবদ্‌বিষয়িণী শিক্ষা—আত্মধর্ম্মের শিক্ষা তথা ভগবৎসেবার শিক্ষাটী নির্ব্বাসিত করা হয়, তবে হিংসা ও মৎসরতা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনুষ্যজাতি যাহার জন্য খুবই ব্যস্ত, সেই অপরা বিদ্যার নিপুণতা মরণের কথা দূরে থাকুক্, এই জীবিতকালেই আমাদের কোন একটী ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে নিরর্থক হইয়া পড়ে। আত্মধর্ম্মশিক্ষার আলোচনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে শিক্ষা ছাত্রসমাজে প্রদান করা হয়, তাহা "গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার" ন্যায় নিরর্থক। কোন এক প্রাকৃত কবি লিখিয়াছেন,—

নাইকো ধর্ম্ম, নাই ভগবান্, যাদের শিক্ষামূলে।
ছিন্নমস্তা সেই শিক্ষা শয়তানী ইস্কুলে॥

দার্শনিক Sir Stuart Blacky তাহার 'Self Culture'-নামক গ্রন্থে নিরীশ্বর শিক্ষার মূল্যহীনতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তাহা অবিদ্যা, তাহার কোন মূল্য নাই। সদ্ব্যবহার, জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি করিয়াও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তাহা হইলে যেরূপ সব বিফল হয়; তদ্রূপ

ভগবানকে বাদ দিয়া যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তাহারও কোন মূল্য নাই।"

অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা কখনও ছাত্রগণের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। যদি পূর্ণ চেতন রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা তথা আত্মধর্ম্মের কথা ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনঃকল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রচেষ্টাই আত্মধর্ম্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্র কণ্ঠস্থকরণ কিংবা কয়েকখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার-লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি-লাভই যাহাদের শিক্ষার শেষ সীমা, তাহারা পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। তাই শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলিয়াছেন,—

বিদ্যার উদ্দেশ্য নহে এ বিশ্ববিজয়।
সেবিলে বিশ্বপতিরে বিদ্যা সত্য হয়॥

বুদ্ধিমান্ ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভক্তি লাভকেই বিদ্যার চরম ফল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থলে পাওয়া যায়,—

পড়ে কেন লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ?
তাহারে যে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

প্রভু কহে,—"কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?"
রায় কহে,— "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৫)

অমন্দোদয়দয়া-সিন্ধু মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র অচৈতন্য জগদ্বাসীকে তাহাদের অবিদ্যাজনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার মানসে, কৃষ্ণসেবা লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরাবিদ্যার চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব পড়ুয়া ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—"আমি যে এতকাল যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয়। অতএব হে ছাত্রগণ, তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরমফল-

স্বরূপে অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃ কুমুদজ্যোৎস্না বিতরণ, পরাবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুশীলন করিতে থাক।"

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষ কোনদিনই ধর্ম্মশিক্ষা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষাকে চির নির্ব্বাসিত করিবার প্রয়াস করেন নাই। তাই চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্টি হইলেও মানুষের মনে তাহা রেখাপাত করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণ তর্ককে অস্ত্র করিয়া আধ্যক্ষিকতার চরম সীমায় আরোহণপূর্ব্বক পারমার্থিকতাকে ভুলিয়া যাইতেছেন,—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভাল-মন্দের **comperative study-র** অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হইয়াও অশিক্ষিত অপেক্ষা কোটী গুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হইয়া বিপথে পরিচালিত হইতেছেন দেখা যায়। আত্মধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষার ফলে পরোপকার ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী। অর্থকরী বিদ্যার যে ভয়াবহ কুফল রহিয়াছে, তাহা আমেরিকা, জার্ম্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি ধনী দেশসমূহের প্রতি নজর করিলে অতি সহজেই বুঝা যায়। ভারতবর্ষ কখনও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক শিক্ষাকে শিক্ষা বা সভ্যতাকে সভ্যতা বলেন না।

ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ছাত্রগণ শৈশবেই ভগবদারাধনামূলক বেদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য গুরুগৃহে গমন করিতেন। দ্বাদশ বৎসর বিলাসিতাবর্জ্জনপূর্ব্বক শম, দম, তিতিক্ষা ও পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া তাহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্টপূর্ব্বক সুখময় সংসার পরিচালনায় সমর্থ হইতেন। গৃহে গৃহে বিষ্ণুর আরাধনার যে অনির্ব্বচনীয় শান্তির ধারা বিরাজ করিত, বর্ত্তমানে তাহা নাস্তিকতার প্রাবল্যে এবং দুর্নীতির প্রবল আক্রমণে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ছাত্রগণ মনে করে, তাহারা অর্থের বিনিময়ে অধ্যয়ন করিতেছে, ফলে শিক্ষকদের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা লোপ পাইতেছে। শিক্ষকগণও নানা কারণে ছাত্রদের প্রতি অপত্যস্নেহ সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছেন না। **বৈদেশিক শিক্ষার অসারগ্রাহিতা বা ভারবাহিতা ভারতবর্ষের পারমার্থিক শিক্ষার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে।** পরের বিদ্যাবুদ্ধি ধার করিয়া বিদ্বান বা বুদ্ধিমান্ হইতে গিয়া আমাদের ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ রহিয়াছে, তাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি। বৈদেশিক শিক্ষা কখনও পারমার্থিক ভারতের উপযোগী নহে। ভারতের পরমার্থ-শিক্ষা জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষে আবদ্ধ হইবার নহে, ইহা জীবমাত্রের গ্রহণযোগ্য।

পরমমঙ্গলময়ী ভগবৎসেবা-শিক্ষাই ছাত্রগণের পক্ষে চরম ও পরমশিক্ষা হওয়া উচিত

শ্রুতিতে পাওয়া যায়, "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ভারতবর্ষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার নিজজন শ্রীব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুকাদি মহাজনগণ যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণের চেষ্টাতেই ছাত্রগণের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্র যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক অনুশীলন করিলেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইবে। ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রজীবন ধন্য ও সার্থক হইবে। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিচালিত হইলে জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তাহাতে ছাত্রগণ সত্য সত্য মানুষ বলিয়া পরিচিতি লাভ করিবে। ছাত্রগণের সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, সকল শিক্ষা ভগবদ্‌ভক্তির কৈঙ্কর্য্য লাভ করিলেই তাহারা বিশ্বে পূর্ণ সুখময় ধামের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর]

সভে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
এক কৃষ্ণ-দেহ হইতে সভার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সভার সেই শরীরে প্রবেশে॥
ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিল নিশ্চিত॥

ব্রহ্মা সখা ও গোবৎসগণকে চুরি করিবার পরে কৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে ঐ সমস্ত গোপবালক ও গো-বৎসদিগকে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বয়ং আত্মপ্রকটিত গোপবালক ও গো-বৎসদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং

মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন কৃষ্ণের গো-বৎস অসংখ্য, প্রত্যেকের বেত্র, বেণু, শিঙ্গা, বস্ত্রালঙ্কার, কেয়ূর, কুণ্ডলাদির সংখ্যা অনন্ত। ইঁহারা প্রত্যেকেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেক বিষ্ণুই এক এক বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর, প্রত্যেকেই বহু সংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদ্বারা পূজিত ও স্তুত হইতেছেন; প্রত্যেকের তত্ত্বাবধানেই আবার প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐ ব্রহ্মাণ্ডনাথ ব্রহ্মাদিও আছেন। সুতরাং অসংখ্য বিষ্ণু, অসংখ্য বৈকুণ্ঠ, অসংখ্য পার্ষদ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাদিকে গোবৎস-হরণকারী ব্রহ্মা একই সময়ে গোবৎস-চারণ-স্থানে দর্শন করিলেন। গোবৎস-চারণের স্থানটী কিন্তু এই ভূমণ্ডলের অন্তর্গত বৃন্দাবনস্থ ক্ষুদ্র একটী স্থানমাত্র। এই ক্ষুদ্র স্থানটীর মধ্যেই অনন্তকোটী বিষ্ণু, অনন্তকোটী প্রাকৃত-অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটী ব্রহ্মার স্থান হইল। ইহাই বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মহিমা। ইহাই বৃন্দাবনের বিভূতা বা ব্যাপকতা।

"এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥"

কৃষ্ণের এই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশক্তি যোগমায়া-প্রভাবে প্রকটিত দেখিয়া ব্রহ্মা নিজকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র-জ্ঞানে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঁঞি সব জানো।
সে জানুক, কায়-মনে মুঁঞি এই মানো॥
এই তোমার অনন্ত বৈভবামৃত-সিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে একবিন্দু॥

অতএব স্বরাট্ ইচ্ছাময় স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার দ্বারা যেমন খুশী ক্রিয়া করাইতে পারেন। তাঁহার স্বরূপশক্তির ক্রিয়া অসীম, স্বয়ং ব্রহ্মারও যাহা জানিবার সামর্থ্য নাই; ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তাহা ধারণার অতীত। কিন্তু কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা সম্ভব। ভক্তি-রজ্জুতে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইয়াও বাধা পড়েন।

—শ্রীমতী মায়া সরকার

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরণে

বরষের পর বরষ আসিল
তব স্মৃতিসুধা পিইব।
তোমার করুণা কেবল ভরসা
চরণে অঞ্জলি দিইব॥
উর উর নাথ হৃদয়ে আমার,
পবিত্র উদয় তোমার।
করুণা-নিঃসৃত জ্ঞানের আলোকে
নাশ অবিদ্যা অন্ধকার॥
শিখাও তোমারে করিতে ভকতি
চরণে আত্মসমর্পণ।
মুছে যাক্ মোর পাপের কালিমা,
নির্ম্মল চিত দর্পণ॥
বিষয় বন্ধন যাউক টুটিয়া,
ছুটুক্ ভোগের বাসনা।
সেবার প্রবৃত্তি উঠুক্ ফুটিয়া,
দূরে যাক্ মোক্ষ কামনা॥
গৌরাঙ্গ ভজনে অধিকার প্রভো
অহৈতুকী কৃপায় দাও।
অযোগ্য পামরে উরু কৃপা করি,
তব চরণপ্রান্তে লও॥
রাধাকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত তত্ত্বে
দাও হে প্রবেশে শকতি।
করম জ্ঞেয়ান সকল ত্যজিয়া,
সাধিব কেবল ভকতি॥

প্রচার গগনে ঘন অন্ধকার
দেখিয়া তুমি ত' আসিলে।
সদাচাররশ্মি চৌদিক ভরিল,
তাহাতে বিশ্ব উদ্ভাসিলে॥
তোমার আলোক আকাশ পূরিয়া
এখনো ত' প্রভু রয়েছে।
কে বলে তুমি সে গিয়াছ চলিয়া,
দীপ্তির অভাব হ'য়েছে ??
ওই দেখ প্রভু কাপট্য উলুক
সুগুপ্ত বিবরে পশিছে।
বঞ্চকের দল করে ছুটাছুটি
আলোকে প্রমাদ বাসিছে॥
তোমার দীপতি শ্রীদয়িত দাসে
সব সঞ্চারিয়া গিয়াছে।
সেই প্রভা এবে দশমুখে ধায়,
আঁধার ছুটায়ে দিয়াছে॥
তাই প্রভো এবে তোমার বিরহে
শোকের বিষাদ নাহি ত'।
নিত্যলীলা মাঝে তোমার প্রবেশ
স্মারক উৎসবে মত্ত॥
উৎসবে আজি নাম রসে মাতি
সংসার যাতনা ভুলিব।
চরণে প্রণমি কৃপা কর, যেন
সংসার বন্ধন খুলিব॥

শ্রীগুরুদেব ও পরমার্থ-বিদ্যা

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরমার্থ-বিদ্যা প্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেবের ভূমিকা কি, তাহা আলোচনার পূর্ব্বে সমগ্র চরাচর বিশ্বব্যাপী যাঁহার অবস্থান ও জগৎ নিয়মন—সেই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী শ্লোক স্মরণীয়,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা ১৮।৬১)

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল ভূতে অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ভ সকল জীবের হৃৎপ্রদেশে পরমকরুণাময় পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন। যন্ত্রারূঢ় অর্থাৎ যন্ত্রে আরূঢ় কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পুত্তলিকা যেরূপ ভ্রামিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তন্মায়া জীবসমূহকে স্ব স্ব কর্ম্মজাত ফলচক্র-যন্ত্রে চালনা করিতেছেন। একমাত্র শরণাগত ছাড়া কেহই তাঁহার এই ভূমিকা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি মূল-যন্ত্রীরূপে সমগ্র পরা-অপরা জগতের একমাত্র পরিচালক। তথাপি এরূপ মহাশক্তিমান্ ইচ্ছাময়-যন্ত্রীর পরিচয় যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বজীবের নিকট সম্যক্-ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন না। ইহার কারণরূপে জীবের জ্ঞানের (সম্বন্ধজ্ঞানের) আবৃতাবস্থাকেই নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতং গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ (গীতা ৩।৩৮)

ধূমের দ্বারা শিথিলরূপে আবৃত অগ্নি, মলের দ্বারা গাঢ়রূপে আবৃত দর্পণ, উল্বনদ্বারা গাঢ়তমরূপে আবৃত গর্ভের ন্যায় বদ্ধজীবের জ্ঞান কামকর্ত্তৃক তারতম্য-বিচারে আচ্ছাদিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কামের যে উল্লেখ আছে, তাহা কামরূপ রিপুরূপে ব্যাখ্যাত হয়, আবার কৃষ্ণবিমুখ কামনারূপেও হইতে পারে। অবশ্য ইহাতে দ্বিমত নাই যে, জ্ঞানের উদয় বা বিকাশের জন্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের আবশ্যকতা আছে। জীবমাত্রেরই নিত্যশত্রু—কাম। কাম বা কামনা বশীভূত না থাকিলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও মনে মানসিক চাঞ্চল্যের উদয় হয়। ধ্যান-ধারণায় মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটে। মনের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া তাহা বহির্ম্মুখে ধাবিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার শৈথিল্য প্রকাশ পায় এবং পরিশেষে বিষয়াসক্তিই সার হয়।

এই সমগ্র সংসারে একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সারাৎসার তত্ত্ব—এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা না হইলে তৎকিঙ্করী মহামায়ার মহামোহ অতিক্রমের কোন সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় মুকুন্দ-প্রিয় শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশিত পথ ও পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে অবলম্বনের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি সম্ভব হয় এবং ইহাতে একদিকে যেরূপ তাঁহার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, অপরদিকে সেইপ্রকারে জড়কাম তথা ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা ক্রিয়াশীল হইতে থাকে। সত্য-সত্যই—"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।"

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ (ভাঃ ১।২।৭)

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধারণভাবে পরমার্থবিদ্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহারা স্বতন্ত্ররূপে সাধনাঙ্গ বা সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগই সাধন এবং তাঁহার পদকমল-যুগলের সাক্ষাৎসেবাপ্রাপ্তিই সাধ্য অর্থাৎ প্রয়োজন। ভক্তিযোগ বলিতে সৎ সাধু-শাস্ত্র-গুরু হইতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয়ে নবলক্ষণাত্মক ভক্তি (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেমভক্তির উদয় বুঝায়। তৎকালে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার তীব্রতা-হেতু নিজ ইন্দ্রিয়-সুখচেষ্টা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, জগতের অসার ও অনিত্য বস্তুর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত হয়, মনের জড় বিষয়জাত সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে। ইহাই শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য—যাহা প্রেমলক্ষণাভক্তির যথাক্রমে আন্তর ও বাহ্যিক লক্ষণ।

জীব যে স্বাতন্ত্র্য-সম্পদে সমৃদ্ধ, তাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণেই সার্থক। শ্রীগুরুদেব ভগবৎ-প্রতিনিধি, তাই সেই সমর্পণ গ্রহণ করেন। সমর্পণ এই কারণে যে, মনের কিয়দংশ শ্রীভগবান্‌কে এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সুখানুসন্ধানে ভাগাভাগি সম্ভব নয়। আবার ভগবৎ ও ভাগবত-ইতর বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন যে হৃদয়, তাহাতে শ্রীভগবানের লবমাত্র সুখোদয় হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তজ্জন্য সম্পূর্ণ শরণগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপদিষ্ট পন্থাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবকের সেবার মাধ্যমেই "সত্ত্বস্য শুদ্ধিং" অন্তঃকরণ শুদ্ধি সম্ভব হয় এবং তাহাতেই শুদ্ধজ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি উদিতা হন।

শাস্ত্রে আছে,—

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনম্।
প্রতিমাসু শিলাজ্ঞানং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

শ্রীগুরুদেবে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষরভাব, প্রতিমাতে শিলাজ্ঞানকারীর গন্তব্যস্থল একমাত্র নরক বলিয়াই ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীভগবান্ প্রকৃতির অতীত

তত্ত্ব, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়ত্বহেতু শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হইলেও জড়া-প্রকৃতির অধীন নহেন। তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম, শ্রীনামাত্মক মন্ত্র ও অর্চ্চাবিগ্রহ প্রাকৃতিক কিছু নহেন। ইহাতে মিছা-তর্কের অবতারণা করিলে নরক গত্যায়াতই সার হয়। শ্রীকৃষ্ণ মূল-আকর্ষক, জীব স্বরূপতঃ আকৃষ্ট। তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ বলিয়া শ্রীগুরুদেবেও আকর্ষণ ক্ষমতা বিদ্যমান্। তাঁহার প্রদত্ত শ্রীনাম, মন্ত্র ও তাঁহার প্রকাশিত অর্চ্চাবিগ্রহ সেবার মাধ্যমে জীব ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥ (গীতা ৪।২৪)

ব্রহ্মরূপ হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হবি (ঘৃত) ব্রহ্মরূপ অর্পণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মে একাগ্রতা লাভের মাধ্যমে ব্রহ্মগতি লাভ করেন। তাৎপর্য্য এই যে—পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ-হেতু জীবে স্বরূপতঃ ব্রহ্মলক্ষণ বিদ্যমান। এ কারণে পরংব্রহ্মের প্রতি ব্রহ্মলক্ষণাত্মক জীবের স্বাভাবিক আকর্ষণ তথা দাসত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। পরংব্রহ্মদাস শ্রীগুরুদেবের কৃপাসান্নিধ্যে জীব অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞান-রূপ বিবর্ত্তের কথা, নিজের ব্রহ্মলক্ষণের বার্ত্তা তথা নিত্যকৃষ্ণদাসত্বের সংবাদ জানিতে পারে। তৎপ্রদর্শিত আলোকে যখন তিনি সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মাত্মকরূপে অর্থাৎ সেই পরংব্রহ্মের সেবার উপকরণরূপে দর্শনপূর্ব্বক নামব্রহ্ম ও অর্চ্চাব্রহ্মের সেবায় সমাধি অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত-বিশিষ্ট হন, তখন ব্রহ্মগতি লাভ করেন তথা নিত্যসেবকরূপে তিনি ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। সুতরাং কুতর্কের আশ্রয়ে সেই শ্রীগুরুদেব, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহকে অব্রহ্মবুদ্ধি অর্থাৎ যথাক্রমে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি, অক্ষরবুদ্ধি এবং শিলাবুদ্ধি করিলে নরক ভিন্ন আর কি গতি হইতে পারে?

অপরদিকে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব, জীব এবং জগৎ—সকলকে একাকার করিয়া অশাস্ত্রীয় ব্রহ্মবুদ্ধি লাভও নরকগতির কারণ।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু অন্যান্য যুগের সাধ্যরূপে চিহ্নিত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পরমকারুণিক হইয়া সর্ব্বজীবের সাধ্যরূপে একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমকেই নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাই পরমার্থ-বিদ্যার পূর্ণতম প্রকাশ—যাহার সৌরভে আজ দশদিগ্ ব্যাপ্ত। শ্রীগুরুদেব সেই সৌরভের ধারক এবং বাহক। ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে মানবজীবন ধারণ নিশ্চয়ই বৃথা।

—ডঃ **হিরণ্যলাল দেব,** আই. পি. এস.
গৌহাটী (আসাম)

সঙ্কীর্ত্তন

কীর্ত্তনই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের সম্রাট্। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেব ও তৎকৃপাভিষিক্ত তদনুগ অকৃত্রিম ভাগবত বৈষ্ণবগণই হরিকথা-কীর্ত্তনকারী। তাঁহাদের শ্রীমুখেই হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। আমরা সেবোন্মুখচিত্তে তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে সেই বাণীই নিজের বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নিয়মিত করিবেন। আমাদের হৃদয় যত শরণাগত হইবে, ভগবদ্বাণী ও ভগবদ্বিগ্রহ আমাদের উপর ততই প্রভুত্ব করিবেন। আমরা যে-পরিমাণে শরণাগত না হইব, সেই পরিমাণে আধ্যক্ষিকতা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। শরণাগতির পরিমাণ-অনুসারেই জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শব্দাশ্রয় বা নামাশ্রয় ব্যতীত কোন অভিধেয়ই কুলিযুগে কার্য্যকরী হয় না। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্ববাসীকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অর্চ্চনমার্গীয় দণ্ডবৎ-প্রণামে ব্যায়াম প্রক্রিয়ার চিদনুশীলন হয়। তদ্দ্বারা অচিদনুশীলন কমে। চেতনের বৃত্তিতে যে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবন্নতি, তাহা একটী পৃথক্ ব্যাপার। তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারীর দণ্ডবৎ-প্রণামে চেতনবৃত্তি শরণাগতির সুষ্ঠুতা নাই। উহা কথঞ্চিৎ স্থূলদেহের ক্রিয়াবিশেষ। হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র পরতম অনুশীলন।"

কীর্ত্তনই অঙ্গী, আর শ্রবণ-স্মরণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি তাহার অঙ্গ। নয়-প্রকার ভক্তির মধ্যে আটটী কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুগামিনী। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের অনুকূল অনুশীলন করিলেই তাহাদের সার্থকতা। শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের পৃথক্ করিয়া স্মরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, স্মরণ কীর্ত্তনের অধীন। সকলে মিলিত লইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম সঙ্কীর্ত্তন। সকল শাস্ত্রই সঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়, এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১২ই আষাঢ়, ১৪০২ (ইং ২৭।৬।৯৫) মঙ্গলবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ১৪০২ (ইং ৮।৭।৯৫) শনিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১২ই আষাঢ়** (ইং ২৭।৬।৯৫), মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **১৪ই আষাঢ়** (ইং ২৯।৬।৯৫), বৃহস্পতিবার – পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৫ই আষাঢ়** (ইং ৩০।৬।৯৫), শুক্রবার – **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ;** অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৬ই আষাঢ়**, ১লা জুলাই শনিবার হইতে ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **১৯শে আষাঢ়** (ইং ৪।৭।৯৫), মঙ্গলবার – **হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২০শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই বুধবার হইতে ২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **২৩শে আষাঢ়,** (ইং ৮।৭।৯৫), শনিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **"সাধারণ-সম্পাদক" শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

লোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ২ বামন, কারণোদশায়ী, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৪০১, ইং ১৫/৬/৯৫ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীনব-যুবরাজায় নমঃ

স্ফুরদমল-ধূলীপূর্ণ-রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগমদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণ-
দ্ব্রজভুবি নবযুনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে॥ ১॥

যাঁহাদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ-গন্ধ প্রকাশমান ও নির্ম্মল মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত সুন্দর কস্তূরীর গন্ধকে ন্যক্কার করিতেছে এবং ব্রজমধ্যে পরস্পরের উদয়ে যাঁহাদের অন্তঃকরণ

আন্দোলিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

কনকগিরি-খলোদ্যৎ-কেতকী-পুষ্প-দীব্য-
ন্নব-জলধর-মালাদ্বেষি-দিব্যোরু-কান্ত্যা ।
সবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্ত-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ২ ॥

কনকগিরি খলে অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত-স্থানে সঞ্জাত কেতকী-পুষ্পের সহিত শোভমান নূতন মেঘসমূহকে উৎকৃষ্ট ও মহতী কান্তিদ্বারা যাঁহারা দ্বেষ করিতেছেন এবং যাঁহারা পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা আপনাকে মিলিতের ন্যায় জন-সকলকে দেখাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥

নিরুপম-নবগৌরী-নব্যকন্দর্প-কোটি-
প্রথিত মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্ ।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমষ্টৈর্মিথস্ত-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

নিরুপম নবগৌরী এবং কোটী-সংখ্যক অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য্যতরঙ্গ-দ্বারা নির্ম্মলীকৃত পরমশোভা যাঁহাদের নখপ্রান্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে এবং যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচি-বিশিষ্ট অনুরাগসমূহে হৃষ্ট হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩ ॥

মদন-রস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোঽল্লৈঃ ।
অপি চ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৪ ॥

মদন-রসে বিঘূর্ণিত লোচন-কমলের ঈষৎ কটাক্ষ সঞ্চালন-যুক্ত মুখচন্দ্র সম্ভূত লজ্জায় যাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্র হইয়াছেন এবং পরস্পরের মধুর-বাক্য শ্রবণে যাঁহাদের অতিশয় আশা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৪ ॥

স্মর-সমর বিলাসোদগারমঙ্গেষু রঙ্গৈ-
স্তিমিত-নবসখীষু প্রেক্ষমাণাসু ভঙ্গ্যা ।
স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৫ ॥

স্নিগ্ধ-স্বভাব নূতন বয়স্যাগণ রঙ্গভঙ্গী-সহকারে ঈষৎ হাস্যযুক্ত মধুর নয়নাঞ্চল-দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কন্দর্প-যুদ্ধের বিলাস-সূচক চিহ্নসকল অবলোকন করিতে থাকিলে, যাঁহারা লজ্জায় প্রফুল্ল-বদন হইয়াছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৫ ॥

মদন-সমরচর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য-পাদানুচর্য্যাম্ ।
সমর-রসিকমেকপ্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৬ ॥

যাঁহারা কন্দর্প-যুদ্ধচর্য্যার আচার্য্য, যাঁহাদের পদদ্বয়ের সেবা প্রভৃত পুণ্যপুঞ্জ-শালিনী নব-বধূসকল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমর-রসিক ও পরস্পর এক প্রাণ এবং উভয়েই উভয়ের ভূষণ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৬ ॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জল-বিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্ ।
উপহৃত-মধু-রঙ্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথস্তৈ-
র্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রচুরতর জল-বিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া তীরস্থ মধুর কুঞ্জমধ্যে যাঁহারা সুস্নিগ্ধ সখীবৃন্দকর্ত্তৃক রঙ্গসহকারে উপহৃত মধু লইয়া ঐ সকল সখীগণের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৭ ॥

কুসুম-শর-রসৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াদ্ধা নিবদ্ধম্ ।
অখিল-জগতি রাধামাধবাখ্যা প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৮ ॥

এই ব্রজমণ্ডলে মধুর-রসাশ্রিত গ্রন্থাচার্য্যগণ অতিশয় বশবর্ত্তিরূপ প্রেমরজ্জুদ্বারা সাক্ষাৎ যাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিখিল জগতে "রাধা-মাধব" এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজ-ভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৮ ॥

প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যূনোর্দিদৃক্ষা-
ষ্টকমিদমতিযত্নাদ্যঃ পঠেৎ স্ফারধৈর্য্যৈঃ ।

স খলু পরম-শোভাপুঞ্জ-মঞ্জু-প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥ ৯ ॥

যিনি প্রণয়-হেতু এই সুমধুর নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন-দিদৃক্ষাষ্টক যত্ন-সহকারে অতিদীনভাবে পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমশোভাপুঞ্জে অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল যুগল-মূর্ত্তিকে শীঘ্র সেব্যরূপে নেত্রদ্বয়ের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

১১। **'প্রকাশিনী' বৃত্তির স্বরূপ কি ও প্রণেতা কে ?**

"জীবাভয়প্রদা বৃত্তির্জীবাশয়-প্রকাশিনী।
কৃতা ভক্তিবিনোদেন সুরভীকুঞ্জবাসিনা ॥" —ব্রঃ সঃ প্রঃ ৬২

১২। **অমৃতপ্রবাহভাষ্য-রচনার উপলক্ষ কি ?**

"শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
হরিদাস স্বরূপ গোসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ,
রূপ-সনাতন দুই ভাই ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ভট্ট,
শিবানন্দ কবিকর্ণপূর।
নরোত্তম শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র কৃষ্ণদাস,
বলদেব চক্রবর্ত্তী ধুর ॥
ঈশ ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে,
অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত,
ভক্তবৃন্দ করহ বিচার ॥
গৌরকথা-পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি',
আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্যসুধা পানে, বৈষ্ণব শীতল প্রাণে,
আরোপিতে চাহে বার-বার ॥

এই দীন অকিঞ্চনে,　　আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে,
ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু-আজ্ঞা শিরে ধরি',　　যত্নে এই ভাষ্য করি',
সাধুকরে করিনু অর্পণ॥"

—'মঙ্গলাচরণ', অঃ প্রঃ ভাঃ

১৩। শ্রীভক্তিবিনোদ কাঁহার প্রসাদে 'তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন?

"জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভবিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১

১৪। সভাষ্য 'তত্ত্বসূত্রে'র মঙ্গলাচরণটি কি?

"প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভরদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্বসূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', তঃ সূঃ

১৫। ব্যাসসূত্রাধিকরণমালার ভূমিকাটি কি?

"নিত্যং চিন্ময়কুঞ্জবৃন্দসুভগে বৃন্দাবনে সঙ্গতং
রাধাকৃষ্ণ ইতিদ্বয়ং রসময়ং ব্রহ্মাবিরাস্তে পরম্।
তদ্ভাবাপ্তি-মকরন্দপানতরলশ্চেতোঽলিরস্ত্যহং
কেদারাভিধ উৎসুকঃ প্রভুবরং যাচে নিবদ্ধাঞ্জলিঃ॥"

—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃতা ব্যাসসূত্রাধিকরণমালা—'উপক্রমণিকা'

১৬। 'বেদার্কদীধিতি' টীকা কোথায় ও কাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিতা?

"বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গভক্তপদ-ভক্তিবিনোদকেন।
শ্রীগোদ্রুমদ্বিজপতেশ্চরণ-প্রসাদাৎ প্রজ্বলিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে॥"

—বেঃ দীঃ

১৭। শ্রীমদ্ আম্নায়সূত্রের মঙ্গলাচরণটি কি?

"নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্য্যবিগ্রহম্।
কেন ভক্তিবিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ॥
প্রণামৈরষ্টভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্।
অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ॥

ত্রিংশোত্তরশতঃ সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া।
পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ॥

জগতের আচার্য্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তিবিনোদ-উপাধিক কোনও ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছয় প্রকার লিঙ্গ অবলম্বন করত সমস্ত বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি আশ্রয়পূর্ব্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণব-সকল স্বচ্ছন্দে ইহা পাঠ করুন।"

—'মঙ্গলাচরণম্', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৮। 'শ্রীমদ্ আম্নায়সূত্রম্' কখন ও কোন্ মহাজন-কর্ত্তৃক বিরচিত?

"চৈতন্যদেবস্য চতুঃশতাব্দে নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
আম্নায়মালা প্রভুভক্তকণ্ঠে গৌড়ে প্রদত্তা হরিজন্মঘস্রে।"

—'উপসংহারঃ', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৯। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্য 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃতম্' গ্রন্থের নমস্ক্রিয়াটি কিরূপ?

"পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নত্বা চৈতন্যরসবিগ্রহম্।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', চৈঃ চঃ ভাঃ

২০। 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কোন্ বস্তুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে?

"ভ্রমজনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্ত-সকল যে কৃষ্ণভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত' নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।" —'মঙ্গলাচরণ,' চৈঃ শিঃ ১।১

২১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যাবধি কি অনন্যসাধারণ নহে?

"পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।" —'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

২২। 'শ্রীমহাভারত' আর্য্যগণের অতিশয় মান্যগ্রন্থ কেন? বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'বিষ্ণুসহস্রনামে'র বৈশিষ্ট্য কি?

"ঋষিগণ কোন সময়ে সমস্ত বেদকে একদিকে ও শ্রীমহাভারতকে একদিকে দিয়া তৌল করিলে শ্রীমহাভারত অধিক গুরুভারক্রমে নত হইয়া পড়েন। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভারতের তুল্য আর্য্যদের পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই। সেই মহাভারতের মধ্যে দুইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আছে। একটী 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও অপরটী 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম'। তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে নিজ-মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুদয় আচার্য্য নিজ নিজ মতে বেদভাষ্য, বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য ও সহস্রনামভাষ্য প্রস্তুত করত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুই বেদান্তাচার্য্য। অতএব তৎকৃত 'সহস্রনামভাষ্য' সর্ব্বাদৌ প্রকাশ করিলাম।"

—'বোধন', শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, চৈতন্যাব্দ ৪০০

২৩। শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তি-কৃত শ্রীচৈতন্য-মত-জ্ঞাপক শ্লোকটী ভজনবিষয়ক,—না তত্ত্ব-বিষয়ক ?

"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ে মতটী নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ববিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ববিচারস্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব-সংখ্যা করিতে হইলে ষট্সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। * * * কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্রূপে নব তত্ত্ব হয়। এই নব তত্ত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবত-শিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটী সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনই বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"

—'নূতন-পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।৩

২৪। জৈবধর্ম্ম রচনার কাল কখন এবং এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী কে ?

"গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি'॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয়-ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায়॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুমে সুরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে॥

শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁ'র আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস ॥
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা-লেশ।
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায় ॥"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথগ্ বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নরূপে গ্রাহ্য হইলেও রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য—সকলই শ্রীনাম। জড় জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-সম্বন্ধে তাহা নহে।

ভগবদ্ভক্ত জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতি কিছুই ভোগ করেন না। ঐ সকল দ্রব্য-দ্বারা তিনি ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি গ্রহণও ভগবৎসেবার জন্য। ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই জড় বা মায়িক নহে। পক্ষান্তরে অভক্ত সর্ব্বদাই ভোগের জন্য প্রধাবিত হয় এবং ভগবানকে প্রকৃতিজাত বিবেচনা করে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তর-রহিত, আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্যসেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহাদ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জল সেচন করিতে হইবে; তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিবীজ

উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনরত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে—তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মঙ্গলময় শ্রীহরির মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা শ্রবণ ও আলোচনা করিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইবে। আমাদের নিত্যমঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা সকলেই 'মেপে নেওয়ার' রাজ্যে বাস করি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পার্থিব রাজ্যের যে-সমস্ত জিনিস আমাদের নিত্যমঙ্গলের বাধা জন্মায়, তৎসান্নিধ্যে আমরা আছি। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এ সকলের হাত হইতে আমাদের নিস্তার পাইবার উপায় নাই। যাঁহারা এ জগতের অনিত্য, বিনাশধর্ম্মশীল, হেয় বস্তুর প্রলোভনে প্রধাবিত হইতেছেন, তাঁহাদের নিত্যবস্তুর, অবিনাশী বিভুচেতনের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলে আমাদের কর্ণে এতকাল যে-সকল অসৎকথা—অমঙ্গলের কথা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে।

শ্রীভগবানের কথা নিত্য-পূর্ণজ্ঞানময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। আর দুর্ল্লভ সজ্জনের মুখেই তাঁহার কথা কীর্ত্তিত হয়, সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ, সাধুর সঙ্গ দুর্ল্লভ হইলেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা যে-সকল কথায় শ্রদ্ধা করি—যে-সমস্ত কথা শুনিতে আমাদের খুব ভাল লাগে, তাহা এজগতের মায়ামুগ্ধ জীবগণের—অনর্থযুক্ত জীবসকলের ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বিচার-বুদ্ধি হইতে উত্থিত হইয়াছে। এতে নিত্য-জগতের আত্মমঙ্গলের কোন কথা নাই। উহা অনিত্য দেহ-মনের তাৎকালিক তৃপ্তিকর মাত্র। কিন্তু সাধুগণের, নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের কথায় আমাদের রুচি বা শ্রদ্ধা না থাকিলেও তাহা বৈকুণ্ঠের—চেতনরাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা, তাহা আমাদের আনন্দের স্বরূপের—নিত্য অণুচেতনের প্রসন্নতা বিধান করে।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

গৌর-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভুও স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুলনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র, ব্রজরমণী-জীবন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর।
এক কৃষ্ণনামে হয় কোটী গ্রন্থ ফল॥
মুখে বাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তেঞি জীব সংসারে ভ্রময়ে অবিরাম॥
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে-জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে॥
কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আন।
কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি হয় পরিত্রাণ॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—এ সম্বন্ধে নামাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

শ্রীমন্মদনগোপাল-পাদাব্জোপাসনাৎ পরম্।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রায়াদ্বাঞ্ছাতীতফলপ্রদাৎ॥
* * কিঞ্চিন্নাস্ত্যেব সাধনম্॥ (বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৪-১০৫)

শ্রীমদনগোপালের শ্রীচরণকমলের 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন'-বহুল উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন উপাসনা নাই। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বাঞ্ছাতীত ফল অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহা এবং তাহার অতীত মনের অগোচর পরমদুর্ল্লভ ফলও প্রদান করিয়া থাকেন।

সঞ্জাত-প্রেমকাচ্চাস্মাচ্চতুর্ব্বর্গ-বিড়ম্বকাৎ।
তৎপাদাব্জ-বশীকারাদন্যৎ সাধ্যং ন কিঞ্চন॥ (বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৬)

এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে প্রেমলাভ হয়; তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীমদনগোপালকে বশীভূত করা যায়। সুতরাং, এই উপাসনা শ্রীকৃষ্ণের বশীকারক। অতএব ইহা হইতে অতিরিক্ত সাধ্যও কিছু নাই।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৪)

শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তি লাভের বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর স্বকৃত টীকা—

সর্ব্বোৎকর্ষ-চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তঃ ফলবিশেষঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব সিধ্যতীত্যুক্তমেব। তচ্ছ্রৈষ্ঠ্যে হেতুং পুদরতিহর্ষেণ অভিব্যঞ্জয়তি—নামেতি। পরমাকর্ষকো মন্ত্রো যথা দুর্ল্লভতরমর্থং দূরাদাকৃষ্য ঘটয়তি তথেতি। অতএব—"শৃন্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৯)—ইত্যুক্তাপি প্রেম-সম্পদাবির্ভাবেঽন্তরঙ্গত্বেন—'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি॥' (ভাঃ ১১।২।৪০)—ইত্যত্র পুনঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা ইত্যুক্তমিতি।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলবিশেষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই লাভ হইয়া থাকে। তাই অতীব হর্ষের সহিত পুনর্ব্বার শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতার হেতু বলিতেছেন। প্রেম-সম্পৎ লাভের পরম অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তন অতীব বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা মন্ত্রবৎ ভগবদাকর্ষক। সরলভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তের সম্মুখেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীনামকীর্ত্তন পরমাকর্ষক সিদ্ধ-মন্ত্রের ন্যায় দুর্ল্লভতর বস্তুকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে—'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সুমঙ্গল নামসকল ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা গীত হইয়া থাকে। ঐ সকল ভগবন্নাম শ্রবণপূর্ব্বক লজ্জাশূন্যচিত্তে তাহা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিরপেক্ষভাবে বিচরণ করিবে।' ইহা বলিয়া আবার প্রেম আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ সাধন বলিতেছেন—'শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্রত ভক্ত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনদ্বারা প্রেমলাভ করত ভগবৎ সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।' অতএব স্বপ্রিয় নামকীর্ত্তনই পরম অন্তরঙ্গ ও বলিষ্ঠ সাধন।

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫)

ভক্তি-রসিকগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, ইহার কখনও অন্যথা হয় না।

টীকা—অহো কিং বক্তব্যং শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব কৈশ্চিন্মন্যতে ইত্যাহুঃ—তদেবেতি, নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব। তত্র রসিকৈর্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-লম্পটৈঃ। নন্থ

সর্ব্বেষামপি সাধনভক্তি-প্রকারাণাং প্রেমৈব ফলমিত্যভিপ্রেতম্? সত্যং, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সতি প্রেম্ণঃ সম্পত্তৌ সম্পন্নাতায়াং সদৈব নামসঙ্কীর্ত্তনস্য অব্যভিচারত আবশ্যকহেতুত্বাদিত্যর্থঃ।

অহো! সাধনশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা অধিক আর কি বর্ণন করিব? ভক্তিরসিকগণ ইহাকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন,—সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তির ফল ত' প্রেম? সত্য, নাম-সঙ্কীর্ত্তনই অব্যর্থরূপে প্রেম উৎপাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রেমলাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু উপচাররূপে নামসঙ্কীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নিয়মের কখনও ব্যভিচার হয় না। এজন্য সাধুগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া থাকেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে প্রেম স্বতঃই লাভ হইয়া থাকে। তাই নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সাধ্য।

যে সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।১।২১)

যাঁহারা সমস্ত সাধন ও সাধ্য অপেক্ষা-রহিত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীমন্মদন-গোপালদেবের পরম-মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধাদেবীর দাস্যের অভিলাষী তাঁহারা প্রীতির সহিত রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণ পরম-মহাসাধন।

কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু তন্নাম সঙ্কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮)

নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ, তাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শীঘ্র প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ভক্তি প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

টীকা—শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব সেব্যমিত্যাশয়েন আহুঃ—কৃষ্ণস্যেতি। নানাবিধেষু বেদ-পুরাণাদি-পাঠঃ কথা-গীত-স্তুত্যাদিভেদেন বহুপ্রকারকেষু কীর্ত্তনেষু মধ্যে তস্য কৃষ্ণস্য নাম-কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। কুতঃ? দ্রাক্ অবিলম্বেনৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেমসম্পদো জননে আবির্ভাবণে স্বয়মন্য-নৈরপেক্ষ্যেণেব শক্তং সমর্থম্। তত-স্তস্মাদ্ধেতো তৎ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমেব শ্রেষ্ঠতমং মতং সদ্ভিরস্মাভির্বা।

শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম সেব্য বলিয়া মনে করি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন **—শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য। অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদি-পাঠ, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাকথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি**

ভেদে বহুপ্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য। কি জন্য মুখ্য? এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন স্বয়ং অন্য নিরপেক্ষভাবে প্রেম-সম্পত্তি-উৎপাদনে সমর্থ। তাই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম, সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমান-মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬১)

যদিও সকল ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি নিজের প্রিয় নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই অনায়াসে সুখে শীঘ্র স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥
তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে।
যয়া সুখং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৪-১৪৫)

কেবল শ্রীভগবৎপাদপদ্মের সঙ্গ আশা করিয়া ভক্তির মধ্যে প্রধান শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপা ভক্তির নিরন্তর আচরণ করিবে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনবহুল ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমধন লাভ করত সেই প্রেম-সম্পদের বলে সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ হইবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভক্তিই অভিধেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তিবৎ কোন্ ভক্ত্যঙ্গটী মুখ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই ভক্ত্যঙ্গ-সম্রাট্—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিমত। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের মধ্যে আবার কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তন নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ভেদে বহুবিধ। নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্মরণ অপেক্ষা যে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং
লোলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ।
বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা
দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বাদাত্মবৎ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৮)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০১ পৃষ্ঠার পর]

পূর্ব্বমীমাংসা।—পূর্ব্ব এবং উত্তর নামক দুই ভাগে বেদ বিভক্ত। বহু পূর্ব্বে বেদ সম্ভবতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল না। কারণ সমগ্রবেদের একত্রিত ভাষ্য প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল—দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বভাগের বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদনের মন্ত্রাদির বিশেষ মীমাংসার জন্য জৈমিনীর মীমাংসাসূত্র রচিত হইয়াছে। উপনিষদ্ বা বেদান্তে যে বিচার ব্রহ্মসূত্রে তাহাই উত্তর মীমাংসা নামে অভিহিত। মীমাংসাসূত্রমতে বেদ অনাদি ও নিত্য, পরন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বের স্বীকার নাই। এতন্মতে জগৎ অনাদি বিধায় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম কৃত হইলে স্বতঃই তাহার ফললাভ হয়। ফলদাতা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায়? যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভই পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত। দেবতাগণের পূজাই যাগ, তাহাদের জন্য দ্রব্যাদি উৎসর্গিত হয়। মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত স্বর্গাদি ফললাভ হয় না বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্রাত্মক বলিয়া জৈমিনীর বিচার। কুমারিলভট্ট-মতে ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। প্রজাপতিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার শরীরও সৃষ্টবস্তুর অন্যতম।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারই ঈক্ষণ হইতে স্থূলসৃষ্টি। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তথা অচিন্ত্যশক্তিমান্। প্রজাপতি বা প্রকৃতি কেহই মূল-সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। পরব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহারা সৃষ্টি করেন। মূলতঃ পরব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা—ইহা অস্বীকারহেতু পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রও নিরীশ্বর-বাচক। গোস্বামি-গণের বিচারে পূর্ব্বমীমাংসা পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ এবং উত্তর মীমাংসাই তাহার সিদ্ধান্ত।

বেদান্তদর্শন।—বেদের জ্ঞানকাণ্ডাত্মক সারভাগই বেদান্ত বা উপনিষদ্। বিভিন্ন ঋষি এই শিক্ষাকে শ্রবণদ্বারা স্মৃতিপটে ধারণ করিয়া রাখিতেন, তজ্জন্য ইহার অপর নাম শ্রুতি। এই বেদান্তের সূত্ররূপ আকারই ব্রহ্মসূত্র শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত। পুনশ্চ এই সূত্রসমূহের সম্যক্ বিস্তৃত ব্যাখ্যাই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, তাহাও শ্রীব্যাসদেবের বিরচিত। সুতরাং বেদ, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত একই তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া জীবের নিকট বাস্তব সত্যের পরিচয় ও অনুভব প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য ঋষিগণ স্ব-স্ব বুদ্ধি

ও যুক্তি-প্রমাণাদিদ্বারা তত্ত্বনির্দ্দেশ সম্যক্‌রূপে ও সত্যরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহাই "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" বাক্যটীতে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও প্রকাশ পায়—

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে॥
'মীমাংসক' কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
'সাংখ্য' কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ॥
'ন্যায়' কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লইয়া বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্তমতে—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে॥
স্ব স্বমত স্থাপে পর-মতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিহোঁ যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব-সার।

শ্রীযমরাজ-বাক্যে দ্বাদশ মহাজনমধ্যে শ্রীব্যাসদেবের নামোল্লেখ নাই; পরন্তু শ্রীশুকদেবের নাম বর্ত্তমান। শ্রীল শুকদেব স্বমহিমার কারণ নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।—"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুঃ দ্বৈপায়নাদহম্॥ পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" (ভাঃ ২।১।৮-৯) এতদ্দ্বারা শ্রীব্যাসদেব যে মহাজন তাহা বুধগণ দ্বিধাহীনভাবে মন্তব্য করেন। ব্যাসদেব অবতার বলিয়াই সম্ভবতঃ যমরাজ তাঁহাকে মহাজন পর্য্যায়ে উল্লেখ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যান্বয়স্থ কাশীনিবাসী সন্ন্যাসিগণের বিচার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন।—

"প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় "সাক্ষাৎ নারায়ণ"।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-প্রাণ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে হৃদয় না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥
হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

'ব্রহ্ম' শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি' পূর্ণতা হয় হান॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহে 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী॥ (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ক্রিবিক্রম মহারাজ

অকিঞ্চন কে ?

জাগতিক বিচারে দরিদ্র, নিঃস্ব, সহায়সম্বলহীন, যাহার কিছুই নাই এরূপ ব্যক্তিই 'অকিঞ্চন' পদবাচ্য। ন কিঞ্চন যাহার অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র ধনাদি যাহার নাই, তিনি 'অকিঞ্চন'। 'অকিঞ্চন' ও 'নিষ্কিঞ্চন' শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থক। অকিঞ্চনের বিশ্লেষণে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পারমার্থিকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট্ পার্থক্য বিদ্যমান্ রহিয়াছে। ইহজগতে যাহারা কিঞ্চন অর্থাৎ ইতর বাসনাযুক্ত তাহাদের ভগবানের চরণসেবার ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তদ্ব্যতীত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের আধিপত্যে, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপদে, অণিমাদি যোগসিদ্ধিতে অথবা সাযুজ্য-মুক্তিতে স্পৃহা থাকে। কৃষ্ণসেবাবিমুখ বিরাট্ ধনী বা অত্যন্ত দরিদ্র উভয়েই 'অকিঞ্চন' পদবীলাভের সৌভাগ্য হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত। যাহারা ভগবানের কথা ব্যতীত ইতর কথা শ্রবণ এবং কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত ইতরচিন্তা করেন, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই যাহারা ধর্ম্ম মনে করেন, তাহারা সকলেই অবৈষ্ণব। ভগবদ্‌বিমুখতা হইতেই মায়ার দাস্য বা গোলামি করিবার প্রবণতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন কর্ত্তা সাজিয়া স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির প্রীতিবিধানকেই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে। সমাজসংস্কার, সমাজ গঠন করা বা দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে ঘৃণ্য আত্মেন্দ্রিয়পরতা গভীরভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাতে ভগবৎপ্রীতির লেশমাত্র গন্ধ থাকিতে পারে না। 'সকিঞ্চন' সম্পূর্ণ অবিনশ্বর মহাধন ভগবানকে লাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখী। পরিমিত নশ্বর প্রাকৃত ধন-জনাদিসকল গ্রহণে সকিঞ্চনের উন্মুখতা তাহার দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

যিনি ইহজগতের কোন বস্তুই চান না, অথবা যাহার ইহ জগতে কোন কিছুই নাই, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই সজ্জন। ইহজগতের কোনবস্তুই অকিঞ্চনকে লুব্ধ করিতে পারে না, তাই নিজভোগার্থে কোন কিছুর অন্বেষণ করিবার তাহার কখনও প্রয়োজন হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া তাহাকে কোন বস্তুর পিছনে বৃথা দৌড়াইতে হয় না। অকিঞ্চন বিচার করেন,—"এই পৃথিবীতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার, আমরা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, এইজন্যই এত কষ্ট পাইতেছি। কৃষ্ণপদনখাগ্রের শোভা হইতে অধিকতর লোভনীয় কোন বস্তু ইহজগতে থাকিতে পারে না। যেখানে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জানিতে

হইবে—মোহিনী মায়া বহুরূপিণী হইয়া আমাদিগকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। আমি ভগবানের সেবক—এই স্বরূপের উপলব্ধির অভাবেই আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি চালাক—এই সকল কুবিচার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করিলেই আমাদের সকলপ্রকার সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণনামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ আমরা অনায়াসে অবগত হইতে পারিব।"

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ত্যাগী প্রকৃত অকিঞ্চন নহে, কিঞ্চন বা কিছুর ভোগীসজ্জায় অধীন ও বদ্ধ। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয়, তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী। জ্ঞানিগণের হৃদয়ে বিষয়াসক্তি না থাকিলেও ভগবানে আসক্তিভাবের সম্পূর্ণ অভাব। ভক্ত অর্থাৎ অকিঞ্চন অহংগ্রহোপাসনা-মদে মত্ত নহেন, স্বীয় কর্ম্মফল-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অপর বস্তু প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার কর্ম্ম-সমৃদ্ধি, জ্ঞান-সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখ-লাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে। ভক্তগণ সর্ব্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-লোভী অর্থাৎ কৃষ্ণানুরক্ত-চিত্ত হওয়ায় সকল সময়ে সকল বাসনামুক্ত এবং প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতম্।
জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিত্তে জ্ঞেয়া নিষ্কিঞ্চনা বুধৈঃ॥ (পৌরাণিকোক্তি)

"যাঁহাদের ভজন ব্যতীত অন্য বাঞ্ছিত, অভীপ্সিত এবং কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসিত বিষয় নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকেই নিষ্কিঞ্চন জানেন।"

শ্রীভগবান্ পূর্ণ বস্তু, সেই পূর্ণবস্তু লাভে অকিঞ্চনেরও কোন অপূর্ণতা থাকে না, তিনিও পরিপূর্ণতা লাভ করেন। বিশ্বের পরিমিত, অপূর্ণ ও নশ্বর ধন প্রাপ্তির তিনি কোন প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি ভগবানে নিত্য ভক্তিযুক্ত বা সেবাপরায়ণ বলিয়া প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য কামনা বা স্পৃহা তাঁহার নাই। তিনি প্রার্থনা করেন,—

ধন জন নাহি মাঁগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০শ পঃ)
কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ)

এই প্রসঙ্গে ভক্ত মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥
(ভাঃ ১০।৫১.৫৫)

"হে বিভো ! আমি অকিঞ্চনগণের সর্ব্বোত্তম প্রার্থনীয় আপনার পাদপদ্মসেবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। যেহেতু, কোন্ বিবেকী পুরুষ মুক্তিপ্রদাতা আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয়-বন্ধনহেতুভূত অন্য বর প্রার্থনা করে ?" অকিঞ্চন স্বর্গ, নরক ও মুক্তিতে ভক্তিসুখ রহিত বলিয়া তাহাতে অরুচিবিশিষ্ট।

কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তাঁর কার্য্য মানি।
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ)

'উৎকৃষ্ট-বিষয়প্রাপ্ত হইলেই লোকে স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে'—এই ন্যায়ানুসারে নিরন্তর দিব্য-অমৃতরস-আস্বাদনপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জড়রসাধার তুচ্ছ মৃত্তিকা যেরূপ রুচিপ্রদ হয় না ; তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিতাত্মা অকিঞ্চন নিত্য পরমেশ্বরানুভবসুখ এত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হন যে, তাহার নিকট অনিত্য ব্রহ্মপদবীর কা কথা, ভগবানের চরণসেবানন্দশূন্য, সৌন্দর্য্য-সৌরভাদি অনুভব-শূন্য এবং লীলামৃত আস্বাদনরহিত ব্রহ্মসুখও অকিঞ্চিৎকর বোধে রুচিপ্রদ হয় না। "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং" শ্লোক হইতে জানা যায়, —"ভগবানে সমর্পিতচিত্ত পুরুষ ভগবানকে ভজন করিয়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতাললোকাধিপত্য, অনিমাদি-যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষলাভের ইচ্ছাও করেন না।" ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পাদায়ন্তে ব্রাহ্মণাপি জগদ্গুরো॥ (হরিভক্তিসুধোদয়)

"হে জগদ্গুরো ! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদ-রূপ বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থান করিতেছি, আর সমস্তপ্রকার সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ মনে হইতেছে, ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ।"

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই অকিঞ্চন, সুনীচ, সহিষ্ণু ও প্রপন্ন

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ, জড়ীয় বাসনার দ্বারা বিচলিত হন না, জগতে কাহাকেও আপনাপেক্ষা নিম্নাবস্থিত জ্ঞান করেন না, ভগবৎপ্রদত্ত সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্ত, বিশ্বের কোন বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন না বলিয়া তাঁহারাই প্রকৃত 'অকিঞ্চন'। অকিঞ্চনের অভিমান,—"আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন —আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব।" অকিঞ্চন তৃনাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে

নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত পরাপেক্ষা রহিত এবং সুবিমল কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বলিয়া একমাত্র অকিঞ্চন।

অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এই জগৎটাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন, তাঁহারা জগতের কোন বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি করেন না এবং তাহা ত্যাগও করেন না, উপরন্তু সকল দ্রব্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। হরিভজন না করিলে জগতে একটী তৃণও গ্রহণ করিবার কাহারও কোন অধিকার নাই—ইহা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভারতসম্রাট্ হইয়াও অকিঞ্চন ভক্ত, আবার সুদামা বিপ্র অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও অকিঞ্চন, কারণ ইঁহারা উভয়েই সুবিমল ভগবৎসেবাপরায়ণ নিষ্কাম ভক্ত। দরিদ্র বৈষ্ণবের ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ—প্রাপঞ্চিক ইতরবস্তুসমূহে তাঁহার লোভহীনতার পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত শ্রীধরকে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,— 'তুমি প্রচুর ধনে ধনী, তোমার বাহ্য জাগতিক ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই। সুতরাং বাহ্যজগতের কোন অভাবকেই তোমার অভাব বলিয়া বোধ হয় না। যিনি পরিপূর্ণ শক্তিমান্ ভগবানের সেবায় নিরত, তাঁহার কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবই সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী।"

শ্রীকৃষ্ণ—অকিঞ্চনের প্রাণসদৃশ

ইহ জগতে যাহার কোন আসক্তি নাই, এইরূপ অকিঞ্চনেরই কৃষ্ণ প্রাণসদৃশ—এই সকল কথা বেদশাস্ত্র ও বেদানুগ শাস্ত্র গান করিয়াছেন।

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'—সর্ব্ববেদে গায়
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৫০)
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৩)

অন্যের নিকট হইতে যাঁহারা পূজালাভ করেন, সেই ব্রহ্মাদিও কৃষ্ণের পূজা করেন। তাই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কিঞ্চিৎ বস্তু না থাকায় কৃষ্ণই অকিঞ্চনস্বরূপ। কৃষ্ণ ভক্তগণের প্রিয় এবং তাঁহারাও কৃষ্ণের প্রিয়। সুতরাং কৃষ্ণ যে 'অকিঞ্চনজনপ্রিয়' —ইহা কিছুতেই অমূলক নহে। কৃষ্ণ অকিঞ্চন ভক্তগণকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিয়াছেন,—

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহেঃ॥
(ভাঃ ৯।৪.৬৫)

"যে সকল অকিঞ্চনগণ গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ?"

অকিঞ্চনগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গই প্রত্যেক জীবের কাম্য হওয়া উচিত

অকিঞ্চনের ভগবৎসেবক ব্যতীত অন্য কোন অভিমান নাই। অকিঞ্চনভক্ত কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানান যে,—"ভগবানের সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। দেবতা, মানুষ, পশুপক্ষী সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবৎসেবা।" অকিঞ্চনের সঙ্গ ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। "নেষাং মতিস্তবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং" শ্লোকে (ভাঃ ৭।৫।১২) উক্ত রহিয়াছে,—"যে পর্য্যন্ত জীব অকিঞ্চন মহাত্মা ভক্তগণের পাদরজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না।" অকিঞ্চনগণের সঙ্গপ্রভাবেই ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভের পথ সুলভ হইয়া যায়।

নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁর সঙ্গ।
করিবে সেবিবে ছাড়ি' বিষয়তরঙ্গ ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা-মমতা যাবে মায়া হবে পার ॥

(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

সঙ্কীর্ত্তন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৮ পৃষ্ঠার পর]

তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

যাহাতে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে; যাহার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই হরিকীর্ত্তন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে রসনা ও মনকে ক্রমপন্থায় ভগবন্নামরূপ-চরিতাদির সুকীর্ত্তন করিতে অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিতে বলিয়াছেন। সুকীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন। কীর্ত্তনই ভক্তি। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন—সবই কৃপাসাপেক্ষ। সাধু কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হয় না। আবার শ্রবণসুযোগ

না হইলেও কীর্ত্তন করা যায় না। সুতরাং সাধুকৃপা বা সৎসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। সৎসঙ্গের ফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ। সৎসঙ্গই অর্থাৎ সৎসুখানুসন্ধানই ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ ও সতের সেবার দ্বারাই ভগবানে বিশ্বাস হয়। আজন্ম ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাগবত-অধ্যাপকেরও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব। তাই শাস্ত্র বলেন, –

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥ (চৈঃ ভাঃ)

লোভ বা শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। যেখানে লোভ বা শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সাধুসঙ্গ নাই। যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। ভক্তসঙ্গফলেই ভক্তি হয়—শ্রবণফলেই কীর্ত্তন হয়। শ্রবণই সঙ্গ। শ্রবণের পথ, নমস্কারের পথ, শরণাগতি বা প্রপত্তির পথ বা শ্রৌতপথ—অমৃতের পথ, বাঁচিবার পথ। এতদ্ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যত পথ, সবই মৃত্যুর পথ। শ্রদ্ধা বিনা শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয়—স্বরূপের পরিচয় বা কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যের উপলব্ধি হয়—স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখন 'গুরুকৃষ্ণের আমি'—এই শুদ্ধ অহঙ্কার তাহার হৃদয়ে স্থান পায়। শ্রবণান্তর শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইলে হৃদয় হইতে সমস্ত অবিদ্যামল বিদূরিত হইয়া থাকে। তখন শুদ্ধজীব পরেশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-ধর্ম্মাত্মক পঞ্চতত্ত্ব নির্ম্মল স্বচ্চিত্তদর্পণে যথাযথ দেখিতে পায়। চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হওয়ায় স্বরূপ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মদর্শন ঘটিয়া থাকে। ভগবদ্দাস্যই সেই স্বধর্ম্ম। দাস্যে প্রবৃত্ত হইলে সংসারপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জীবের প্রপঞ্চে জন্মই ভব। কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত সংসারজ্বালা বা সংসারাগ্নি—ভোগাগ্নি—স্বসুখস্পৃহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না—আবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। মায়াভোগই জীবের প্রিয়, ইহাই দুর্নিবার সংসার; আর মায়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণসেবাই শ্রেয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্ জীবের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যভ্যাসভক্তির দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। সঙ্কীর্ত্তনে অখিল কল্যাণ উদিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তনকে বিদ্যাবধূজীবন বলিয়াছেন। ভগবৎশক্তি বস্তুতঃ এক। তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই দুইটী বৃত্তি। বিদ্যার দ্বারা তিনি যোগমায়া স্বরূপশক্তিতে পরিচিত, আর অবিদ্যার দ্বারা তিনি জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপ-

গুণাবরণকারিণী। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহার কৃপায় জীবের শুদ্ধচিদ্দেহ বা অধিকারভেদে গোপিকাদেহ প্রকটিত হয়। স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণবধূ—ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়। যোগমায়া কায়াস্বরূপিণী, আর মায়া ছায়াস্বরূপিণী। সংকীর্ত্তনপ্রভাবে জীবের স্থূললিঙ্গময় মায়িক শরীর অপগত হইলে অণুজীব নির্ম্মলত্ব-প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বরূপতঃ অণু বলিয়া তাঁহার ধর্ম্ম বা সুখ অণুস্বরূপ নহে, পরন্তু অনন্ত। সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা জীবের আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। শুদ্ধ-স্বরূপপ্রাপ্ত জীব অনন্তানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তদবস্থায় জীব প্রতিপদে অনুরাগের সহিত পূর্ণামৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। কীর্ত্তনপ্রভাবে সমস্ত মলিনতা বিধৌত হওয়ায় জীব স্নিগ্ধ হয় অর্থাৎ জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন।"

অনুক্ষণ শ্রবণ হইলে অনুক্ষণ কীর্ত্তন হইবে। হরির ন' হইলে হরিকীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? সেইজন্য প্রতিপদবিক্ষেপ কীর্ত্তনসম্রাট্ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে হওয়া চাই। নিরন্তর সাধুর সঙ্গ না হইলে হরিসঙ্গ বা হরিকীর্ত্তন হইবে না। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"একমুহূর্ত্ত সাধুসঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। হরিনাম **is the direct service of the Absolute Supreme Lord.** হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। **The only royal road approved by Shrimad Bhagabat** (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ) **is** নামকীর্ত্তন; আর সবই ন্যূনাধিক বঞ্চনাময়।"

অনেকে মনে করেন, স্মরণই মুখ্য ভজন, কীর্ত্তনাদি গৌণ। ইহা ঠিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত-অনুসারে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যভজন। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্মরণাদি কীর্ত্তন বা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের অধীন। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে স্মরণাদির চেষ্টা জড়প্রতিষ্ঠাসম্ভার মাত্র। যাহারা শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করে না, তাহারা কুমেধা। কলিযুগে যদি নয় প্রকার বা চৌষট্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনের সংযোগেই সেই সকল ভক্তিসাধন করিতে হইবে। সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই

নামসঙ্কীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য—উভয়ই। ভগবানে প্রেম-সম্পত্তির আবির্ভাব করাইতে নামসঙ্কীর্ত্তন অব্যর্থ। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতককুলের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়', 'প্রিয়' এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহাবিধুরা কুররী ও চক্রবাকী-পক্ষীর ন্যায় ভক্তসকল বিরহে প্রেমের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। এই নামসঙ্কীর্ত্তনের সমান অন্য কিছু নাই।

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং অমানী মানদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার কথা শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইয়াছেন। জাগতিক অভিমান বিন্দুমাত্র থাকাকালেও কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। জাগতিক ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহায় সহনশীল হইয়া এবং নিজ জাগতিক প্রতিষ্ঠার প্রতি উদাসীনতা ও অপরকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার প্রবৃত্তি লইয়া সর্ব্বদাই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হয়। তাদৃশ কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই জীবের চরম শুভোদয় ঘটিয়া থাকে।

অনর্থ ত্যাগ

ছাড়ি' কুটীনাটী
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ পরিপাটী।
ছাড়ি' গ্রাম্যকথা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ সর্ব্বদা।
ছাড়ি' অহং-মমতা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, নিত্য।
ছাড়ি' ভুক্তি-মুক্তি
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, করি' ভক্তি।
ছাড়ি' দুঃসঙ্গ-অবৈষ্ণব
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ নিষ্কপট।
ছাড়ি' শুষ্কজ্ঞান-নির্ব্বিশেষ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ সবিশেষ।
ছাড়ি' মনোধর্ম্ম-ফল্গুবৈরাগ্য
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ নিত্যসাধ্য।

ছাড়ি' নিজমান-প্রশংসা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, প্রেমপিপাসা।
ছাড়ি' জীবহিংসা-সাধুনিন্দা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ হয়ে অন্তরঙ্গা।
ছাড়ি' কূটকপট-ভজন
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ করি' সরল মন।
ছাড়ি' আলস্য-অনবধান
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, বরি গুরুচরণ।
ছাড়ি' লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা।
ছাড়ি' ষড়্‌বেগ-দশঅপরাধ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, সকলে মানদ।
ছাড়ি' ইহ সম্ভোগ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, ভক্তপদরজঃ লোভ।
ছাড়ি' "আমি বৈষ্ণব-বুদ্ধি"
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, স্বরূপে সিদ্ধি।
ছাড়ি' অপরাধ-অবিধি
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, গুরু আজ্ঞা শিরে বাঁধি।
ছাড়ি' অধোক্ষজে প্রাকৃত-বিচার
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, শ্রুতিসার।
ছাড়ি' মায়া-কল্পিতভাষ্য
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, শ্রদ্ধা ভক্ত-ভাগবত।
ছাড়ি' বহুধর্ম্ম-সমন্বয়
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ।
ছাড়ি' দেহাত্ম-বুদ্ধি
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, ভজনে প্রেমসিদ্ধি।
ছাড়ি' চারি পুরুষার্থ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, আশা—পঞ্চম পুরুষার্থ।
ছাড়ি' নির্ব্বিশেষ আবহ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ-বিগ্রহ।

ছাড়ি' "যত মত তত পথ"
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, হরের্নাম কেবল সৎমত।
ছাড়ি' কালবশ মানুষ-ভগবান্
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, কলিধর্ম্ম—হরিনাম।
ছাড়ি' আরোহপন্থা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, "শরণ" গীতার মর্ম্মকথা।
ছাড়ি' গুরু-বৈষ্ণবের অনুকরণ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, ধৈর্য্য-অনুশীলন।
ছাড়ি' শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, হরিনামে সদা রতি।
ছাড়ি' ঐশ্বর্য্য-বাসনা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, অকৈতব আরাধনা।
ছাড়ি' জড় সাহিত্য-প্রবন্ধ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, উপেক্ষা কলির পাষণ্ড।
ছাড়ি' কামিনী-কাঞ্চন-স্পৃহা
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, মাধবে অর্পিত তাহা।
ছাড়ি' নির্ব্বাণ-শূন্যবাদ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, সচ্চিদানন্দ শ্যাম।
ছাড়ি' বাহ্য বৈরাগ্য, ভোগ-কাম
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, বৈষ্ণব-আশ্রয়ে ভজনরহস্য ধাম।
ছাড়ি' কুতর্ক বাগ্‌যুদ্ধ
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ, মানব জনম সুদুর্লভ।
ছাড়ি' তথাকথিত কল্পিত নাম
ভজ নিতাই-গৌরাঙ্গ,
কলিধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন—বত্রিশঅক্ষর ষোলনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
নেতড়া (২৪ পরগণা দক্ষিণ)

নৃসিংহ

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয়, পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

শ্রীনৃসিংহদেব পরব্যোমস্থিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠের অন্যতমের অধীশ্বর সরস্বতী-লক্ষ্মীনাথরূপে বিরাজমান।

শ্রীনৃসিংহদেব চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নস্থিত হস্তে—চক্র ও ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে—পদ্ম এবং বামদিকের ঊর্দ্ধস্থিত হস্তে—গদা ও নিম্নস্থিত হস্তে—শঙ্খ সুশোভিত। সিদ্ধার্থ-সংহিতায় তাঁহার রূপবর্ণনে এইরূপ লিখিত আছে,—

"চক্রং পদ্মাং গদাং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।"

এই নৃসিংহ মূর্ত্তি অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও মহাকালস্বরূপ; কিন্তু ভক্তের নিকট বিঘ্নবিনাশন ও অভয়প্রদ। ইনি ভক্ত ও ভক্তির মর্য্যাদারক্ষক অধিদেবতারূপে জগতে প্রকটিত। যেখানে যেখানে ভক্ত ও ভক্তির উপর বিদ্বেষ বা প্রতিকূল চেষ্টা, সেই সেই স্থানেই শ্রীনৃসিংহদেবের অবতার।

শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের বিঘ্নবিনাশন। আমরা সত্যযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারক প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে ইহার জলন্ত সাক্ষ্য দেখিতে পাই। মহাভাগবত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর নববিধ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম এবং ষণ্ডামর্কের ন্যায় গৃহব্রত, কৌলিক ও লৌকিক গুরুব্রবগণের শ্রীকৃষ্ণভক্তির অভাব ও নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদরজোভিষেকে গৃহব্রতগণের মঙ্গলসম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কনককামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপু ভগবৎসেবায় প্রকৃষ্ট আহ্লাদযুক্ত মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নিজ পুত্রজ্ঞানে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' করিয়াছিলেন এবং নিজকে প্রকৃতির ভোক্তা ঈশ্বর মনে করিয়া ভগবৎসেবক প্রহ্লাদকে এবং প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুকে নিজভোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভাগবত প্রহ্লাদ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর কারকত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুময় জগৎ দর্শন করিতেন। প্রহ্লাদ যাবতীয় অসুর বালক, জগতের যাবতীয় জীবকে সেই বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেন। ইহাতে হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিল, তিনি ভগবদ্দাসকে নিজের ভোগ্য মনে করিলেন। প্রকৃতিকে নিজের সেবা-সম্ভার বলিয়া বিবেচনা করিলেন। 'ঈশাবাস্য জগতে'র কোথাও ভগবানের সত্ত্বা দেখিতে পাইলেন না। শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তরাজ প্রহ্লাদের

শুদ্ধভক্তি প্রচারের বিঘ্নবিনাশের জন্য স্ফটিক স্তম্ভ হইতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বকারকত্ব প্রদর্শন করিলেন। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে নৃসিংহদেবের স্বরূপ-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্‌যস্মৈ যথা যদুত যস্তপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্‌স্বভাবঃ সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥
(ভাঃ ৭।৯।২০)

"হে ভগবন্! পৃথক্ পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট—অর্ব্বাচীন পিত্রাদি অথবা প্রাচীন ব্রহ্মাদি যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে, যাহার সম্বন্ধে, যে আপাদান হইতে, যাহার নিমিত্ত, যে প্রকারে, যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর ঘটান, সেই সকলই আপনার স্বরূপ।

কাজীর 'ভক্ত ও কীর্ত্তন বিদ্বেষ'কালে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও কাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন,—

কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাঁড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত॥
সবংশে তোমারে আর * * নাশিনু।
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৭৮-১৮৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিঘ্নস্বরূপ পাষণ্ডীকুলের ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য নৃসিংহাবেশে হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও ভক্তবিদ্বেষী ব্যক্তিগণের ভয়োৎপাদন করিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-পণ্ডিতকে বৃহৎ সহস্রনাম পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীবাস 'সহস্রনাম' পড়িতে পড়িতে যখন নৃসিংহের নাম উচ্চারণ করিলেন তখন—

"নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥"　　(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৯২)

শ্রীনৃসিংহদেব অভক্তচক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু বা কালস্বরূপ হইলেও তিনি ভক্তের নিকট বরাভয়প্রদ! অভক্তের নিকট তিনি উগ্র, জ্বলন্ত, ভীষণাদপি ভীষণ—

"যদ্‌বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্" (ভাঃ ১।১।১৪)—তিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। আবার ভজনরত ভক্তের নিকট সুকোমল কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। প্রহ্লাদ বা হ্লাদিনীর (সেবাধর্ম্মের) আশ্রিত জীবের কখনও মৃত্যু হয় না, তিনি অমরশুদ্ধসেবাময় চিদ্বস্তু। সুতরাং হ্লাদিনীসেবারত জীবাত্মা বা প্রহ্লাদ অমৃতের কুসুমকোমল ক্রোড়ে সর্ব্বদা অবস্থিত। তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকে নৃসিংহ স্ফূর্ত্তি, কৃপাকটাক্ষবর্ষণশীল শান্তমূর্ত্তি। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতীয় প্রহ্লাদোপাখ্যানের (৭।৯।১) টীকামধ্যে একটী আগমবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥"

সিংহ যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি নিজজনের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

শ্রীনৃসিংহদেব বিষ্ণুভক্তির নিত্যসত্য প্রচারগণের বিঘ্নবিনাশরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি। নিত্যসত্যপ্রচারক বৈষ্ণব বহ্বীশ্বরবাদী বা পঞ্চোপাসকের ন্যায় গণেশের উপাসক নহেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিষ্কাম। ভগবৎসেবাই তাঁহার একমাত্র কামনার বস্তু। তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা নাই। জগতে অর্থের সুগম, ব্যবসায়ে লাভ এবং তদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছায় যে বিঘ্নবিনাশন দেবতা গণেশের উপাসনা করা যায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সেভাবে ভগবানের উপাসনা করেন না। ভগবৎসেবার প্রতিকূল বা বিঘ্নবিনাশের জন্য তিনি নৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ছয় গোস্বামীর বন্দনায় এই বিঘ্নবিনাশের তাৎপর্য্যটী আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১ম)
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বা ঠাকুর নরোত্তম বাঞ্ছিত বস্তু শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট প্রচার ব্যতীত আর কিছু নহে; সেই শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতিকূল বিষয়ই বিঘ্ন। সেই প্রতিকূল বিষয়ের অপর নাম দুঃসঙ্গ। সেই দুঃসঙ্গ ত্যাগের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যেই ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রিয়বস্তুর সেবায় নির্ব্বিঘ্নতা নিষ্কপট সেবকমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। তাহার দ্বারা সেব্যের প্রীতির পূর্ণতাই সম্পাদিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপাল একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং অচেতন হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হন। তখন সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন। বালকের ঐ মূর্চ্ছা—

"নিজ প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

এই ন্যায়ানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার প্রতিকূল জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু নৃসিংহমন্ত্রদ্বারা বালককে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। ঐরূপ চেষ্টা কিছু অদ্বৈত আচার্য্যের নিজ পুত্রের প্রতি মোহজাত কোন ব্যাপার নহে। মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্যে মায়া বা মোহের অধিষ্ঠান নাই। তিনি কৃষ্ণ-সেবাসুখ তাৎপর্য্যেই এরূপ বিঘ্নবিনাশের চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীনৃসিংহোপাসনা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের প্রাচীনতম আচার্য্য শ্রীদেবতনু বিষ্ণুস্বামি ও তাঁহার অনুগত জনগণ সকলেই নৃসিংহোপাসক। যাঁহারা শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকার টীকা এবং সায়ন মাধবাচার্য্যের রসেশ্বর দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে জানেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ নৃসিংহের স্তবে বলিয়াছেন,—

"স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ।
যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদ একজন নৃসিংহোপাসক। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে নৃসিংহদেবের প্রণাম করিয়াছেন,—

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥" (**ক্রমশঃ**)

"তিতা বেহায়া"

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—একদিন আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত শব্দটি ব্যবহার করাতে তাঁহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ কৃতকার্য্যের সমুচিত দণ্ড লাভ করিয়াও উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হয় না, তাহারই নাম—"তিতা বেহায়া"।

এই মহামায়ার কারাগারে দাগী চোরের অভাব নাই। দাগী চোরেরা বার বার অপরাধের দণ্ড পাইয়াও বার বারই দণ্ড পাইবার মত দুষ্কর্ম্মে রত হয়। কিছুতেই তাহাদের লজ্জা হয় না। সংসাররূপ ভয়াবহ কারাগৃহে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ জীবগণ নিয়ত ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না, সর্ব্বদা বিষয়-বিষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও ঐ বিষের বিষম পিপাসা বিদূরিত হওয়া ত' দূরের কথা, কেবল যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মহামায়ার কারাগারের কয়েদী দাগী চোরদেরই "তিতা বেহায়া" আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।

অন্যের কথা কি বলিব; অদ্য আমি আমার বিষয়াসক্তিরূপ দুর্দ্দৈব বা "তিতা বেহায়াপনা'র কথাই কিছু অধমতারণ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে উপস্থিত হইতেছি।

"এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥"

বার বার এই মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে প্রবঞ্চিত হইয়াও আমি মায়াদেবীর বহুরূপিণী মূর্ত্তির বহুমানন করিতেছি; সর্ব্বোত্তম উপকারক, পতিতপাবন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অপেক্ষা, মায়াবাণীর ছলবাক্যেই অধিকতর আস্থা স্থাপন করিতেছি! হায়! আমি দু'দণ্ডের চিন্তায় বিব্রত হইয়া আমার নিত্য জীবনের

পরম প্রয়োজনীয় রত্নরাশি হেলাভরে পদদলিত করিতেছি। আমি মনে ভাবি, সাধু ও শাস্ত্রের বাণী যখন আমার দেহ ও মনের সুখবিধান করিতেছে না, উহা আমার শত শত ভ্রান্ত-ধারণার আনুগত্য করিতেছে না, তখন আর উহার মূল্য কতটুকু?

হায়, আমি কি শুনি নাই যে, এই বিশ্বের দরবারে খাঁটি কথা নাই, বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া কোন বস্তুই এখানে পাওয়া যায় না? যত 'মেকী মাল' আজ রাংতা মাখাইয়া মায়ার হাটে সুবর্ণের স্থান অধিকার করিয়াছে! ইতর কথা—অসদ্বার্ত্তা, আজ লোকমনোহারিণী সজ্জায় সাজিয়া অনভিজ্ঞ সরল জনের প্রাণনাশ করিতেছে।

আমার শ্রীহরি-কথা শ্রবণ হয় নাই। যদি কান পাতিয়া তাহা শুনিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়োজিত করিতে পারিতাম। যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত পরমমঙ্গলময়ী বাণীধারা কর্ণাঞ্জলি ভরিয়া পান করিতাম, তবে আজ কিছুতেই আর বিষয়ি-সঙ্গে অসৎকথা-রঙ্গে আনন্দে কালযাপন করিতে পারিতাম না,—নিশ্চয়ই আমার এই জীবনের গতি চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, নিত্য জীবনের পরম প্রয়োজন শ্রীহরি-সেবা অপেক্ষা যখন বর্ত্তমান জীবনের দু'দণ্ডের ভাবনা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখন আমি নিশ্চয়ভাবে বুঝিতেছি—আমার কতদূর অধঃপতন হইয়াছে। যদি আমি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট হইতাম, তবে বহির্ম্মুখ বিশ্বের নানা কথা কখনই আমার চিত্তকে বিমোহিত করিতে পারিত না।

কতবার ঠকিলাম; এই নশ্বর জগতের নশ্বর বস্তুকে ভালবাসিয়া কত দণ্ড ভোগ করিলাম। কত যোনি পরিভ্রমণ করিবার পর এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি। হায়রে তিতা বেহায়া! ওরে অবোধ মন! এখনও তোমার চেতনচক্ষু উন্মীলিত হইল না? তোমার গতি কি হইবে? পরমকরুণ শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীআচার্য্যদেবের অপার করুণা প্রত্যাখ্যান করিয়া তুমি বিষয়-সেবায় নিযুক্ত আছ! তুমি কি জাননা, মায়ার সংসারের সেবা হরিসেবা নহে; বিষয়-প্রীতি আর হরি-সেবা-প্রীতি এক নহে? হরি-বিমুখ দারুণ সংসারের সেবা করিতে করিতে আমার অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিতান্ত বহির্ম্মুখতা বরণ করিয়া মায়ার প্রতি অত্যাসক্তিরূপ সুদৃঢ় লৌহ-নিগড় গলায় পরিতেছে! আমি ত' মহাজন-গীতিতে শুনিয়াছি,—

"সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥

গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
কিসের সংসার এই ছায়া-বাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥"

—কিন্তু শ্রবণের মূল্য রাখিলাম কই? শ্রবণের অভিনয় করিয়াছি মাত্র!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'তিতা বেহায়া দাগী চোরে'রা বার বার দণ্ড পাইয়াও লজ্জিত হয় না; পুনরায় দুষ্কর্ম্ম করে। শ্রীহরিসেবাবিমুখ আমিও সংসারাসক্তি-রূপ দুষ্কর্ম্মের ফলে কারাযাতনা লাভ করিয়াও পুনরায় সংসার-বাসনারূপ তিতা বেহায়াপনা করিতেছি!

মায়াদেবী আমাকে,—

"কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

পুনঃ পুনঃ অশেষক্লেশদ জন্ম-মরণ মালায় আবর্ত্তিত হইয়াও কি আমার সুবুদ্ধি হইল না? এখনও আবার অনন্তদুঃখপ্রদ সংসার-মোহেই প্রমত্ত রহিলাম? ছায়াবাজীর মত এই অসার সংসারের সেবায় যে একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমশঃ মৃত্যুর দিন নিকটতর হইয়া আসিল! আর কবে পরমদয়াল শ্রীগুরুদেবের অভয় অশোক পাদপদ্মে প্রসন্ন হইব? দিনত' গেল! শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়ভেরীতেও কি আমার মোহ-ঘোর ভাঙ্গিবে না?

কখনও কি আমি এই গীতিকা-শ্রবণের মত উন্মুখ কর্ণ লাভ করিব না?—

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥"

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

(তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত)

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

দামোদর-ব্রতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), তাং ১৯।১০।১৯৯৪]

আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্ত্তিক পূর্ণিমা, মাস হিসাবে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক—এই চার মাস নিয়ে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত। এই ব্রত আরম্ভ করার তিনটে নিয়ম আছে। দ্বাদশীতে ব্রত আরম্ভ করে দ্বাদশীতে শেষ করতে হয়, পূর্ণিমাতে ব্রত আরম্ভ করতে হয়; পূর্ণিমাতে শেষ করতে হয়। আর একটা নিয়ম হল—মাসের প্রথম আরম্ভ হয় এবং মাসের শেষে শেষ করতে হয়। একে বলে কর্কট সংক্রমণ পক্ষে ব্রত। এটা সাধারণত বাইরের লোক যাঁরা তাঁরা করেন। আর মঠ-মন্দিরের লোক তাঁরা পূর্ণিমা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিমাতে শেষ করেন, কেউবা দ্বাদশীতে ব্রত আরম্ভ করে দ্বাদশীতে শেষ করেন। আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পঞ্জিকায় "ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ"—পূর্ণিমা থেকে ব্রত আরম্ভ বলে লেখা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এই তিনটে নিয়মের মধ্যে দুটীকে মেনে নিয়েছে—দ্বাদশী থেকে দ্বাদশী এবং পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা।

এই চার মাসের যে হিসাবটা দিয়েছেন, এর মধ্যে কিছু বিধি-নিষেধ আছে।—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

শ্রাবণ মাসে কোনরকম শাক খাওয়া যায় না, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ খাওয়া যায় না। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভের প্রথমে লেখা আছে—বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ে শাস্ত্রানুসারে ব্রত করতে হবে। ব্রতটা কারও খেয়ালখুশীমত করলে চলবে না, শাস্ত্রানুসারে করতে হবে।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেবং বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥

বিধি নিষেধ ছাড়া যদি কেউ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করেন, তাহলে সে ব্রতের কোন ফল হয় না—শাস্ত্রে এটা বলা আছে। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মেনে নিয়েই ব্রত করতে হবে। শাস্ত্রের যে বিধি-নিষেধ, সেটা মেনে নিয়ে আমাদের ব্রতোপবাস ইত্যাদি করা দরকার। গীতার মধ্যে আমরা একটী শ্লোক দেখতে পাই,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

যিনি শাস্ত্রের বিধি-বিধান অস্বীকার করে, অমান্য করে নিজের খেয়ালখুশী মত কিছু করেন, তার কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তার সিদ্ধিলাভ হয় না। 'ন সুখং ন পরাং গতিম্'—তার জীবনে সুখ-শান্তিও মেলে না। শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করলে হবে না, শাস্ত্রবিধি মেনেই আমাদের চলতে হবে। আবার বলছেন,—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

যখন তত্ত্বসিদ্ধান্ত-বিষয়ে আমাদের কিছু সংশয় দেখা দেবে তখন শাস্ত্রের বিচারই আমাদের মাধ্যম। শাস্ত্রের বিচার, শাস্ত্রের যে রায়—**Judgement** সেটাই আমাদের মেনে নিতে হবে, বলা আছে। যখন আমরা ভাল-মন্দের বিচারটা নিজেরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারব না, তাতে সংশয় দেখা দেবে, সন্দেহ দেখা দেবে, তখন শাস্ত্রীয় বিচারের পরে নির্ভর করতে হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলেছেন,—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য,　　এ তিনে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।"

সাধুর কথা, শাস্ত্রের কথা ও গুরুর বাক্য—এই তিনটেকে একই জানতে হবে। সাধু যা বলেন শাস্ত্র তাই বলেছেন; গুরু যা বলেছেন শাস্ত্রে সেটা আছে, অতএব তিনটে একই সূত্রে গাঁথা। যদি কেউ কখনও বলেন যে, আমার গুরু এমন একটা কথা বলেছেন যা শাস্ত্রে কোথাও লেখা নাই; আমার গুরু এমন ব্যবস্থা দিলেন যা শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা নাই, শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। তাহলে বুঝতে হবে গুরু খেয়ালখুশীমত কিছু বলছেন। একজন সাধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তিনি এমন কতকগুলি উপদেশ করলেন, যা শাস্ত্রে কোথাও নাই। তাহলে বুঝতে হবে ঐ সাধু নিজে কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। বিচারটা হল এই—সাধু যা বলবেন, গুরু যা বলবেন, বৈষ্ণব যা বলবেন, সেটা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রেরই কথা তাঁরা বলবেন। এইজন্য তাঁদের পরিচয়—সাধু, গুরু, বৈষ্ণব। শাস্ত্র ছেড়ে বাইরে কিছু বলতে পারবেন না, ক্ষমতা নাই তাঁদের। যদি বলেন তাহলে কেউ গ্রহণ করবে না, শুনবে না। 'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।' —এর তাৎপর্য্য হল—সাধু যা বলেন, শাস্ত্র তা বলেছেন; গুরু যা বলেন, শাস্ত্র তাই বলেছেন; বৈষ্ণব যা বলেন, উপদেশ করেন, শাস্ত্র তাই বলেছেন।

যদি প্রশ্ন হয়—শাস্ত্র কি?—শাস্ত্র হল ভগবানের মুখের বাণী। ভগবানের মুখের বাণী যে শাস্ত্র, তা আবার দুরকম, একরকম নয়। প্রথম বাণী হচ্ছে

বেদ, সেটা হল ভগবানের নিশ্বষিত বাণী। ভগবানের নিশ্বাস থেকে বেদের উৎপত্তি। পরোক্ষবাদ—**Passive Voice, Active Voice** নহে। গীতা-ভাগবতে ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে বলছেন—এটা কর, এইটা করতে হবে, এটা করো না। এই দুইভাগে—বিধি আর নিষেধ বিচার করা আছে। এটা এটা করলে তোমাদের আত্মকল্যাণ হবে, আর এগুলো আচরণ করবে না, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। এইরূপ গৌণ ও মুখ্যভেদে—**Positive** ও **Negative** দুই **side** নিয়ে বলা আছে। তার মধ্যে যেটা **direct speach** তাকে বলে গীতা-ভাগবত। আর বেদের কথা হল—এটা করলে ভাল, এটা করলে ভাল হয়, ঠিক এইরকম ধরণের ভাষা। এই কথাটা ভাগবত ১১শ স্কন্ধের ভিতরে বুঝানো আছে।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

এই বেদ হল পরোক্ষবাদ। 'বালানামনুশাসনম্'—বাচ্চা ছেলেমেয়েদের যেভাবে শেখান হয়, সেইরকম শিক্ষা এর ভিতরে আছে। কিরকম?—'কর্ম্মমোক্ষায়'। কর্ম্ম দুরকমের। এক রকমের কর্ম্ম করলে আমরা বন্ধনদশায় পড়ে যাই, আর এক রকম কর্ম্ম করলে আমাদের মুক্তদশা আসে। কর্ম্মের ঠিক **process, procedure** আমাদের জানা নাই, সুতরাং বদ্ধজীব আমরা যা করি সব ভুল করে ফেলছি। ফলে নানা দোষ আমাদের ঘাড়ে চেপে যাচ্ছে। এই বন্ধনদশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, রক্ষা পাওয়ার জন্য বেদের বিধি-ব্যবস্থাগুলো যা আছে সেটা কি রকম? কর্ম্ম করে আমাদের যেন বন্ধনদশা না হয়, তার থেকে যাতে মুক্তিলাভ করি, সেই ব্যবস্থাটা দেওয়া আছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অসুখ করেছে, ঔষধ খাওয়াতে হবে। ঔষধটা খুব তেতো। যেমন অসুখ তেমন ঔষধটাও দরকার। লোকে কথায় বলে,—'যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।' 'কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥' কর্ম্মমুক্তির জন্য ব্যবস্থা যেটা আছে, যে ঔষধটা আছে, সে ঔষধটা বড় তেতো। বাচ্চা যখনই জানতে পারে যে ঔষধটা তেতো, তখন যে কিছুতেই গিলতে চায় না। না, না, খাব না, খাব না বলে। এখন **Guardian** যাঁরা তাঁরা ত' জানেন যে ঔষধটা ওকে খাওয়াতেই হবে। তখন তাঁরা আবার একটা ব্যবস্থা নিয়ে নিয়েছেন। কি?—ঐ তেতো ঔষধের মধ্যে **Syruph base** দিয়ে দিচ্ছেন। **Syruph** মিশিয়ে দিলে ঔষধটা মিষ্টি হয়ে গেল, তখন বাচ্চা ঔষধটা গিলে ফেলল। বাচ্চা যেমন চট্ করে তেতো ঔষধটা গিলতে চায় না, সে আরও কিছু জিনিস চায় ওর সঙ্গে, বেদেও ঠিক ওরকম প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তুমি এই

তেতো ঔষধটা খেয়ে ফেল তোমাকে লাড্ডু দেব, অনেক মিষ্টি দেব। এই খণ্ড-লড্ডুকাদি দেখিয়ে রাখছে, ওটার লোভে লোভে বাচ্চাটা ঔষধ গিলে ফেলছে। যখন ঔষধটা খেয়ে ফেলল তখন বলা হচ্ছে—তোমার ত' এখন পেটটা খারাপ হয়েছে, জ্বর হয়েছে, জ্বরটা ছেড়ে যাক্, তখন তোমাকে দেব এই মিষ্টি। আমি খাব না, তোমাকেই দেব, তুলে রাখলাম তোমার জন্য। **Guardian** যেমন করেন বাচ্চার রোগ নিরাময়ের জন্য, বেদের মধ্যেও ওরকম ব্যবস্থা দেওয়া আছে। কিছু প্রলোভন না পেলে আমরা কিছু করতে চাচ্ছি না এ সংসারে।

কৃষ্ণের বড় চিন্তা, অর্জ্জুনকে যখন গীতায় উপদেশ করছেন তখন তিনি তার ভিতরে অর্জ্জুনকে বলছেন অর্জ্জুন, তুমি মনে কর যে আমি যদি কর্ম্ম না করি, আমি যদি কর্ম্মাচরণ না করে জগৎকে শিক্ষা দিই তাহলে কি হয়? তুমি চিন্তা কর—আমি যদি কর্ম্মাচরণ না করি তাহলে জগতের লোক কর্ম্মাচরণ করবে না, জগৎ উচ্ছন্নে যাবে। সুতরাং আমি **Supreme Guardian, Supreme Authority** হয়েও আমাকে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

উৎসীদেয়ুরীমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

এ কষ্টকর পরিশ্রম আমাকে করতে হচ্ছে। কেন?—আমি ত' উপরওয়ালা **Guardian,** আমি যেটা করে দেখাব জগতের লোক সেটা করবে। এজন্য আমাকে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বিচারটা ত' এইরকম। কিন্তু কোন্‌টা ঠিক ঠিক বাস্তব কর্ম্ম, আর কোন্‌টা কর্ম্মবন্ধন' সেটা ত' আমরা বুঝি না। যদি না বুঝি তাহলে শাস্ত্রের **Theory** নিয়ে চলতে হবে আমাদের। এই কথা বুঝানো আছে।

বাচ্চা ছেলেকে যেমন কৌশল করে খণ্ড-লড্ডুকাদির প্রলোভন দেখিয়ে তেতো ঔষধ খাওয়ান হয়, ঠিক ঐরকম বেদও চেষ্টা করেছেন। আমরা সব বোকা লোক, কিছু বুঝি না, তাই প্রলোভন দেখিয়েছে। প্রলোভনটা কিরকম? উদাহরণ কিছু আছে?—হ্যাঁ আছে। সাধারণভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাঁরা করেন, তাঁদের ফলটা খুব একটা বেশী হয় না। ব্যাপারটা কি? তুমি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কর, তাহলে তুমি অক্ষয় স্বর্গে যাবে—প্রলোভন দেখান হল। স্বর্গসুখ কখনও অক্ষয় হয় না, এটা প্রলোভন মাত্র। স্বর্গসুখ ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। কেননা তার একটা সময় --**Time limit** আছে। তার মধ্যে এটা শেষ। তাহলে অক্ষয় স্বর্গসুখ যেটা, এটা একটা সোনার পাথরবাটী, শশবিষাণ, আকাশকুসুম। সোনার পাথরবাটী কখনও হয় না। (**ক্রমশঃ**)

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ অনুকম্পায় তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে গত ১৮ই বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ২।৫।১৯৯৫), মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে পরমক্ষর-তত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেন।



এতদুপলক্ষে ১৭ই বৈশাখ, ১৪০২ (ইং ১।৫।৯৫), সোমবার হইতে ১৯শে বৈশাখ (ইং ৩।৫।৯৫), বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী এক বৃহৎ কর্ম্মসূচী শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সুপরিচালনায় এবং তন্নির্দ্দেশ-ধন্য সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক উদ্যোগে অতি সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত হইয়াছে।

নির্ম্মুক্ত আকাশে দৈবাৎ কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার এবং হাল্কা বৃষ্টিসহযোগে অধিবাস-দিবসের শুভ-সূচনায় কাষ্ঠগণ পরমোল্লাসে প্রাতঃকাল হইতেই বিভিন্ন

রঙ্গিন কাগজ ও বস্ত্রাদিনির্ম্মিত পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, পুষ্প-মাল্যাদিদ্বারা শ্রীমন্দিরসহ উৎসব-প্রাঙ্গন ও প্রবেশদ্বার সুসজ্জিত করিতে থাকেন। অপরদিকে বৈষ্ণব-পুরোহিতগণ পরমোৎসাহে শ্রীবিগ্রহের সেবাপীঠ সংস্থাপন করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় এক বিশাল নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সুসজ্জিত ব্যাণ্ডপার্টিসহ শ্রীমঠ, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র-খচিত ব্যানার ও নানা বর্ণের পতাকাময় সমগ্র সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঝাঁঝর-কাঁসর, খোল-করতাল সহযোগে মহামন্ত্রের উচ্চনিনাদে সমগ্র নগর ও নাগরিকগণ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকেন। সর্ব্বপশ্চাতে অশ্বচালিত-সুসজ্জিত রথ উজ্জ্বল করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-প্রচারলুব্ধ অবতারসার শ্রীগৌরহরি ধন্যকলি-জীবের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনানুগমন করিতে থাকেন। অপরদিকে সঙ্কীর্ত্তন-শ্রম নিবারণকল্পে নিরন্তর মেঘচ্ছায়ায় মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টিরূপ হাল্কা বর্ষণ হইতে থাকে। এইরূপে নগর ভ্রমণ-শেষে শ্রীগৌরহরি ও গৌড়ীয়গণ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আরাত্রিক ও ধর্ম্মসভাদি অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই বৈশাখ, ১৪০২ (ইং২।৫।৯৫), মঙ্গলবার "মঙ্গলং মঙ্গলানাম্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলারাত্রিকান্তে সংকীর্ত্তনযোগে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীর পবিত্রোদক শ্রীমঠে নীত হইলে শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুষসূক্তাদি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ও নামাবতারের সঙ্কীর্ত্তনার্চ্চন-সহযোগে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা-যমুনা এবং বিভিন্ন তীর্থের ১০৮ ঘটপূর্ণ জলদ্বারা অর্চ্চাবতারের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকাদি ক্রমানুসারে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলে সমাগত প্রায় ত্রিসহস্রাধিক সুকৃতিশালী ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। তবে মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিয়া মহাপ্রসাদ সেবনেচ্ছুগণের ধৈর্য্য-উৎসাহ পরীক্ষার যে কঠিন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গ নিশ্চয়ই ধন্য।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে বিরাট্ ধর্ম্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ (রুদ্রদ্বীপ), শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

আচার্য্য মহারাজ প্রমুখ বক্তৃগণ 'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান্ বক্তৃতা প্রদান করেন। নির্ব্বিশেষবাদী-সাধকগণের হিতার্থে তাহাদের স্বকপোলকল্পিত যে পৌত্তলিকতা, তাহা হইতে বৈষ্ণবগণ সদা সহস্রযোজন দূরে অবস্থান করেন। জগতের অভিজ্ঞানে পুষ্ট এইসকল আধ্যক্ষিকগণ শ্রৌতপথ-চ্যুত হইয়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তায় স্বীয় মাটিয়াচিন্তা প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে নিরাকার, নিঃশক্তিক করিবার অহৈতুক ধৃষ্টতা এবং অর্ব্বাচীনতা প্রদর্শন করেন মাত্র। বস্তুতঃ সমগ্র বেদ-উপনিষদের নির্য্যাসরূপ বেদান্ত-সূত্র এবং তাঁহারও সার-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে কুত্রাপি ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানের শ্রীঅঙ্গ খণ্ড করিবার অবকাশ নাই। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি-মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবগম্ভীর ভাষায় শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব, প্রতিমা ও বিগ্রহের পার্থক্য বর্ণন ও সাক্ষীগোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথাদি সম্পর্কিত উপাখ্যানসমূহ কীর্ত্তনমুখে ঘোষণা করেন যে, ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ লীলা নিত্য—তাহাতে সাধকাসাধক কাহাকেও সংশয়ান্বিত হইতে হইবে না। ভক্ত-সাধকের মঙ্গলবিধানার্থেই তাঁহার মৌনমুদ্রাবলম্বন অথবা মৌনাবস্থা ভঙ্গ।

১৯শে বৈশাখ, ১৪০২ (ইং ৩।৫।৯৫), বুধবার সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে 'শ্রীমঠ-মিশনের প্রয়োজনীয়তা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু-মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ বক্তৃতার পর, সভাপতি মহারাজ দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মঠ-মিশনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার সংরক্ষণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ভাবী প্রজন্মকে কত উন্নততর করিতে পারে—দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচলন অবশ্য কর্ত্তব্য—সে সম্পর্কে তুলনামূলক ভাষণ প্রদান করেন।

পরিশেষে এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ, আনুকূল্যকারী সুধী-ভক্তবৃন্দ ও প্রশাসন-বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ৫ শ্রীধর, সঙ্কর্ষণ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ৩২ আষাঢ়, সোমবার, ১৪০১, ইং ১৭/৭/৯৫ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীগোপালরাজায় নমঃ

বপুরতুল-তমালস্ফীত-বাহূরুশাখো-
পরিধৃত-গিরিবর্য্য-স্বর্ণবর্ণৈকগুচ্ছঃ।
কটিকৃত-পরহস্তারক্ত-শাখাগ্র-হৃদ্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥ ১॥

যাঁহার দেহরূপ নিরুপম তমাল-বৃক্ষস্থিত সুদীর্ঘ বাহু-শাখার উপরি-পরিধৃত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বর্ণবর্ণ গুচ্ছ-সদৃশ শোভা পাইতেছেন এবং যাঁহার দক্ষিণহস্ত কটিতটে ন্যস্ত হওয়ায় করস্থিত রক্তবর্ণ অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ মনোহর

শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অর্থাৎ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের একপ্রদেশে রাজোপবেশনের উপযুক্ত স্থানে প্রতাপী হইয়া সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

রুচির-দৃগভিধানে পঙ্কজে ফুল্লয়ন্তং
সুভগ-বদন-গাত্রং চিত্রচন্দ্রং দধানঃ।
বিলসদধরবিম্ব-ঘ্রায়িনাসা শুকৌষ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ২ ॥

যিনি শোভমান বদন-গাত্ররূপ বিচিত্র চন্দ্র ধারণ করিয়া মনোহর নয়ন নামক কমলদ্বয়কে প্রস্ফুটিত করিতেছেন, যাঁহার শুকৌষ্ঠ-সদৃশ নাসিকা বিলাসশালী অধর-বিম্বকে আঘ্রাণ করিতেছে, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহর-রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

চল-কুটিলতর-ভ্রূকার্ম্মুকান্তর্দৃগন্ত
ক্রমণ-নিশিতবাণং শীঘ্রযাণং দধানঃ।
দরয়িতুমিব রাধাধৈর্য্য-পারীন্দ্রবর্য্যং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার ধৈর্য্যরূপ সিংহরাজকে বিদীর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন চঞ্চল অথচ কুটিল ভ্রূরূপ ধনু-মধ্যে অপাঙ্গ সঞ্চালনরূপ দ্রুতগামী-শাণিত শর সংযোজিত করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অসুলভমিহ রাধাবক্ত্র-চুম্বং বিজান-
ন্নিব বিলসিতুমেতচ্ছায়য়াপি প্রদূরাৎ।
মুকুর-যুগলমচ্ছং গণ্ড-দম্ভেন বিভ্রৎ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৪ ॥

"শ্রীরাধিকার অধর-গ্রহণ আমার সম্বন্ধে অতীব দুর্ল্লভ" ইহা জানিয়াই যেন অতিদূর হইতে তদীয় প্রতিবিম্ব বিলাসানুভব-মানসে যিনি অহঙ্কারপ্রযুক্ত গণ্ডচ্ছলে সুনির্ম্মল দর্পণযুগলকে ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপ-সহকারে শোভনরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

রুচিনিকর-বিরাজদ্দাড়িমী-পক্কবীজ-
প্রকরবিজয়ি-দন্তশ্রেণী-সৌরভ্যবাতৈঃ।
রচিত-যুবতি-চেতঃ কীর-জিহ্বাতি-লৌল্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৫ ॥

যিনি কান্তিসমূহে সুশোভিত দাড়িম্ব-পক্কবীজ-সকলের বিজয়শীল দন্তশ্রেণীর সুগন্ধি বায়ুদ্বারা ব্রজ-যুবতীগণের চিত্তরূপ শুক-জিহ্বার অত্যন্ত চাঞ্চল্য বিধান করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বচন-মধু-রসানাং পায়নৈর্গোপরামা-
কুলমুরুধৃত-ধামাপ্যুন্মদীকৃত্য কামম্ ।
অভিমত-রতিরত্নান্যাদদানস্ততোদ্রাক্
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৬ ॥

গোপরামা-সকল অত্যন্ত প্রভাবশালিনী হইলেও তাঁহাদিগকে যিনি বাক্যরূপ মধু-রস পান করাইয়া যথেষ্ট উন্মত্ত করত তাঁহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র স্বাভীষ্ট রতি-রত্ন গ্রহণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

কুবলয়-নিভভালে কৌঙ্কুম-দ্রাবপুণ্ড্রং
দধদিব ঘনষণ্ডে নিশ্চলচ্চঞ্চলাগ্রম্ ।
রচয়িতুমিব সাধ্বী-কীর্ত্তি-মুগ্ধালি-ভীতিং
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৭ ॥

ভ্রমর যেরূপ স্থিরতর বিদ্যুতের অগ্রভাগের ন্যায় কোন পীতবর্ণ বস্তুধারীকে নীলোৎপলে অদৃষ্টপূর্ব্বের মত দেখিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ যিনি সতীদিগের কীর্ত্তিরূপ মুগ্ধ-ভ্রমরের ভয়োৎপাদন-নিমিত্ত যেন স্বীয় নীলোৎপল-সদৃশ কপালে কুঙ্কুম-তিলক ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপ-সহকারে মনোহর-রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

শ্রবণ-মদন-রজ্জূ সজ্জয়ল্লজ্জি-রাধা-
নয়ন-চল-চকোরৌ বন্ধুমুৎকঃ কিশোরৌ ।
কৃত-মকর-বতংস-স্নিগ্ধ-চন্দ্রাংশু-চারঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৮ ॥

যিনি লজ্জাবতী শ্রীরাধিকার নয়নরূপ কিশোর চঞ্চল চকোরযুগলকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত উন্মনা হইয়া সুবিশাল শ্রবণ-রূপ মদন-রজ্জুকে মকরাকৃতি কর্ণ-ভূষণদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মনোহর চন্দ্র-কিরণ বিস্তার করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে নিরতিশয় প্রতাপ-সহকারে মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যুবতি-করণরত্নং ব্রাতমাচ্ছিদ্য নেত্র-
ভ্রমণপটুভটৈস্তং ন্যস্য হৃৎসৌধ-মধ্যে ।

গরুড়মণি-কবাটেনোরসাঘুষ্য হৃষ্টঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ৯ ॥

যিনি ব্রজ-যুবতীগণের ইন্দ্রিয়রূপ রত্নরাশিকে নেত্র-ভ্রমণ-রূপ সুপটু যোদ্ধাদ্বারা হরণ করত স্বীয় হৃদয়রূপ অট্টালিকা-মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া গরুড়মণি নির্ম্মিত কবাটস্বরূপ বক্ষঃস্থলদ্বারা নীবীবন্ধে মুদ্রাদির ন্যায় স্থাপনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

ত্রিবলি-ললিত-তুন্দস্যন্দি-নাভীহ্রদোত্থ-
তনুরুহততি-সর্পীমত্র বিভ্রাণ উগ্রাম্।
যুবতি-পতিভয়াখু-গ্রাসনায়েব সদ্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ত্রিরেখাদ্বারা সুললিত উদর হইতে গলিত বস্তুর ন্যায় ধারাবাহিনী অথচ নাভিহ্রদ হইতে উদীয়মানা রোমরাজিকে যুবতীগণের পতিভয়-রূপ মূষিককে গ্রাস করাইবার নিমিত্তই যেন ভয়ানক সর্পী সদ্যই উদরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মরকতকৃত-রম্ভাগর্ব্ব-সর্ব্বংকষোরু-
দ্বয়মুরু-রসধাম প্রেয়সীনাং দধানঃ।
স্ফুরদবিরল-পুষ্ট-শ্রোণিভারাতিরম্যঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১১ ॥

যিনি শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গের একমাত্র রসাশ্রয়ের স্থান-স্বরূপ হরিদ্বর্ণ মরকতমণি নির্ম্মিত কদলীবৃক্ষের গর্ব্বচূর্ণকারী উরুযুগলকে ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি পরস্পর সংলগ্ন ও পরিপুষ্ট নিতম্ব-ভারে রমণীয় হইয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

মদন-মণিবরালী সংপুট-ক্ষুল্লজানু-
দ্বয়-সুললিত জঙ্ঘামঞ্জু-পাদাব্জযুগ্মঃ।
বিবিধ-বসন-ভূষা-ভূষিতাঙ্গঃ সুকণ্ঠঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১২ ॥

মদন-মণিনির্ম্মিত সংপুট অর্থাৎ তাম্বূলাধারও যাহার নিকট ক্ষুদ্র বোধ হয় তাদৃশ জানুদ্বয়দ্বারা যাঁহার জঙ্ঘা ও মনোজ্ঞ পাদপদ্মযুগল সুললিত এবং যাঁহার

বিবিধপ্রকার বসনভূষায় অঙ্গ বিভূষিত, সেই সুকণ্ঠ গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপী মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

কলিত-বপুরিব শ্রীবিট্‌ঠল-প্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্য্যা-ধৈর্য্য-পীযূষ-পুষ্টঃ।
দ্যুতিভর-জিত-মাদ্যন্ মন্মথোদ্যৎ সমাজঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি স্বীয় অবতার-বিশেষ শ্রীবিট্‌ঠলের মূর্ত্তিমান প্রেমরাশি-স্বরূপ, যিনি পরিজনবর্গের পরিচর্য্যারূপ উৎকৃষ্ট অমৃতভোগে পুষ্টাঙ্গ এবং যিনি স্বীয় কান্তিমালা-দ্বারা সমুদ্যত মন্মথ-সমাজকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে অতিশয় প্রতাপী হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

বিবিধ-ভজনপুষ্পৈরিষ্ট-নামানি গৃহ্ণন্
পুলকি-তনুরিহ শ্রীবিট্‌ঠলস্যোরু-সখ্যৈঃ।
প্রণয়-মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি শ্রীবিট্‌ঠলের সখ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্বারা পুলকিতাঙ্গ হইয়া ইষ্টনাম গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিতেছেন, সেই গোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

গিরিকুল-পতি-পট্টোল্লাসি-গোপালরাজ-
স্তুতি-বিলসিত-পদ্যান্যুদ্ভট-প্রেমদানি।
নটয়তি রসনাগ্রে শ্রদ্ধয়া নির্ভরং যঃ
স সপদি লভতে তৎ প্রেমরত্নং প্রসাদম্ ॥ ১৫ ॥

যিনি গিরিবর গোবর্দ্ধনের পট্টদেশে উল্লাসশীল গোপালরাজের স্তুতি-সুশোভিত এই পদ্যাবলীকে নিরতিশয় প্রেমপদরূপে রসনাগ্রে শ্রদ্ধার সহিত নৃত্য করান অর্থাৎ নিরন্তর পাঠ করেন, তিনি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতাযুক্ত প্রেমরত্ন লাভে সমর্থ হন ॥ ১৫ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীমদ্ভাগবত

১। মূলভাগবত বা চতুঃশ্লোকীর রহস্যটি কি? 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' কোন্ মূল-নীতির অনুসরণে লিখিত?

"ওঁ"

॥ তৎ সৎ ॥

সত্যং পরং ধীমহি।

মূলভাগবতং চতুঃশ্লোকম্

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং } (অন্বয়ান্নির্ব্বিকল্পদর্শনং)
যাবানহং

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১ ক ॥

যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং } (ব্যতিরেকাৎ সবিকল্পদর্শনং)
যথা ভাবো

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ২ ক ॥

সরহস্যং } (আত্মপরমাত্মলীলাপরিচয়ং প্রীতিতত্ত্বং)
যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৩ খ ॥

তদঙ্গঞ্চ } (রহস্যসাধকং ভক্তিতত্ত্বং)
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৪ গ ॥

গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১
অস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২

ক, শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং প্রথমদ্বিতীয়ৌ বিচার্য্যৌ।
খ, সংহিতায়াং তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-নবমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।
গ, সপ্তমাষ্টমদশমাধ্যায়া বিচার্য্যাঃ।"

—কৃঃ সং, ১ম সংস্করণ, ১২৮৬ সাল

২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মূল ভাগবতের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন ?

"মূল ভাগবতের অর্থ—

[প্রথম শ্লোকে পরব্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।]

(১) সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধ জীবনিচয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, অথণ্ড সচ্চিদানন্দ একমাত্র আমি ছিলাম। সৎ—সূক্ষ্ম সত্তা, অসৎ—স্থূল সত্তা ও তদুভয়ের পরতত্ত্ব বদ্ধজীব-সত্তাময় এই মায়িক জগৎ ছিল না। আমা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কিন্তু বিকল্পতঃ ভিন্ন এই মায়িক জগৎ আমার শক্তিপরিণামরূপ সত্যবিশেষ। মায়িক-সত্তা বিগত হইলে পূর্ণরূপ আমি অবশিষ্ট থাকিব।

[দ্বিতীয় শ্লোকে বিকল্প-বিচারদ্বারা উক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে।]

(২) নিত্যসত্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপ অর্থ হইতে ভিন্নরূপে যাহা প্রকাশ পায় এবং আত্মতত্ত্বে যাহার অবস্থিতি নাই, তাহাই আত্মমায়া। (অন্বয় উদাহরণ)—জলচন্দ্রের ভাস যেমত নিত্যচন্দ্র হইতে ভিন্ন, মায়িক জগৎটীও বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন হওয়ায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথক্। (ব্যতিরেক উদাহরণ)—তম, অন্ধকার বা ছায়া যেমত নিত্যবস্তুর অনুগত-তত্ত্ব, কিন্তু নিত্যবস্তু নয়, তদ্রূপ মায়িক জগৎ বৈকুণ্ঠ হইতে অভিন্ন-মূল হইয়াও বৈকুণ্ঠে অবস্থিত নয়।

[তৃতীয় শ্লোকে তদ্রহস্য জ্ঞাপিত হইতেছে।]

(৩) মহদাদি সূক্ষ্মভূতসকল যেরূপ ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সূক্ষ্মভূতরূপে স্বতন্ত্র থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বকারণরূপ আমি সমস্ত সত্তার মূল সত্য ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে অনুস্যূত থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ পৃথগ্‌রূপে পূর্ণ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করত প্রণত-জনের একান্ত প্রেমাস্পদ আছি।

[চতুর্থ শ্লোকে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধন জ্ঞাপিত হইতেছে।]

(৪) আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ পূর্ব্বদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারক্রমে সর্ব্বদেশ-কালাতীত নিত্যসত্যের অনুশীলন করিবেন।"

—কৃঃ সং, ১ম সংস্করণ, ১২৮৬ সাল

৩। শ্রীমদ্ভাগবত কি মনুষ্য-রচিত আধুনিক পুঁথি নহে ?

"শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দের প্রয়োগদ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগমশাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ

হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যস্বরূপ এই পারমহংসী সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য-সকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতা-পীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। প্রকৃত বেদান্তবাক্য ও বেদান্তভাষ্য কি?

"শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে-সমুদায়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে 'বেদান্তবাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।"

—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৫। শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ গ্রন্থ?

"The Bhagabat does not allow its followers to ask anything from God except eternal love towards Him."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

৬। কাহার চরিত্রের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়?

"When we were in the college, reading the philosophical works of the west and exchanging thoughts with the thinkers of the day, we had a real hatred towards the Bhagabat. That great work looked like a repository of wicked and stupid ideas, scarcely adapted to the nineteenth century, and we hated to hear any arguments in its favour. With us then a volume of Channing, Parker, Emerson or Newman had more weight than the whole lots of the Vaishnava works. Greedily we poured over the various commentaries of the Holy Byble and of the labours of the Tattwa Bodhini Sabha, containing extracts from the Upanishads and the Vedanta, but no work of the Vaishnavas had any favour with us. But when we advanced in age and our religious sentiment received develop-

ment, we turned out in a manner Unitarian in our belief and prayed as Jesus prayed in the Garden. Accidentally, we fill in with a work about the Great Chaitanya and on reading it with some attension in order to settle the historical position of that Mighty Genius of Nadia, we had the opportunity of gathering his explanations of Bhagabat, given to the wrangling Vedantist of the Benaras School. The accidental study ereated in us a love for all the works which we find about our Eastern Saviour. We gathered with difficulties the famous Karchas in Sanskrit, written by the disciples of Chaitanya. The explanations that we got of the Bhagabat from these sources, were of such a charming character that we secured a copy of the Bhagabat complete, and studied its texts (difficult of course to those who are not trained up in philosophical thoughts) with the assistance of the famous Commentaries of Shreedhar Swami. From such study it is that we have at least gathered the real doctrines of the Vaishnabas. Oh! what a trouble to get rid of prejudices gathered in unripe years."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethies & Its Theology.

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-প্রদত্ত ভাষণ

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জগতে যতপ্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবানও পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য-ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র-প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী। গুরু অর্থাৎ সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমস্ত জগতের গুরুতত্ত্ব। গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচার না আসিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হওয়া যায় না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা যায় না—নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—তৃণাদপি সুনীচ, অমানী মানদ হইয়া হরিকীর্ত্তন করিতে পারা যায় না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মান্য বা নমস্য—এই বিচার না আসিলে, গুরুপাদপদ্মে নমস্কার করিতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকিলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যাইতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যাইতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে তাহা ছেদন করিয়া দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথ পোষণ করে; আর দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে চায়। যাঁহারা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না করিয়া সরল হইতে চাহেন—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিবার গুরু বা ইহজগতে যাঁহাদের নিকট হইতে এই শরীর লাভ করিয়াছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু, যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু, প্রত্যেক বস্তু যাঁহার সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩ পৃষ্ঠার পর]

আমাদের মতে স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই মানসযুক্ত হইয়া থাকেন। পরিশেষে সেই কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। আর সেই কীর্ত্তন আত্মীয়ের ন্যায় শ্রোতৃ-বর্গকেও কৃতার্থ করেন।

স্মরণাঙ্গ ভক্তি হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ, কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয় জিহ্বায় স্ফূর্ত্তি বা নৃত্য করে এবং মনেও বিহার করে। কেননা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণকালে মনের সহজ সংযোগ থাকেই। অনথা বিষয় গ্রহণই অসম্ভব হইত। এজন্য কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ স্বতঃই হইয়া থাকে। পুনশ্চ কীর্ত্তনধ্বনি স্বতঃই কর্ণে প্রবেশ করে বলিয়া তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করে। কীর্ত্তনের মহিমা অধিক আর কি বলিব? সেই কীর্ত্তন নিজ সেবক শ্রোতৃবন্দকেও উপকৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। অপি চ কীর্ত্তনই চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ। কীর্ত্তনাঙ্গ ব্যতীত চঞ্চল মন অন্য উপায়ে স্থির হয় না বলিয়া স্মরণও সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না।—ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। এজন্য বিষ্ণুপুরাণে পরাশর বলিয়াছেন যে—যাঁহার পাদপদ্মে মতি দিলে নরক গমন করিতে হয় না, যাঁহার চিন্তা করিলে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছবোধ হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষের হৃদয়ে অবস্থিত হইলে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিলে যে অজামিলাদির তুল্য পাপাত্মা মুক্তিলাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এখানে কৈমুতিক ন্যায়ে স্মরণ হইতে কীর্ত্তনেরই মহিমা অধিকতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও কথিত হইয়াছে যে, —"সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগে পূজা করিয়া যে ফল লাভ হইয়া থাকে, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সেই সব ফল অনায়াসে লাভ হয়।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজাদির ফল কীর্ত্তন-ফলে অন্তর্ভূত রহিয়াছে বলায় কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মরণ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সিধ্যতি।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৩৬ ধৃত বৈষ্ণবচিন্তামণি-বাক্য)

সর্ব্বপাপবিনাশক বিষ্ণুর স্মরণ বহু প্রয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দন-মাত্রেই যে কীর্ত্তন তাহা উক্ত স্মরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বিষ্ণু-ধর্ম্মোক্ত এক চঞ্চলচিত্ত মহাপাপী ক্ষত্রবন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া আমাদের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, —যাহারা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য বা অসমর্থ তাহাদের পক্ষেও শ্রীগোবিন্দের নামকীর্ত্তন মঙ্গলপ্রদ ও ভরসার স্থল।—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতে সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলনাদিষু॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৩ অনুচ্ছেদ)

তুমি উত্থান, নিদ্রা, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও স্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা গোবিন্দ এই নাম কীর্ত্তন করিবে।

স্মরণ হইতে নাম-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

একাকীত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিধ্যতি।
সঙ্কীর্ত্তনং বিবিক্তেঽপি বহূনাং সঙ্গতোঽপি চ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৭)

নির্জ্জন ও একাকী না হইলে ধ্যান কখনও সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জনেও হইতে পারে, বহু লোকমধ্যেও হইতে পারে। বহুজন-সঙ্গে বা সর্ব্ববিঘ্নময় স্থলেও সঙ্কীর্ত্তন সিদ্ধ হয় বলিয়া ধ্যানসিদ্ধি বিঘ্নবহুলা, আর সঙ্কীর্ত্তন-সিদ্ধি সরলা।

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সঙ্কীর্ত্তনং সদা॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।৮৩)

ভগবানের ধ্যান তাঁহার পরোক্ষে অর্থাৎ অসাক্ষাতেই সঙ্গত হয়, ধ্যান সাক্ষাতে সঙ্গত হয় না, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন অপরোক্ষে (সাক্ষাতে) বা পরোক্ষে (অসাক্ষাতে) সর্ব্বদা যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে।

ভগবানের ধ্যান তাঁহার অসাক্ষাতেই যুক্তিযুক্ত হয়। তাঁহার সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু কীর্ত্তন ভগবানের সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে দুইভাবেই হইতে পারে। ইহা লোকরীতি অনুভব-প্রমাণেও জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত রাসপঞ্চাধ্যায়েও আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই গোপীগণ সঙ্কীর্ত্তন করিলেন—'গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া গান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন।' বিষ্ণুপুরাণেও

পাই—'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চন্দ্র, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও কুমুদবন সম্বন্ধীয় গান করিতে লাগিলেন। আর গোপীসকল কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণরাসের উপযোগী গান যতদূর উচ্চস্বরে করিলেন, গোপীসকল কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাহার দ্বিগুণতর উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।' ভগবানের সাক্ষাতে কীর্ত্তন যুক্তিযুক্তও হয় এবং শাস্ত্রে এইরূপ দেখাও যায়। অসাক্ষাতে কীর্ত্তন ত' সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে এবং দশমস্কন্ধে গোপিকা-গীতাদিতে ও উদ্ধবাগমন-কালাদিতেও তাহা দেখা যায়।

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬২)

হরিনামকীর্ত্তন সহজসাধ্য সর্ব্বফলপ্রদ ও সকল ইন্দ্রিয়ের উন্মাদক। ভগবন্নাম কোনপ্রকারে সেবিত হইলেই সর্ব্বসুখজনক হইয়া থাকেন। নাম এক বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজ স্বাভাবিক মধুর সুখবিশেষের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্লাবিত করিয়া থাকেন।

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্ব-পরহর্ষদঃ।
তৎ প্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নামসঙ্কীর্ত্তনং বরম্॥
(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৩)

নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রদ্ধার সহিত করাই উচিত। বাগিন্দ্রিয় জিহ্বাই শ্রীনাম-কীর্ত্তনের মুখ্য উদয়-স্থান, যেহেতু শ্রীনাম বর্ণময়। আর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনকারীর নিজের ও শ্রোতাগণের উভয়েরই সুখপ্রদ হয়—নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। স্মরণে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয়। আর শ্রীনামকীর্ত্তনে নিজের ও পরের উপকার ও আনন্দ হয়। তাই শ্রীহরির স্মরণ হইতে শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ তাহাও কীর্ত্তনাধীন, অর্থাৎ কীর্ত্তন-সহকারেই স্মরণ কর্ত্তব্য। কারণ এই কলিযুগে কীর্ত্তনেরই অধিকার বা প্রাধান্য। যেহেতু হরিনাম কীর্ত্তনই কলিযুগ ধর্ম্ম। অপি চ সকল শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকার ভক্তি অপেক্ষা কীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইজন্যই স্মরণাদি সকল ভক্ত্যঙ্গ কীর্ত্তনের অধীন। ভাগবতও বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির মঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি শীঘ্রই অনায়াসে সেই ভক্তের স্মৃতিপথে উদিত হন। শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের সহজভাবেই স্মরণ হয়। উক্ত শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তি-টীকা—

"সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনরতো ভক্তস্য নাবশ্যকঃ। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রতিশতীতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।"

বিনাযত্নেও শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ স্বতঃই হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার পক্ষে ভক্তের স্মরণ প্রযত্নের আবশ্যক নাই অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে স্মরণ-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনই স্মরণ—ইহাই সিদ্ধান্ত।

হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। আদিপুরাণেও শ্রীনামের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই আদিপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! যাহারা শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায়ও আমার নামকীর্ত্তন করেন, তাহাদিগকে আমি কখনও ভুলি না। নাম-কীর্ত্তনের মত জ্ঞান কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ব্রত কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ধ্যান কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ফল কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত ত্যাগ কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত শান্তি কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত পুণ্য কিছু নাই, নাম-কীর্ত্তনের মত গতি আর কিছু নাই। নাম-কীর্ত্তনই পরমা মুক্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা গতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা শান্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা স্থিতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা ভক্তি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা মতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা প্রীতি, নাম-কীর্ত্তনই পরমা স্মৃতি।

নামযুক্ত-জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ (আদিপুরাণ)

নাম-কীর্ত্তনকারীর ত' কথাই নাই, কীর্ত্তনকারী ভক্তকে দেখিয়া যিনি উল্লসিত ও প্রীত হন, তিনিও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন, অতএব হে অর্জ্জুন, দৃঢ়তার সহিত আমার নামসমূহ কীর্ত্তন কর। নাম-কীর্ত্তনকারীই আমার প্রিয়। তুমি নাম-কীর্ত্তন-পরায়ণ হও। এই নাম সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল সংখ্যা রাখিয়াই করিতে হইবে এরূপ নহে। উক্ত প্রমাণদ্বারা অসংখ্যাত কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

এতাবৎ আলোচিত প্রাচীন দর্শনগুলি বেদাশ্রিত না হওয়ায় এমন কি পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনও বেদানুগ বলিয়া আনুগত্য প্রদর্শন করিলেও তাহা বেদতাৎপর্য্য সম্যক্ স্পর্শ করিতে অক্ষম হওয়ায় শ্রীভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট অবতার শ্রীবেদব্যাস উত্তর-মীমাংসা রচনা করিয়া জীবকে প্রকৃত সত্যের উপদেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বেদাশ্রয়ের ছলনায় স্বকল্পিত মিথ্যা বা মায়াবাদ প্রচার করত অসুরমোহনরূপ কার্য্যদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত বচনানুসারে শ্রীশঙ্কর দেবীর প্রতি ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন।—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ-মুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা।" এতদ্দ্বারা তিনি যে নিজ প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহাও স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি স্বীয় প্রভুর আদেশও দেবীকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয়, যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" (পদ্ম পুঃ উত্তর খণ্ড ৬২।৩১)

আচার্য্য শঙ্করের 'অদ্বৈতসিদ্ধি' যে একটী নিছক ধাপ্পাবাজি, তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা নানাভাবে ইহার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, তাঁহার গুরুদেব গোবিন্দপাদ এবং তাঁহার পরমগুরুদেব গৌড়পাদ সকলেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধি উপদেশ করত নিজদিগকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 'অদ্বৈতসিদ্ধি' লাভ করিয়াছেন—ইহাই নিজ সম্প্রদায়ের মন্তব্য। পরন্তু তাঁহারা এই অদ্বৈতসিদ্ধি লাভের পরও স্বপ্নে দর্শনদান, কেহ বা সাক্ষাৎ অবতাররূপে পুনরায় লীলা করিয়া তাঁহাদের অদ্বৈত-সিদ্ধিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন নাই কি? আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে এই বিষয়টী স্পষ্ট ভাবে পাঠকগণকে নিবেদন করিয়াছি।

আচার্য্যশঙ্কর প্রচারিত বিবর্ত্তবাদও বেদের অভিমত নহে। পরন্তু ইহা গৌতম-বুদ্ধের শূন্যবাদ, বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদের আবরণে আচ্ছাদিত। ইহাকে বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বলিয়া দার্শনিকগণ অভিহিত করিয়াছেন। যদ্যপি আচার্য্য শঙ্করের এই বিবর্ত্তবাদ প্রবলভাবে প্রচারিত হওয়ায়, ভারত বুদ্ধের শূন্যবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তথাপি তাহা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না হওয়ায়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-

সম্প্রদায়াচার্য্যগণ শঙ্কর-প্রচারিত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করত বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য জগতে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদের মতবাদও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর না হওয়ায় সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বেদের সম্যক্ তাৎপর্য্য যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম এবং তাহার পরাকাষ্ঠা অধিরূঢ় মহাভাবকে স্বয়ং আচরণ ও আস্বাদন করত দার্শনিক জগতের মুকুটমণিরূপে পরম দেদীপ্যমান হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই সমগ্র ভারতে প্রবল-প্রচারিত আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বাদের হেয়তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করত বেদ-বেদান্তের ও ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহা আচরণমুখে শিক্ষাপ্রদান করত সর্ব্ববরেণ্য হইয়াছেন। তথাপি আসুরিক ভাবাপন্ন লোক আচার্য্য শঙ্করের মোহজনক যুক্তিজালে আবদ্ধ থাকিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে স্পর্শ করিতে অক্ষম হইতেছেন। ইহাই শ্রীশঙ্করের পরম কৃতিত্ব ও বলিষ্ঠ ভগবৎসেবা। তাঁহার মোহাত্মক যুক্তিজালে আবদ্ধ থাকিয়া উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে তথাকথিত দার্শনিকাভিমানী ব্যক্তিগণ বেদতাৎপর্য্য বলিয়া বিভ্রান্ত হইতেছেন। তাঁহারা উপনিষদ্ বাক্যকেও অগ্রাহ্য করত পরম দুর্ভাগ্য ও তুষাবঘাতনরূপ ক্লেশ বরণ করিতেছেন।—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।

—মাঠরশ্রুতির এই বাক্যও তাঁহাদের মঙ্গল বিধানে পরাভূত।

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাজীর এই উক্তিকেও তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এমন কি পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত শ্রীগীতার নিম্নোক্ত বাণীতেও তাঁহাদের আদর নাই।—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীঃ ১২।৫)

—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

প্রাচীনকালেও অদ্বৈতবাদী বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদী বা বিবর্ত্তবাদী ছিলেন না। তাঁহাদের মতবাদ অকিঞ্চিৎকর ব্রহ্মানন্দ হইলেও তাহা বিবর্ত্তবাদের ন্যায় অবাস্তব নহে। তাহা গোষ্পদ-খোদিত ক্ষুদ্র গর্ত্তস্থজল ও সমুদ্রজলরাশির তুলনামূলক পার্থক্যযুক্ত। তাহাতে আনন্দময় ব্রহ্মের সম্পূর্ণ সার্থকতা প্রকাশ পায় নাই। আচার্য্যশঙ্কর এই 'আনন্দময় ব্রহ্ম' সূত্রটীকেও তাঁহার মতের অনুপযোগী বিচার করত ইহাকে সূত্রকারের ভ্রমাত্মক রচনা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করাচার্য্য সামগ্রিক বেদবাক্যের সামঞ্জস্য করিতে সক্ষম হন নাই। স্বমতের পরিপোষক কতিপয় বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া স্বমতবিরোধী বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে আলোচনা করেন নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সমগ্র বেদের বাক্যগুলির একতাৎপর্য্যপরতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পরিব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের সারকথা—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

কেবল ব্রহ্মকে স্বীকার এবং জীব, জগৎ ও মায়াকে অস্বীকার করিতে গিয়া তিনি বেদের অন্যান্য বাক্যগুলিকে সামঞ্জস্য করিতে অক্ষম হইয়াছেন। ব্রহ্মের কেবল সত্যতা বলিতে গিয়া সাম্বন্ধিক মিথ্যা জীব, জগৎ ও মায়াকে তিনি নিজেই পরিহার করিতে সক্ষম হন নাই। জীবাদি উক্তি সাম্বন্ধিকী হইলে তাঁহার মতের নির্ব্বিশেষতা সংরক্ষিত হয় নাই। যাহা আদৌ অস্তিত্বহীন তাহাকে উল্লেখ করা কখনই সম্ভব হয় না। নাস্তি শব্দের মূলই অস্তি। যাহা বর্ত্তমান তাহাকেই নিষেধ করা সম্ভব। সুতরাং জীব, জগৎ ও মায়া ব্রহ্মে সাম্বন্ধিকভাবে বর্ত্তমান বলিয়াই তাহাদিগকে 'নাস্তি' বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় জীবাদির বিবর্ত্ত অযৌক্তিক। আকাশকুসুমের বাস্তবতা মিথ্যা হইলেও আকাশ এবং কুসুম অবাস্তব নহে বলিয়া আকাশকুসুমের ধারণা অবাস্তব নহে।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার যুক্তিজালপ্রভাদ্বারা আসুরিক ভাবাপন্ন মনুষ্যকে মোহিত করিলেও সত্যাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ তাঁহার মতবাদের অসারতা ও অনুপাদেয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। পুরীধামে মায়াবাদাচার্য্য শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উপলক্ষ্য করত শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই,—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই, মহা-পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রয়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ (হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
'আপাদন', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহিক জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥
অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)
'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি 'লক্ষণাতে' মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৬১-৬৩)
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥ (ঐ)

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস॥
'মায়াধীশ'-'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বরসহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে॥
ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

'পরিণামবাদ' ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি, সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥
'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥
এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজমত যে স্থাপিল ॥
ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয়।
প্রেম—'প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয় ॥
আর যে কিছু কহে সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে করেন লক্ষণা ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৩-১৭৯)

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে গুণী বলিতে নারাজ, কিন্তু তাহাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে 'ব্রহ্ম নির্গুণ'—তাঁহার এই নিজ বাক্যের বিরোধিতা হয় না কি? এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিলেও নির্গুণতার জ্ঞাতাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; নতুবা 'গুণ' শব্দোচ্চারণের সার্থকতা হয় না। এতদ্দ্বারা তাঁহার কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইতে বাধ্য। আরও বিচার্য্য—অনুভবকর্ত্তার বর্ত্তমানতা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মকে আনন্দ না বলিয়া বিষ্ঠা বলিলে কি ক্ষতি বা অপরাধ সাধিত হইবে? বিষ্ঠার দৌর্গন্ধের অনুভবকর্ত্তা যখন কেহ নাই, তখন আপত্তিকর কেন হইবে?

উল্লিখিত বিচারগুলিদ্বারা আচার্য্য শঙ্করের দর্শনের মোটামুটি আলোচনা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ক্রিবিক্রম মহারাজ

সাধুর মহান্ গুণ শুন ভক্তজন

জয় জয় সাধুগণ গোবিন্দ-প্রিয়তম।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
চিন্তনে সাধনে সবে সর্ব্বসিদ্ধ হন।
দীন-হীনজনে যাঁ'রা করেন তারণ॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' মর্ত্ত্যে আগমন।
মঙ্গল-কল্যাণ-জ্ঞান করে বিতরণ॥
পতিত অধমজনের পরশ-রতন।
দরশনে পরশনে সে পাপ-বিমোচন॥
শ্রীগঙ্গা হইতে যাঁ'রা অধিক পাবন।
বর্ণেন সকল শাস্ত্র সদা সর্ব্বক্ষণ॥
সাধু-গৌর-লীলামৃত করে বিতরণ।
বদ্ধ-মুক্ত সর্ব্বজন করেন গ্রহণ॥
মায়াবন্ধ হতে জীবে করেন মোচন।
একমাত্র সাধু-গুরু ভুবন-পাবন॥
যাঁদের করুণা বিনা (কোন) কার্য্য সিদ্ধ নয়।
আশ্রয় করিলে যায় জন্ম মৃত্যু ভয়॥
সর্ব্বগুণে গুণী সবে ভক্তিতে ভূষণ।
হৃদয়ে গোবিন্দ ধরি করেন তারণ॥
নিষ্কাম নিষ্কলঙ্ক সেই সাধু মহাজন।
কৃষ্ণনাম-গুণগানে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
মায়ার মোচন-বিদ্যা করে বিতরণ।
জ্ঞানচক্ষু, জ্ঞানশিক্ষা দেয় জ্ঞানাঞ্জন॥
যে বিদ্যা লভিলে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।
মায়াচক্ষু মোহ-বিদ্যা না থাকে তখন॥
নিষ্কপট হ'লে করে গিরি-উল্লঙ্ঘন।
মূক যে বাচাল-শক্তি ধরিতে সক্ষম॥

সর্ব্ববর্ণ সর্ব্বপদে হরি-দরশন।
করান সকল ভক্তে সংশয়-ছেদন॥
কর্ম্মক্ষয়, মুক্তিপদ ধরেন তখন।
সর্ব্বঋণ হ'তে মোক্ষ,—গোবিন্দ-ভজন॥
ভুক্তি-মুক্তি-যোগসিদ্ধি কামনা-মোচন।
নির্ম্মল হৃদয়ে পায় ভক্তির আসন॥
অনর্থ-অপরাধ যে বিরূপ গঠন।
সর্ব্বদোষ শোধি' করে ভক্তির স্থাপন॥
ছল-ভক্তি ছল-চিন্তা করান বর্জ্জন।
অবরোহ শ্রৌতধারায় হৃদয়ে সাধন॥
আরোহ যে নিজ-চেষ্টা সব অকারণ।
কোটিজন্ম সাধনে না মিলে ভক্তিধন॥
অতএব সাধু-শিক্ষা যে করে গ্রহণ।
বিষ্ণু-পদ লভিতে সে হয়েন সক্ষম॥
অসত্তৃষ্ণা-ভুক্তি-মুক্তি পিশাচী-তাড়ন।
সাধু-দত্ত নাম-মন্ত্রে হয় সে মোচন॥
মায়া-আকর্ষণ চিত্তে না হয় ক্ষোভন।
কৃষ্ণপদে স্থিত চিত্ত সদা পরশন॥
গুরু-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সে করেন ভজন।
অভিধেয়-প্রয়োজন লভেন তখন॥
সাধু-ভক্তে কৃষ্ণ করে জীব-উদ্ধারণ।
গুরু-আবেদনে হরি করেন গ্রহণ॥
সর্ব্বশুভোদয় প্রভু সন্তোষ-কারণ।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে করেন বরণ॥
সচেতন জাগ্রত যে কৃষ্ণ-আরাধন।
বিধিমার্গ রাগমার্গ যেমন সাধন॥
ভক্তিপূত হৃদয়ে সে স্বরূপে সেবন।
ভজয় অভয়পদ গৌরাঙ্গ-চরণ॥
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সিদ্ধ-বিদ্যা চিন্ময় স্ফুরণ।
পুরাণ শাশ্বত রূপ করেন দর্শন॥

ভক্তসঙ্গে নিত্যসেবা চিল্লীলায় মন।
লীলামৃত লীলারস করে আস্বাদন॥
দেবীধামে গুণাবৃত যত জীবগণ।
অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখে করয়ে ভ্রমণ॥
অনাদিকালেতে বদ্ধ মায়াতে যখন।
অবতরি কৃষ্ণ জীবে করেন মোচন॥
তত্ত্ব ধরিয়া শিক্ষা সে করান গ্রহণ।
ভক্ত হ'তে জ্ঞান লভি' করেন সাধন॥
লীলাশক্তি হ'তে ফিরে সদা সাধুগণ।
কৃষ্ণসুখ-সাধনে যান স্থানাস্থান॥
বাল্য-পৌগণ্ড-লীলা করিতে যবে মন।
বিষ্ণুদ্বারা কৃষ্ণ করে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥
চিৎশক্তি সেই লীলা করেন গঠন।
জড়াশক্তি প্রসব-শক্তি পাইল তেমন॥
চিৎ অনুকরণ বিশ্বে হয় প্রকাশন।
গোলোকের গোকুল মর্ত্ত্য লীলার কারণ॥
পিতা-মাতা-দাস-সখা প্রেয়সীর গণ।
যোগমায়াদ্বারে কৃষ্ণ করে প্রকটন॥
সর্ব্বকাল সর্ব্ববিশ্ব ক্রীড়ার কারণ।
কৃষ্ণ, জীব-শক্তি দিয়া করে সচেতন॥
অণুশক্তি জীবগণ মায়াতে বিভ্রম।
পরমাত্মা জীবশক্তি করেন ভ্রমণ॥
অন্তরঙ্গা-শক্তিসঙ্গে স্বরূপে রমণ।
বহিরঙ্গা-শক্তি হয় নিমিত্ত-কারণ।
নিত্য চিন্তামণি কৃষ্ণ লীলাময় রূপ।
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মূর্ত্তি চিদানন্দ-ভূপ॥
প্রাভব, বৈভব যিনি বিলাস-স্বরূপ।
লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানরূপ॥

সর্ব্ব-অবতার মূর্ত্তি বিশ্বরূপ হন।
ইচ্ছাময় ইচ্ছাশক্ত্যে সর্ব্বরূপবান্॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ যত স্বরূপগণ।
যৈছে নাচায় তৈছে নাচে, সব দাসজন॥
ভক্তগণ ভক্তিনেত্রে করে বিলোকন।
মায়ারূপ ছানি-নেত্রে না হয় দর্শন॥
গুরু-পাশে দিব্যচক্ষু করিয়া গ্রহণ।
স্বস্বরূপ পরস্বরূপ দেখয়ে তখন॥
সাধু-পথ, সাধু-চিন্তা ধরিবে যে-জন।
দেহাত্ম-ভ্রমবুদ্ধি সে না রয় তখন॥
ব্যবধান, আবরণ, উপাধি মোচন।
স্বরূপেতে স্থিত হয়ে করেন ভজন॥
সাধুসঙ্গে নাম-যজ্ঞ করেন যাজন।
অনায়াসে পায় সেই গৌর-প্রেমধন॥
এইত সাধনশ্রেষ্ঠ যে বুঝে সে-জন।
শ্রেয়-সুখ লভিতে হয়েন সক্ষম॥
সাধুর মহান্‌গুণ করিয়া শ্রবণ।
মোহপাশ হ'তে মুক্ত হয় সর্ব্বজন॥
নাম-রূপ-গুণ-লীলা-আশ্রয়ে ভজন।
সাধু-গুরু-কৃপায় সিদ্ধ হয় সর্ব্বক্ষণ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

মন

মনকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে কত কথাই যে আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কোন সীমা নাই। 'পাগল মন', 'দুষ্ট মন', 'দুরন্ত মন', 'ক্যাটল মন', 'দুর্জ্জয় মন', 'চঞ্চল মন', 'দুটি মন' প্রভৃতি কথা ত' আজকাল প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের নামই বিষয় এবং ইহাদের ভোক্তাভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মন। সেই মন সর্ব্বদাই বাদশা হইতে চায় অর্থাৎ অসম্ভব আশা করে। "মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।" বিধাতা কপালে ধানসুদ্ধ খই লিখিয়াছেন, মনে চিড়ে দই খাইবার লোভ করিয়া লাভ কি? "মনে মনে লঙ্কা ভাগ অর্থাৎ **counting the chickens before they are hatched**" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও করিয়া থাকেন না। মনে সুখ না থাকিলে ধন-জনের দ্বারা কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না। ধন-জন কখনও মনের সুখের কারণ হইতে পারে না। কুটিল ব্যক্তির মন জিলিপির পাকের মত হইয়া থাকে। কুটিল অর্থাৎ দুর্জ্জন ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে বোধ হয় বিধাতাও সমর্থ নহেন। তাই প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—"মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ।"

একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ কলার মধ্যে মন প্রধান, এই মনই পৃথক্ পৃথক্ নামের সহিত দেব-তির্য্যগাদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। দেহ-ধারণ-জন্যই তাহার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে। মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করে এবং সুখ, দুঃখ, মোহ ও পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনই জীবের সংসার বন্ধন ও মুক্তির কারণ বলিয়া সকল শাস্ত্রে নির্ণীত। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৫।১১।৭) "তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি, গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য" শ্লোকে শ্রীভরত মহারাজ বলিয়াছেন,—"পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ তথা বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" রাগ ও দ্বেষ তথা প্রণয় ও বিরোধ—সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। মন দুর্জ্জয় অর্থাৎ "দুর্জ্জয়ানামাহং মনঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)। দুর্জ্জয় মনই জীবের শত্রু ও মিত্র। এই প্রসঙ্গে গীতাতে (৬।৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"বিষয়াবিষ্ট মনই শত্রু এবং কৃষ্ণ-

চিন্তারত মনই মিত্র। সংসারে জীবের শত্রু-মিত্র না থাকিলেও মনই অপরকে শত্রু বা মিত্র প্রতিপন্ন করাইয়া বদ্ধজীবকে অপরের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করায়।" অতএব মনের ন্যায় মহাবলবান্ শত্রু দ্বিতীয় নাই।

জীব অর্থে আত্মা, কখনও মন নহে। জীব—চেতন, মন—চেতনাভার অর্থাৎ চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন। মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল অর্থাৎ বহির্জগতের মূল বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত ; নিত্যবস্তু ভগবানের সন্ধান রাখিতে বা দিতে পারে না। উপাধিযুক্ত মন রোগ, শোক, মোহ, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলে সংযুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতা উৎপাদনপূর্ব্বক জীবকে সংসারে ভ্রমণ করাইয়া থাকে। এককথায় উপাধিযুক্ত মনই জীবের সংসার তাপের মূল। যাবৎ জীবের মন সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণের অধীন থাকে, তাবৎ তাহার মন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে গিয়া নানাপ্রকার দুঃখের আবাহন করিয়া থাকে। জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা তাহার সংসার-ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে, আবার ভোগে অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু হয়। দীপাগ্নি যখন ঘৃতবর্ত্তি দগ্ধ করে, তখন কৃষ্ণবর্ণ শিখা ধারণ করে ; কিন্তু অন্য সময় স্ব-স্বরূপ শুভ্রদীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। মনও তদ্রূপ গুণকর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া নানাবৃত্তি আশ্রয় করে, অন্যথা স্ব-স্বভাবকেই অবলম্বন করিয়া থাকে।

মন নিগ্রহের আবশ্যকতা

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং তাহার গতি সর্ব্বদাই বিষয়োন্মুখিনী। মনের নিগ্রহ নিতান্তই দুরূহ। এই প্রসঙ্গে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ' শ্লোকে (গীতা ৬।৩৪) বলিয়াছেন,—"হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চলই, বুদ্ধির মথনকারী বলবান্ ও দৃঢ়, তাহার নিগ্রহ বায়ুর ন্যায় অতি দুষ্কর বোধ হইতেছে।" চঞ্চল মনের গতিকে যেরূপ উপেক্ষা করিতে নাই, তদ্রূপ মনকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৫।৬।২) "সত্যমুক্তং কিন্বিহ বা একে ন মনসোহদ্ধা বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে" শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"হে রাজন্, আপনি যথাযথই বলিয়াছেন। ধূর্ত্ত ব্যাধ যেমন মৃগসকলকে ধরিয়াও (পাছে চলিয়া যায় এই ভয়ে) তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সেইরূপ ইহলোকে মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।" শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকার মধ্যে লিখিয়াছেন,—"ধূর্ত্ত যেরূপ সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়া লুণ্ঠিত বিশ্বাসকারীকেই হত্যা করে, সেইরূপ মনও নিশ্চিত কাম-ক্রোধাদিদ্বারা

অনভিভবরূপ-নিজশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া স্বনিরোধে শিথিল প্রযত্ন সাধককে একদিনেই আকস্মিক কামাদিদ্বারা অধঃপতিত করায়।" মনকে দমন না করিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। তাই ভাগবতের (ভাঃ ৫।১১।১৭) "ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্য-মুপেক্ষয়াধ্যেবিতমপ্রমত্তঃ" শ্লোকে ভরত মহারাজ রাজা রহূগণকে বলিয়াছেন,—"এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল, ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে। অতএব হে রাজন্, অতি সাবধানে এই ভীষণ শত্রুকে বিনাশ করুন।"

ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনকে জয় করিতে পারিলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। ভাগবতে (ভাঃ ১১।২৩।৪৭) ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বচন হইতে পাওয়া যায়, —

মনো বশেহন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥

"দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না। যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও বলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর। অতএব এই মনকে যিনি বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজয়ী হন।" উপরোক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, "প্রাকৃত মন সর্ব্বদাই ভোগপরবশ, কখনও কখনও বা জড়ত্যাগ পরবশ। জড়ভোগ ও জড়ত্যাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মনের অধীন ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে স্তব্ধ করিতে হয়। মন বশীভূত হইলে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। যোগিগণও অনেক সময় মনকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হয়। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান মনকে বিচলিত করে। বহির্বস্তুর ধারণা মনের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। বাহ্যজগতে অন্যমনস্ক হইলে বহির্বস্তুসমূহ মনকে অবস্থান্তর লাভ করাইতে অর্থাৎ মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাইতে পারে না। যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন তিনি ইন্দ্রিয়গণকেও বশ করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিই মনের পরিচালিকা।"

যোগ-ধ্যানাদিদ্বারা চঞ্চল মন বশীভূত হয় না

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যানাদি পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে—অধিকতর চাঞ্চল্যসাগরে পতিত করে। শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥ (ভাঃ ১০।৫১.৬০)

"হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও

বাসনাশূন্য না হইয়া পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।" কতকগুলি লোক ধ্যানাদি কৃত্রিম সাধনের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের চেষ্টা 'বকের মস্তকে ঘি ঢালিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ধরিবার' ন্যায় নিরর্থক ও বাতুলতা মাত্র। বকের মস্তকে ঘি ঢালিতে গেলে বক যেরূপ বসিয়া থাকিবে না, উড়িয়া পলাইবে; তদ্রূপ ধ্যানাদি কৃত্রিম সাধনের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অধিক চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইবে। চঞ্চল মন যদি ধ্যানই করিতে পারিত, তবে আর তাহাকে বশীভূত করিবার প্রয়োজন কোথায়? অস্থির চিত্তে কখন ধ্যান হয় না। আর অস্থির মন যদি ধ্যান করিতে নাই পারে, তবে তাহাদ্বারা ধ্যানের চেষ্টা করাইবার প্রয়াসও বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যান হইতে পারে না। এইজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হইয়াছে, হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান।

ভগবদ্ভক্তিই দুর্জ্জয় মনের বশীকারক

মন অতিশয় চপল ও বলিষ্ঠ, তাহাকে বিবেকের দ্বারা নিগ্রহ বা বশীভূত করা অসম্ভব। সুদৃঢ় সূঁচের দ্বারা লৌহকে যেমন ছেদ বা বিদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধির দ্বারাও মনকে বশীভূত করা সম্ভবপর নহে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির, কখনও কখনও বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায়—ইহা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসত্যং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্॥ (ভাঃ ৩।২৭।৫)

"অতএব চিত্ত বিষয়পাশে ধাবিত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা,—"ভক্তিশ্চ যোগশ্চ তয়োর্দ্বান্দ্বৈক্যং তেন তীব্রেণ বলিষ্ঠেন।" বলবান্ রোগও যেমন সদ্বৈদ্য-প্রযুক্ত ঔষধ প্রকারানুসারে সুপথ্যের সহিত পুনঃ পুনঃ সেবনের দ্বারা দীর্ঘকালে উপশম লাভ করে, সেইরূপ দুর্নিগ্রহ মনও বৈরাগ্যের দ্বারা বশীভূত করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত সারার্থবর্ষিণী টীকার মর্ম্মানুবাদে পাওয়া যায়,—"বলবান্ রোগও যেরূপ সদ্বৈদ্য-প্রযুক্তকরণদ্বারা সতত অভ্যাসযোগে তৎপ্রশমক ঔষধ সেবায় বিলম্বে নিরাময় হয়, তদ্রূপ দুর্নিগ্রহ মনও সদ্গুরূপদিষ্ট পরমেশ্বর ধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলনে অভ্যাস ও বিষয়ে অনাসক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায়।"

'বৈরাগ্য' অর্থে ইতর তৃষ্ণাক্ষয়, বিষয়ে অনাসক্তি। একদিকে দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্ত

মনোহর সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে দূরে রাখিতে হইবে, উহার আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে। অপরদিকে মন সতত ভগবানে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, তাঁহারই জপ, তাঁহারই ধারণা, তাঁহারই কীর্ত্তন করিতে হইবে, এই দুইটী যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য। আত্মার হরিভজন-বিচার ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহা মনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করায়। মনের গতিকে নিত্যবস্তুর সেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের মঙ্গল হয়। মনকে বিষয় হইতে সংযত করিবার চেষ্টা করিলে সে প্রথমে বেশী চঞ্চল হইবে, কিন্তু নিজ মঙ্গলার্থী জীব, তাহাতে হতাশ না হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভজনের অনুকূল যে পরিমাণে স্বনির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণে বিষয় যুক্তবৈরাগ্যের সহিত স্বীকার করিয়া অন্তরে ভগবন্নিষ্ঠ হইবার জন্য নিরলসভাবে প্রযত্ন করিয়া থাকেন।

অনেকে চঞ্চল মনকে দমন করিবার পরই কৃষ্ণভজন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের বিচারে, 'মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশে' কোন ফললাভ নাই। তাঁহাদের বিচারধারা 'ব্যাঘ্র আসিলে পরে ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিব' এই নীতির সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং ধ্বংসকারী। পূর্ব্ব হইতেই ডাল ভাঙ্গিয়া না রাখিলে, ব্যাঘ্র আসিলে ডাল ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই ব্যাঘ্র যেরূপ ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তদ্রূপ প্রথমে হরিভজন না করিয়া কেবলমাত্র চঞ্চল মন দমনের চেষ্টায় রত থাকিলে অচিরেই জীবনের যবনিকা নামিয়া আসিবে, হরিভজন আর হইবে না। শিশুর দুই পদ অগ্রসর হইতে বার বার পদস্খলন হয়, কিন্তু চার-পাঁচ বৎসর পরে যেরূপ দ্রুতধাবনই তাহার স্বভাবে পরিণত হয় অথবা প্রথম শিক্ষার্থী 'ক' লিখিতে কলম ভাঙ্গে, 'শব্দ' উচ্চারণ করিতে গলদঘর্ম্ম হয়, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে যেরূপ দ্রুতলিখন ও দ্রুতপঠনের সে সুখ্যাতি লাভ করে; তদ্রূপ হরিভজনের প্রাথমিক অবস্থায় মন চঞ্চল হইতে থাকিলেও ক্রমশঃ হরিভজনের প্রভাবে সে আত্মানুগত হইয়া সাম্যাবস্থা লাভ করিবে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; আর প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধমন। শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্য বলিয়াছেন,—

অন্যের হৃদয় —'মন', মোর মন—'বৃন্দাবন',
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

মনকে কৃষ্ণসেবার ভূমিকারূপে জানিলেই পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির তাৎকালিকবোধের নশ্বরতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি হয়।

শ্রীহরিই বাহিরে গুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবকে স্বমন্ত্র ও স্বভক্তির উপদেশদানে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে—'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' প্রদান করেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাকর্ষণ ব্যতীত সংসারের কারণ মনোজয় অসম্ভব। সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—হরি-গুরু-বৈষ্ণবে অনন্য শরণাগতি। হরি-গুরু-বৈষ্ণবে অনন্যভক্তি ব্যতীত মনকে জয় করিবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

নৃসিংহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীধরস্বামিপাদ একজন ভাগবতধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্য। তাই তিনি ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্ননাশ ও 'অভীষ্টপূরণের' জন্য সর্ব্বপ্রথমে নৃসিংহদেবের বন্দনার দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্বরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর পতিরূপে ভজন করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেব শুদ্ধাসরস্বতীর সেবকগণের বিঘ্নবিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহের সেবাফলেই শ্রীধর 'ভক্ত্যেকরক্ষক'— শ্রীগীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পারমার্থিক ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা। শ্রীধরের নৃসিংহ-সেবাফলেই আজ জগতে শ্রীভাগবতের যথার্থ অর্থ প্রচার ও ভক্তির মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রুতিস্তবে (১০ম স্কন্ধ, ৮৭শ অধ্যায়ে) শ্রীধর কেবল নৃসিংহদেবের স্তুতি গাহিয়াছেন।

স্বয়ং গৌরহরিও জগতে নৃহরির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি দক্ষিণ পরিভ্রমণ যাত্রাকালে নৃহরির স্তব করিয়া শ্রীনামপ্রচারে বহির্গত হন—

"জিয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন॥
সর্ব্বত্র করিলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ।
তবে ত' পাষণ্ডীগণে করিল দলন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১০৩, ১০৬)

জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্রে কতদিন গেলা।

* * * *

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি॥

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম)
অহোবল নৃসিংহেরে করিল গমন।

*　　*　　*　　*

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতিস্তুতি॥

শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীনৃসিংহমন্দির-সংস্কারলীলা (মুরারিগুপ্ত-রচিত চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থোদ্ধৃত করিয়া নীলাচলে গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটস্থ নৃসিংহমন্দির মার্জ্জনলীলা (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৬৫) প্রদর্শন করিয়া নৃহরির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

"বাইশ পহাচ পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বারবার॥"
"নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্কনখালয়ে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৬ শ)

গৌরপার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীবাস একজন নৃসিংহোপাসক। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত নিবিষ্টমনে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় গৌরহরি—

"এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
'কি করিস্ শ্রীবাসিয়া!' বলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাঁহার দুয়ারে॥
"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কা'র ধ্যান।
যাঁহারে পূজিস্ তা'রে দেখ বিদ্যমান॥
জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চাহে চারিভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হইল শ্রীনিবাস; কিছুই না স্ফুরে॥

ডাকিয়া বলয়ে প্রভু,— "আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ ??
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব-পরিবারে॥
* * * *
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২য়)

শ্রীবাস ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য, নৃসিংহোপাসক। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরহরির পার্ষদগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান্ নৃসিংহোপাসক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইজন্য প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নাম শ্রীনৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দের নৃসিংহনিষ্ঠার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও নৃসিংহ-নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি সর্ব্বদা শ্রীনৃসিংহ নামোচ্চারণপূর্ব্বক যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বাল্যকালে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুর তাঁহার অতি বাল্যবয়সে শ্রীনৃসিংহদেব সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভক্তগণকেও স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক নৃসিংহনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা নৃসিংহ-নিষ্ঠার অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছি। ভগবদিচ্ছা হইলে কোনদিন আমরা ঐ সকল কথা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব। শ্রীল ঠাকুর যখন দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন, তখন শ্রীগৌরহরিপঠিত এই নৃসিংহ-স্তবটী উচ্চারণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছিলেন।

"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর—

"আপনে দক্ষিণ দেশে করিল ভ্রমণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল ভক্তি নাম প্রচারণ॥"

এই বাক্যানুসারে স্বয়ং দক্ষিণদেশে প্রচারকের কার্য্য করিবার সময়ে নৃসিংহ-স্তব, বন্দনা প্রভৃতিদ্বারা প্রচারকগণের অধিদেবতা শ্রীনৃসিংহনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এখনও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীনৃসিংহ-

চতুর্দ্দশী দিবস শ্রীনৃসিংহারাধনা এবং প্রচারকগণ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেব সদ্ধর্ম্মসেতু। উপর্য্যুক্তক্রমে তাঁহার বিভুত্ব ও ব্যাপকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বকারকের অধিষ্ঠাতা। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতীয় ১০ম স্কন্ধের শ্লোকে ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৪)

শ্রীনৃসিংহমন্ত্রই 'মন্ত্ররাজ' নামে কথিত। নৃসিংহতাপনী-উপনিষৎ, শ্রীনৃসিংহ-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নৃসিংহদেবের মহিমা গীত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বি-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-প্রণীত নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চনবিধি বিস্তারিত-ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীনৃসিংহদেব ভয় অর্থাৎ জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারকগণের প্রধান সহায় স্বরূপ। তিনি পাষণ্ড-দলনকারী ও শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপাকটাক্ষবর্ষণকারী। যাঁহারা হিরণ্যকশিপুসদৃশ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতির মদে অবলিপ্ত হইয়া শুদ্ধভক্তের বিদ্রোহাচরণ করেন, যাঁহারা বৈষ্ণবকে প্রাকৃতজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে জাতিবুদ্ধি করিয়া থাকেন, যাঁহারা শোণিত, শুক্র প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু হইতে বৈষ্ণবের প্রপঞ্চে প্রাকট্য কল্পনা করেন, যাঁহারা গৃহব্রত, ব্যবসায়ী, লৌকিক ও কৌলিক গুরুক্রবগণের অসৎকার্য্য সমর্থন করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম লইয়া যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণপর কার্য্যে নিযুক্ত হন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার মায়াদ্বারা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার বিঘ্ন-বিনাশজন্য নৃসিংহনামোচ্চারণ করেন, শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন যমুনাস্মরণে নীলাচলে সমুদ্রের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, তখন কোন এক ধীবর শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহার জালমধ্যে পাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির সংস্পর্শে ঐ ধীবরে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকিলে ঐ ধীবর নিজকে ভূতগ্রস্থ মনে করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট এরূপ বলিয়াছিলেন,—

"একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূতপ্রেত আমার না লাগে নৃসিংহস্মরণে॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাঁহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৮শ)

যাঁহারা নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রাকৃত বিঘ্নবিনাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের নৃসিংহ-

পূজা পঞ্চোপাসনার অন্যতম দেবতা বিঘ্নবিনাশন গণেশের পূজার তুল্য হইয়া পড়ে। উহার দ্বারা ভুক্তি প্রভৃতি অবান্তর তুচ্ছফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা হরিসেবাতাৎপর্য্যে নৃসিংহনাম গ্রহণ করেন. তাঁহাদের শ্রীগৌরহরিতে উত্তরোত্তর মতি বর্দ্ধিত হয়। আমরা ভক্তপ্রবর শ্রীধরস্বামিপাদের অনুগ হইয়া বলিতেছি,—হে নরহরে! যাহারা নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা তোমার ভজনা না করে, তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ ভস্ত্রার তুল্য, তাহারা জীবন্মৃত।

"নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥"
(ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।১৭)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর]

হয় সোনার বাটী, নয় পাথরবাটী। সোনার পাথরবাটী ত' হতে পারে না। শশবিষাণ—খরগোসের কখনও কি সিং হয়?—খরগোসের কখনও সিং হয় না, অথচ ওখানে খরগোসের সিং-এর কথাও বলছেন। এটা একটা কষ্ট কল্পনা। আবার কোন জায়গায় বলা হয় আকাশকুসুম। এটাও একটা অবাস্তব কথা। অতএব অক্ষয় স্বর্গসুখ হওয়ার কখনও উপায় নাই। এটা ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল, পরিণামশীল, পরিণামী। একথা বুঝানো হয়েছে।

তাহলে কিভাবে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করব? আমরা যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করছি এটা অক্ষয় স্বর্গসুখের জন্য নিশ্চয় করছি না। আমাদের সেখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নাই। কেন?—আমরা জেনে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি যে স্বর্গে গেলে বেশীদিন থাকা যায় না। একটা সময় আছে, যতটুকু জমার ঘর নিয়ে যাচ্ছি আইন অনুসারে ওখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর আবার চলে আসতে হবে।

গুরুদেব এক জায়গায় স্বর্গসুখটা কিরকম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—"কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টাস্মৃতিভ্যাম্।" (বেদান্ত সূত্র) মানুষ যে কর্ম্ম করে সে কর্ম্মের ফলভোগ দুরকম। একটা হল নরকভোগ, আর একটা হল স্বর্গভোগ। স্বর্গে যারা যাচ্ছেন তারা মৌরসী পাট্টা নিয়ে চিরদিন একেবারে **Permanent**

settlement পাবেন, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে গেলে কর্ম্মের শেষ আছে কর্ম্ম শেষ হলে তার এ সংসারে চলে আসতে হবে। কর্ম্মফল, কর্ম্মের ফল যখন ক্ষয়িষ্ণু হয়, তখন তার ভিতরে একটা দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, অনুশোচনা হয়। হায়! হায়! আমার সময়টা চলে গেল, ফুরিয়ে গেল। এই ভাব থেকে তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাগতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

পুণ্যক্ষয় হলে তাকে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আবার কর্ম্ম, কর্ম্মফল ; আবার পাপ-পুণ্য এই অবস্থা। সেইজন্য বলছেন, ঐ কর্ম্ম করলে হবে না। যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে যে আমরা স্বর্গে যাব, তাহলে খুব ভাল ফল হবে না। এই মর্ত্ত্যে, পৃথিবীতে, ভুলোকে আছি আমরা। এর উপরের **stage** হল ভুবলোক। ভুবলোককে পিতৃলোক বলে বর্ণনা করেছেন। তারপরে **third dimension**-এ হল স্বর্গলোক। ভুলোক এবং স্বর্গলোকের মাঝে ভুবলোক। আবার এর মাঝামাঝি কতকগুলো লোক আছে—গন্ধর্ব্বলোক, বিদ্যাধর প্রভৃতি। স্বর্গে যাওয়ার জন্য যদি কারও খুব আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে যেতে পারেন তিনি, কিন্তু **temporary** ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—**permanent settlement** এর কোন ব্যবস্থা নাই সেখানে। এরপরে আরও চারটে লোক—মহ, জন, তপঃ ও সত্য লোকেরও একই অবস্থা। সেটাও ত' ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। তাহলে কি করব ?

পুণ্যার্থী, পুণ্যকামী যাঁরা, তাঁরা স্বর্গে যাচ্ছেন। মহলোকে কারা যান ?—যাঁরা গুরুগৃহে থেকে বেদ আলোচনা করেন এবং পুনরায় গৃহে ফিরে যান, তাঁরা মহলোকে যান। ব্রহ্মচারীর মধ্যে ভাগ আছে—উপকুর্ব্বাণ ও বৃহদ্ব্রতী। এর মধ্যে যাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাঁরা গুরুগৃহ ত্যাগ করে কখনও বাড়ীতে যান না বা বিবাহাদি করেন না, সংসারাদি করেন না, তাঁদের ক্ষেত্র হল পরের **stage**—জনলোক। তপলোকে কারা যান ?—তপলোকে যান বাণপ্রস্থীরা। সত্যলোকে যান যাঁরা যোগী তাঁরা। কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই সাতটা লোকই ধ্বংস হয়। যদি মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয় তাহলে ঐ লোকে যাব কেন, থাকব কেন ? এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করতে না হয়। এটাই বুদ্ধিমত্তা। অর্জ্জুনকে সেটাই শেখাতে চেয়েছেন কৃষ্ণ। অর্জ্জুন, তুমি এখানে কেন গণ্ডগোল করছ ? এ আপন, ও পর, ও আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কেন করছ ? এ সবের দরকার নাই, ছাড়। আমার যেখানে বাড়ী ছিল তোমারও ত' সেখানে বাড়ী।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য সেই নিত্যলোকে আলো দেয় না, সেখানকার যে চন্দ্র-সূর্য্য সেই চন্দ্র-সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য। গীতার মধ্যে যে শ্লোকটা বলেছেন ঠিক এই ধরণের শ্লোক উপনিষদের মধ্যে আছে,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

অগ্নির কথা আর কি বলব? 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥' সেখানকার আলোয় এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত। তাহলে অর্জ্জুন এখানে থাকাটা খুব একটা ভাল কথা নয়। ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল জগৎ, **permanent settlement** তুমি এখানে পাবে না কোনদিন। চল ফিরে যাই আমাদের নিজেদের ঘরে। এখানে ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ করে কোন লাভ নাই। ওখানে গেলে শান্তি, নিত্যশান্তি, চিরশান্তি, শাশ্বত শান্তি।

আগে আমাদের উপাস্য নির্ণয় হওয়া চাই। আমরা কাকে চাই? কোথায় যেতে চাই? কে আমাদের মূল উপাস্য তত্ত্ব? সেটা আগে স্থিরীকৃত হওয়া দরকার। তারপরে ত' আমি আরম্ভ করব সাধন-ভজন। আগে ঠিক করে নিতে হবে কোথায় যেতে চাই। কোথায় সবথেকে ভাল জায়গা। এখানে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতির কি দরকার? লাভটা কি হবে? আমাদের দাবী মানতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে। কেউ কারও দাবী মানছে না এখানে, তবে বলে লাভ কি আছে? যার কাজ সে করে নিচ্ছে, তাহলে বলে কি লাভ। আরও একটা কথা—যদি আমি কখনও কারও দাবী মেনেছি, কারও দাবী রক্ষা করেছি, তাহলে একথা বলা চলে। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখছি, আমি কারও দাবী পালন করি নাই, নিজের স্বার্থেতে সবসময় চলেছি, তাহলে আর ও শ্লোগান তুলে লাভ কি? যদি আমি কোনদিন কারও উপকার চিন্তা করেছি, ভাল চিন্তা করেছি, তাহলে এ দাবী আমার পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু তা হচ্ছে না, আমি ত' নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছি। প্রাকৃত কবি বলছেন,—"আপনারে ল'য়ে বিব্রত হ'তে আসে নাই কেহ অবনীপরে।" আমরা যেন কেউ নিজেকে নিয়ে বিব্রত না হই। আমি যদি নিজের স্বার্থ, নিজের সুবিধাটুকু দেখি, তাহলে লোক কেউ উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন বলবে না, কেউ আমাকে সমদর্শী সাধু বলবে না, সজ্জন বলবে না।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥"—এ কথাটা চিন্তা করতে হবে। এ হল সমদর্শী সাধুর লক্ষণ। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' সে দৃষ্টিভঙ্গীটা চাই। কে মহাত্মা? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কৃষ্ণ গীতায়—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

বহু বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমাতে শরণাগত হন। 'অনেকজন্ম সংসিদ্ধঃ' কথাটা ভাগবতে বলা আছে।

শত জন্ম চলে যাওয়ার পরে বিরিঞ্চতা আসছে, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব আসছে, শিবের শিবত্ব আসছে। শিবঠাকুরের উক্তি এটা। সময় যা গেছে গেছে আর সময় নষ্ট করব না, সে ভাবটা নিয়ে চলতে হবে আমাকে। এতদিন জানি নাই, করি নাই; যখন জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, তখন এটা আচরণ করব, অনুশীলন করব, এটাই হল ব্রতপালনের মূল উদ্দেশ্য।

যদি বলা হয় ব্রত পালনের উদ্দেশ্য কি?—ভগবৎ-প্রীতিকামনাই হল ব্রত-পালনের মূল উদ্দেশ্য। হে ভগবান্, তুমি সন্তুষ্ট হও, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ কর, আমি তোমার প্রীতিকামনায় এই অনুষ্ঠান করছি। সব ব্রতপালনের আগে এই মন্ত্রগুলো আছে, এই প্রতিজ্ঞাগুলো আছে। কর্ম্ম যে আমি করব সে আমার নিজের জন্য নয় বা আমার সম্পর্কিত—Blood connected মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নয়। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ', 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি-শ্রুতেঃ।' যজ্ঞ মানে ভগবান্। ভগবানের প্রীতিকামনায় আমি কর্ম্মাচরণ করব সংসারে। যদি তা উদ্দেশ্য না হয়, 'অন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ'—ভগবানের প্রীতিকামনায় যদি আমি কিছু না করি তাহলে সবটাই আমার বন্ধনের কারণ। জীবের বন্ধনদশা এইভাবে আসছে। Process, Procedure জানে না, উপায়টা জানে না, সেইজন্য এই বন্ধনদশা। উপায় জেনে কাজ করলে নিশ্চয় বন্ধনদশা হবে না। ভগবৎপ্রীতিকামনা বাদ দিয়ে যদি আমি সংসারে কর্ম্ম করি, তাহলে আমার বন্ধনদশা এসে উপস্থিত হয়। "তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥" হে অর্জ্জুন! তুমি ভগবানের প্রীতিকামনায় কর্ম্মাচরণ কর, তাহলে তোমাকে কোন বিষয়ে দায়ী—Liable হতে হবে না। একজন ভক্তের জীবন—তিনি বাস করেন God centred—ভগবৎকেন্দ্রিক যে সংসার সেই সংসারে। তিনি মায়িক সংসারে বাস করেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা কি?—আমি এখানে যা কিছু করছি সবই ভগবৎপ্রীতি কামনায় করছি, করব। আমি করছি, আমার স্ত্রী করছে, আমার ছেলে করবে, আমার মেয়ে করবে, আমার নাতি-নাতনিরা করবে—সবাই করবে—

ঠিক এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছি। একে বলে **God centred** সংসার। সেইরকম ব্যক্তির দায়িত্ব ত' সব ভগবান্ তুলে নিয়েছেন। সেইরকম ব্যক্তির দায়িত্ব তাঁকে নিজের ত' রাখতে দিচ্ছেন না, ভগবান্ নিজেই **take up** করছেন। ভগবান্ যাতে **take up** করেন সেইজন্যই ত' ব্যবস্থা। তবে একথাও ঠিক, আমি ভগবানকে সেবা করব, ভগবানকে খাটিয়ে নেব না। ভগবানের সেবার নাম করে যদি ভগবানকে খাটিয়ে নেই, তাহলে আমি কোথায় বাস্তব সেবক-সেবিকা? তা ত' নয়। এ বিচারও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে আছে। সেবা আমি করব, সেবা করে ধন্য হব, কিন্তু সেবা করতে গিয়ে যেন ভগবান্ তুমি খাট আমার জন্য, এমন কথা কতকগুলো এসে যাচ্ছে। ভগবান্ আমি তোমাকে খাটাব না, এমন চিন্তা থাকা চাই।

আমার শ্রীগুরুদেবের কাছে শুনেছি—যারা ভগবানকে পিতা-মাতা বলছেন, তারা সব ভগবানকে খাটিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। কেন?—এ জগতে বাবা-মা সবথেকে বড় চাকর-চাকরাণী। ছেলে ভাবছে, মেয়ে ভাবছে তুমি খাট, তোমরা খাট। যদি আমরা ভগবানকে বাবা-মা বলে সম্বোধন করি, তাহলে মানে হয়—হে ভগবান্, তুমি আমার জন্য খাট, আমাদের জন্য খাট। হবে না তা, ভগবানের সেবা করতে হবে। যখন **Fatherhood of Godhead, Motherhood of Godhead** নিয়ে চিন্তা করি আমরা, তখন ভুল হয় বিচারটা। তাহলে কিসে ভাল হবে?—**Sonhood of Godhead** বাৎসল্যভাব, ভগবান্ তুমি আমার ছেলে হও, আমি তোমার সেবা করব। ভগবান্ তুমি আমার সখা হও, ভগবান্ তুমি আমার সবকিছু হও। সেবার মনোভাব আছে সেখানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে **Sonhood of Godhead, Consorthood of Godhead** বুঝানো হয়েছে। ভগবানে পুত্রত্ব আরোপ, সেখানে মা যশোমতীর আনুগত্যে সেবা, আর **Consorthood of Godhead** সেখানে ব্রজবধূগণের আনুগত্যে সেবা।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা আমি ভগবানের সেবা করব, ভগবতীর সেবা করব, **Supreme Authority**র সেবা করব। কেন?—সময় নাই ত' আমার। সময় খুব কম। যদি বহু সময় থাকত তাহলে অনেক কিছু করতাম। **(ক্রমশঃ)**

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা, পিন্—৭৯৪০০১
জেলা— ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)
ফোন :—৩২৬৯১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন –

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিঃস্তধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উল্লিখিত মঠে আগামী **২১শে** শ্রাবণ (ইং ৭,৮/৯৫) সোমবার হইতে ২৪শে শ্রাবণ (ইং ১০/৮/৯৫) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও ১লা ভাদ্র (ইং ১৮।৮।৯৫) শুক্রবার **শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে** শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগর সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩২শে আষাঢ়, ১৪০২।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

৩১শে শ্রাবণ (১৭।৮।৯৫), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে – সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।

রাত্রে – শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১লা ভাদ্র (ইং ১৮।৮।৯৫), শুক্রবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

নগর সংকীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণে—১-৩০ টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাপ্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।

রাত্রি – ৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২রা ভাদ্র (ইং ১৯।৮।৯৫), শনিবার—

মঙ্গলারতি— ভোর ৪ টায়।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ৭ হৃষীকেশ, কারণোদশায়ী, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪০১, ইং ১৭/৮/৯৫ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্‌

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

কোটিকন্দর্প-সন্দর্প-বিধ্বংসন-
স্বীয়রূপামৃতাপ্লাবিতক্ষ্মাতল!
ভক্তলোকেক্ষণং সক্ষণং তর্ষয়ন্‌
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ॥ ১॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুমি ভক্তগণের নয়নানন্দ বিধানপূর্ব্বক কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প বিনাশন স্বীয় রূপামৃতে ধরাতল আপ্লাবিত করিতেছ; তোমাকে নমস্কার॥ ১॥

যস্য সৌরভ্য-সৌলভ্যভাগ্-গোপিকা-
ভাগ্যলেশায় লক্ষ্ম্যাপি তপ্তং তপঃ।
নিন্দিতেন্দীবরশ্রীক ! তস্মৈ মুহু-
র্গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ২ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার সৌরভ্যসুখভাগিনী গোপীগণের কিঞ্চিন্মাত্র ভাগ্যলাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন, হে নীলকমল-শোভা-তিরস্কারি ! তোমাকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার ॥ ২ ॥

বংশিকাকণ্ঠয়োর্যঃ স্বরস্তে সচেৎ
তাল-রাগাদিমান্ শ্রুত্যনুভ্রাজিতঃ।
কা সুধা ? ব্রহ্ম কিং ? কা নু বৈকুণ্ঠমুদ্ ?
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৩ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার বংশী বা কণ্ঠের তাল ও রাগাদিযুক্ত স্বর যদি কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে কি অমৃত, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি বৈকুণ্ঠ-সুখ এ সকলই ধিক্কৃত (বিফল) হইয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

যৎ পদস্পর্শমাধুর্য্যমজ্জৎকুচা
ধন্যতাং যান্তি গোপ্যো রমাতোঽপ্যলম্।
যদ্ যশো দুন্দুভের্ঘোষণা সর্ব্বজিদ্
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমার শ্রীচরণ-যুগলের মাধুর্য্যে স্তনার্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী হইতেও পরম কৃতার্থতালাভ করিয়াছেন এবং তোমার যশঃ দুন্দুভির ঘোষণা সকলকেও জয় করিয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যস্য ফেলালবাস্বাদনে পাত্রতাং
ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো যান্তি নৈবান্যকে।
আধরং শীধুমেতেঽপি পিবন্তি নো
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৫ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ তোমার ভোজনাবশেষের কিঞ্চিন্মাত্র কণা আস্বাদনে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তদিতর জনসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ, এবং এই ব্রহ্মাদিদেবগণও অধরসম্বন্ধি মধু পান করিতে পারেন না ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

যস্য লীলামৃতং সর্ব্বথাকর্ষকং
ব্রহ্মসৌখ্যাদপি স্বাদু সর্ব্বে জগুঃ।
তৎপ্রমাণং স্বয়ং ব্যাসসূনুঃ শুকো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ॥ ৬॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ভক্তগণ ব্রহ্মসুখ হইতেও তোমার লীলামৃত সম্পূর্ণ-রূপে চিত্তাকর্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বয়ং বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহার প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছেন, তোমাকে নমস্কার॥ ৬॥

যৎষড়ৈশ্বর্য্যমপ্যার্য্যভক্তাত্মনি
ধ্যাতমুচ্চচমৎকারমানন্দয়েৎ।
নাথ! তস্মৈ রসাম্ভোধয়ে কোটিশো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ॥ ৭॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সজ্জন-ভক্তগণের হৃদয়ে ধ্যাত হইয়া অতি অপূর্ব্ব আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে। হে প্রভো! রসসাগর স্বরূপে প্রসিদ্ধ সেই তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার॥ ৭॥

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকং
যঃ পঠেন্নিত্যমুৎকণ্ঠিতস্ত্বৎপদোঃ।
প্রেমসেবাপ্তয়ে সোঽচিরান্মাধুরী-
সিন্ধুমজ্জন্মনা বাঞ্ছিতং বিন্দতাম্॥ ৮॥

যিনি ভবদীয় চরণযুগলের প্রেমসেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া এই গোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি অবিলম্বে মাধুর্য্য-সিন্ধুতে নিমগ্নান্তঃকরণ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত প্রেমসেবাদিলাভ করিবেন॥ ৮॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠার পর]

৭। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় বৈদেশিক ও আধ্যক্ষিকগণের নিকট গুপ্ত কেন ?

"What sort of a thing is the Bhagabat, asks the European gentleman newly arrived in India. His companion tells him with a serene look, that the Bhagabat is a book, which is Oriya-bearer daily reads in the evening to a number of hearers. It contains a jargon of unintelligible and savage literature of those men who paint their noses with some sort of earth or sandal, and wear beads all over their bodies in order to secure salvation for themselves. Another of his campanions, who has travelled a little in the interior, would immediately contradict him and say that the Bhagabat is a Sanskrit work claimed by a sect of men, the Goswamis, who give Mantras, like the Popes of Italy, to the common people of Bengal, and pardon their sins on payment of gold enough to defray their social expenses. A third gentleman will repeat a third explanation. Young Bengal, chained up in English thoughts and ideas, and wholly ignorant of the Pre-Mahomedan history of his own country, will add one more explanation by saying that the Bhagabat is a book, containing an account of the life of Krishna who was an ambitious and an immoral man ! This is all that he could gather from his grandmother while yet he did not go to school. Thus the Great Bhagabat ever remains unknown to the foreigners like the elephant of the six blind who caught hold of the several parts of the body of the beast ! But Truth is eternal and is never injured but for a while by ignorance."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

৮। শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র সার্ব্বজনীন শাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ কি বলেন ?

"আমরা বলতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইলে আর্য্য-পুরুষদিগের (জীব-সাধারণেরও) কোন ক্ষতি হয় না।"　　—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৮।১২

৯। শ্রীমদ্ভাগবতকে সকলে স্বীকার করে না কেন ?

"বহুভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

১০। 'শ্রীমদ্ভাগবত' শরণাগত জীবকে কোন্ রাজ্যে লইয়া যান ? 'ভাগবতে' কাহার অধিকার এবং কাহার আশ্রয়েই বা ইঁহার তত্ত্বোপলব্ধি হইতে পারে ?

"The Bhagabat is pre-eminently the Book in India. Once enter into it, and you are transplanted, as it were, into the spiritual world where gross matter has no existence. The true follower of the Bhagabat is a spiritual man who has already cut his temporary connection with phenomenal nature and has made himself the inhabitant of that region where God eternally exists and loves. This mighty work is founded upon reflection. To the common reader it has no charms and is full of difficulty. We are, therefore, obliged to study it deeply through the assistance of such great commentators as Shreedhar Swami and the Divine Chaitanya and His contemporary followers."

—The Bhagavat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১১। 'ভাগবত' কি শিক্ষা দেন ? শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় আচার-প্রচারে ভাগবত-প্রতিপাদ্য কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

"The whole of this incomparable work teaches us, according to our Great Chaitanya the three great truths which compose the absolute religion of man. Our Nuddea Preacher calls them—Sambandha, Abhidheya and Prayojana i. e the relation between the Creater and the created, the duty of man to God and the prospects of humanity. In these three words

is summed up the whole ocean of human knowledge as far as it has been explored up to this era of human progress. These are the cardinal points of religion and the whole Bhagabat is, as we are taught by Chaitanya, an explanation both by precepts and example, of these three great points."

—The Bhagabat : Its Philosoply, Its Ethics & Its Theology.

১২। 'ভাগবত' কি বহ্বীশ্বর-পূজার কথা বলেন ?

"In all its twelve Skandhas or divisions, the Bhagabat teaches us that there is only one God without a second, who was full in Himself and is and will remain the same. Time and space which prescribe conditions to created objects are much below His Supreme Spiritual nature, which is unconditioned and absolute."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৩। ভক্তির স্বরূপ কি ? ভাগবত কয় প্রকার ?

"Those who worship God as all in all with all their heart, body and strength style Him as Bhagaban. This last principle is Bhakti. The book that prescribes the relation and worship of Bhagaban secures for itself the name of Bhagabat and the worshipper is called by the same name."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৪। ভাগবত-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমত্ব কেন ?

"The superiority of the Bhagabat consists in the uniting of all sorts of theistical worship into one excellent principle in human nature which passes by the name of Bhakti. This word has no equivalent in the English language. Piety, devotion, resignation and spiritual love unalloyed with any sort of petition except in the way of repentance compose the highest principle of Bhakti. The Bhagabat tells us to worship God in that great and invaluable principle which is infinitely superior to human knowledge and the principle of Yoga."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৫। ভাগবত চিদনুশীলনের নৈরন্তর্য্য ও ক্রমোন্নতি প্রচার করিয়াছেন কি ?

"The voluminous Bhagabat is nothing more than a full illustration of this principle of continual development and and progress of the soul from gross matter to the All-Perfect Universal Spirit who is distinguished as Personal, Eternal, Absolutely Free, All-Powerful and All-Intelligent. There is nothing gross or material in it. The whole affair is spiritual."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৬। ভাগবতোদ্দিষ্ট উপাস্য-তত্ত্বের স্বরূপ কি ? বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তম প্রয়োজনটি কি ?

"The Bhagabat has a Pesonal, All-Intelligent, Active, Absolutely Free, Holy, Good, All-Powerful, Omnipresent Just and Merciful and Supremely Spiritual Deity without a second, creating, preserving all that is in the Universe. The highest object of the Vaishnava is to serve that infinite Being for ever spiritually in the activity of Absolute Love."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৭। নিরপেক্ষ সমালোচক বাদরায়ণ ঋষির ভাগবত-সিদ্ধান্ত-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জয়গান না করিয়া পারেন কি ?

"The critic should first read deeply the pages of the Bhagabat and train his mind up to the best eclectic philosophy which the world has ever obtained, and then, we are sure, he will pour panegyrics upon the principal of the College of theology at Badrikashram which existed about 4000 years ago."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৮। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বাস্তবসত্য কখন আত্মপ্রকাশ করেন ?

"The Bhagabat teaches us that God gives us truth and He gave it to Vyasa, when we earnestly seek of it. Truth is eternal and unexhausted."

— The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১৯। ভাগবত-ধর্ম্ম কি সার্ব্বজনীন নহে ?

"See how universal is the religion of Bhagabat. It is not intended for a certain class of Hindus alone but it is a gift to man at large to whatever country born and whatever society bred."

—The Bhagabat : Its Philosophy Its Ethics & Its Theology.

২০। চেতনের স্বাধীনতা ও বিকাশ-সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন ?

"Two more principles characterise the Bhagabat, Viz, liberty and progress of the soul throughout eternity."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.,

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক। নাম-নামী অভিন্ন। সম্যগ্‌রূপে যখন কোন বস্তুর কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়া থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য—এই পঞ্চধা বস্তুটী—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরে সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভোক্তা ; তিনি ভোগ্যবস্তু নন। ভোগ্যবস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহেন। যে জিনিষ এই চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

নামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছে। তিনি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার পূর্ব্বে শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকল প্রকার সাধন-প্রণালী—ইহা যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনিই জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সাধন শিরোমণি।' 'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন' বাদ দিয়া 'মথুরাবাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয়

না। কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তাহাদ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি-সেবনের ফল ও ভাগবত শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগদান করি, তবে আমাদেরও 'সঙ্কীর্ত্তন' হইবে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্‌ বস্তু; তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষ হরিভজন করিবে, স্ত্রী করিতে পারিবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন করিবে, রুগ্নব্যক্তি করিতে পারিবে না; যাহার গায়ে খুব জোর নাই, সে হরিভজন করিতে পারিবে না; নীচকুলে জাত বলিয়া হরিভজন করিতে পারিবে না—এরূপ বিচার শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হরিজন করিবার অধিকার আছে। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না, কিন্তু যাহারা 'হরিনাম' করিয়া পাপ হজম করিব—এইরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তাহারা হরিনাম করিতে পারিবে না। নামবলে পা ৷ করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে হরিনাম হয় না।

শারদীয়া দুর্গাপূজার উৎপত্তি কোথায় ?

শরৎকালে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া জাঁকজমকের সহিত ভারতবর্ষের গ্রামে ও শহরে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী সমাজে দুর্গাপূজা করিবার এক প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়। সুসজ্জিত প্রতিমাসহ সুসজ্জিত মণ্ডপ তৈয়ারী করিবার জন্য শহরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নববস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পূজামণ্ডপ-গুলিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিনদিন ভিড় করিয়া থাকে। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা তথা আনন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে। শরৎকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা শারদীয়া দুর্গাপূজা নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় বসন্তকাল বলিয়া ইহা বিভিন্ন রাজসিক ও তামসিক পুরাণাদিতে বাসন্তীপূজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অথচ সেই বাসন্তীপূজা আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়া কাল্পনিক শারদীয়া দুর্গাপূজা তাহার স্থান সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লইয়াছে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশে

সম্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথরাজা এবং স্বজন পরিত্যক্ত সমাধি-নামক বৈশ্য মেধস ঋষির নির্দ্দেশে নদীতীরে বসন্তকালে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে দুর্গাপূজা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে। দেবীর আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং সমাধি বৈশ্য দেবীর নিকট জ্ঞান-লাভের বর লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয়া দুর্গাপূজা আমাদের নিকট অকালপূজা বা অকালবোধন নামে পরিচিত। কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিগণের ধারণা, রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের নিমিত্ত রাবণ-বধার্থে এই অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দুর্গাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎপাটনের কাল্পনিক ঘটনা তাঁহারা সত্য বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অবাস্তব ঘটনার কথা পরম প্রামাণিক-গ্রন্থ বাল্মিকী-কৃত মূল রামায়ণের মধ্যে কোথাও উল্লেখ নাই। অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত 'কালিকাপুরাণ' নামক উপপুরাণ ও শাক্ত কৃত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক দুর্গাদেবীর অকালবোধন যে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, তাহা শাস্ত্রোক্ত শ্রীরামচন্দ্র ও দুর্গাদেবী তথা মহামায়ার তত্ত্ব আলোচনা করিলে পরিস্ফুট হইবে।

দুর্গাদেবী বা মহামায়া—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ও যোগমায়ার ছায়া

শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি—নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫১-১৫২)

কৃষ্ণোন্মুখমোহিনী যোগমায়াই হইতেছে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, আর কৃষ্ণবিমুখ-মোহিনী জড়মায়াই হইতেছে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। যোগমায়া যে শ্রীহরির চিচ্ছক্তি —এই কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে (১।১২।৫৫) শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন,—'তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।' দুর্গাদেবীর বাক্য হইতে জানা যায়, একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি (মহামায়া)। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড নাশন জড়শক্তিরই কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে 'বিষ্ণুমায়া', 'মহামায়া', 'মায়া' ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে (১।৪১) 'মহামায়া

হরেশ্চৈতন্যয়া সম্মোহ্যতে জগৎ' এই বাক্যে 'শ্রীহরির শক্তি মহামায়া, তিনি জগৎ মোহিত করেন' ইহা জানা যায়। মায়া যে বিষ্ণুর শক্তি, তাহা চণ্ডীর অন্যত্রও পাওয়া যায়,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।" যে পর্য্যন্ত জীব বিষয়-মগ্ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে মহামায়ার অধীন থাকিতে বাধ্য হয়। মায়িক জগৎটি দণ্ড্যজীবের কারাগার, রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও তদ্রূপ জীবের প্রতি আপনার করুণা প্রকাশ করত জড়-জগৎরূপ কারাগার এবং জড়-মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসী মায়া কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। জীবের শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে মহামায়ার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া জীব চিচ্ছক্তির অধীন হইয়া চিৎসুখ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মেধস ঋষি বলিয়াছেন,—"মহামায়া গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বসংসার মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।" মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবগণের স্তবেও পাওয়া যায়,—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥

"হে দেবি! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমি সংসারের হেতুভূতা পরমা মায়া, তুমি সমস্ত বিশ্বকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, হে দেবি! তুমিই প্রসন্ন হইয়া মুক্তির হেতু হও।"

মহামায়া ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি যোগমায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জড়মায়া যে যোগমায়ারই ছায়া—তাহা ব্রহ্মসংহিতায় (৪৪) উল্লেখ রহিয়াছে,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"স্বরূপশক্তির অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" নারদ পঞ্চরাত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়,—

অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥

"স্বরূপশক্তি যোগমায়ার আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, তাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ, দেহে আত্মাভিমানী জীবসমূহ মুগ্ধ হইয়া আছে।"

কপটিনী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখে যাইতে লজ্জাবোধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীবমোহন-কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জাবোধ করেন। জীবসকল ঐ ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিতা মায়াদ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া 'আমি' ও 'আমার' এই বৃথা জল্পনা করে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়॥ (ভাঃ ২।৫।১৩)

"যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত হইয়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এই প্রলাপ বাক্য বলে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—"এই শ্লোকে মায়ার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ এবং সেই মায়ার দুর্জ্জয়ত্ব কথিত হওয়ায়, ভগবানেরও কি তাহা হইলে মায়া-বশ্যত্বরূপ সংসার আছে?—ইত্যাকার সন্দেহ এই শ্লোকে নিষেধ করিতেছেন। আমার ছলনা বা কপটতা ভগবান্ বেশ জানেন—এই ভাবিয়া মায়া-শক্তি যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে যেন লজ্জাবোধ করিয়াই তাঁহার প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থা হয়, অথচ সেই মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জ্ঞান-বিশিষ্ট আমরা কেবল ('আমি' 'আমার' বলিয়া) শ্লাঘা (অহঙ্কার) করিয়া থাকি।"

কামনা-বাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণই দুর্গাদেবীর আরাধক

কৃষ্ণের ছায়াশক্তি—যাহা জড় জগতের লোকের নানাবিধ কাম-প্রদাত্রীরূপে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে মোহিত করিবার জন্য প্রকাশিত, তাঁহার নাম নরলোকের রচিত ও প্রদত্ত, তাঁহার ধামও নরলোকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। তোষণী বলেন,—মায়াদেবীর দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কুমুদা প্রভৃতি নামগুলি তদুপাসকগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবানুযায়ী ভোগবাসনানুসারে কল্পিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ মায়াদেবীকে "নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি" (ভাঃ ১০।২।১১) শ্লোকে বলিয়াছেন, —"হে দেবি! পৃথিবীতে তুমি ও আমি অবতীর্ণ হইলে লোকে কেহ বা বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত হইবে, অর্থাৎ ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ শাক্ত এবং অকাম ও সর্ব্বকাম হইয়া মদুপাসকগণ 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত হইবেন। শাক্তগণ পৃথিবীতে তোমার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন নামের কল্পনা করিবেন।

সাধারণ লোক সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই জীবনের চরম লাভ বলিয়া মনে করেন। তাহারা নিজসেব্য ভগবানের পূজা না করিয়া ধনজনলাভ, শত্রুবিজয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখকর কার্য্যের সম্পাদিকা বরদাত্রী দুর্গাদেবীর পূজাদ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। ভগবদ্ভক্ত জড় উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবা তৎপর হওয়ায় ভোগীর অভিনয় করিবার অবসর পান না। লোকপতি রাজা যে-ভাবে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-ধন-রত্নৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদে অপরিমিত যত্ন, স্নেহ ও আদরের মধ্যে বাস করিয়া স্বীয় আজ্ঞাবহ বহু ভৃত্য-পরিকরাদির প্রভুত্বসূত্রে অনায়াসে প্রচুর মূল্যবান্ ভোজ্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া কালযাপন করেন, তদ্রূপ প্রকৃতির অযত্নপুষ্ট পক্ষিগণ একইভাবে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় তুচ্ছ তৃণাদিদ্বারা নীড় নির্ম্মাণপূর্ব্বক অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী পরিশ্রমসহকারে যে কোন স্থান হইতে নিজ নিজ আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিন কাটায়। সকলেরই একইভাবে কাল অতিবাহিত হইতেছে এবং সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখাদি লাভ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে। তাই ভগবদ্ভক্ত দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া জাগতিক উন্নতিকামী না হইয়া ভগবৎসেবায় কালাতিপাত করেন।

ভগবান্ রামচন্দ্র কখনও নিজদাসী দুর্গাদেবীর পূজা করিতে পারেন না

ভগবান্ মায়াধীশ বস্তু, ভগবানের বিহারভূমি বৈকুণ্ঠে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই। কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু সকলেই ভগবৎতত্ত্ব। সূর্য্যসদৃশ ভগবানের যেখানে অধিষ্ঠান, সেইখানে মায়ার কোন প্রবেশের অধিকার নাই।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩১)

ভাগবতে (১০।৮৭।১৪) পাওয়া যায়, "সর্প যেমন ত্বককে ত্যাগ করিয়া তাহার নিকটেও যায় না, সেইরূপ ভগবান্ নিজ হইতে উদ্ভূত মায়ার নিকটেও যান না।" তবে রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে যে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আকাশ-কুসুম কল্পনা নহে কি ? মায়াতীত না হইলে কেহই ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল, শুন আর সব ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১১৬)

দুর্গাদেবী যে ভগবানের দাসী তাহা শাস্ত্রে মহাপ্রভুর বাক্যে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কন্যারে কহে,—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ-কিঙ্কর॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৪।৫০)

স্বয়ং দুর্গাদেবী কালিকাপুরাণে শ্রীবিষ্ণুর স্তবে বলিয়াছেন,—

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিদুস্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে॥

"ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ যাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম হন না, এরূপ আপনাকে আমি কিরূপে বর্ণন করিব? হে প্রভো! নির্গুণ আপনার গুণসমূহে আমি স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে জানিব, যখন ইন্দ্র প্রভৃতি সুরাসুরগণ আপনার রূপ জানেন না।" ভগবান্ রামচন্দ্র দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া জগতে যে মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অতি অবাস্তব ও ভ্রান্ত, ইহা জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে লিখিয়াছেন, -

"বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জগতের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাকথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুতত্ত্ব। বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা হয়। তিনি অসুরগণের মোহবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অপরাধিগণকে বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্' শ্লোকই তাহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিত। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী-লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষ্যুৎপাটন-ঘটনা তামস প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপপুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মিকী ঋষি রামচরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণী শক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'ভক্তিস্থয়ি' শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা। সুতরাং **মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র কখনও**

তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জগলক্ষ্মীদেবীর হরণ কামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্তসম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেইদিন তাঁহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কন্ধ, ৭ম অঃ) বলেন,—"ভগবানের অপাশ্রিত-মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোনদিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়ামিশ্রিত হন না। যে কালে নির্ব্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শম্ভুতা বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন, পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন।"

কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণই দুর্গাদেবীর কারাগারের কয়েদী

পুরোহিত গোষ্ঠীর শ্রীরমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত মতানুসারে সম্রাট্ আকবরের সময় বঙ্গদেশের সুবাদার ও দেওয়ান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে শরৎকালে প্রচার করেন। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই রমেশ শাস্ত্রীর প্রবর্ত্তিত মতানুসারে হইতেছে, তাহা কোনরূপ প্রামাণিক শাস্ত্রানুমোদিত নহে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বাঙালীদের মধ্যেই শরৎকালে দুর্গাপূজা করিবার প্রবণতা দেখা যায়। প্রত্যেকের কৃষ্ণভক্তি লাভের নিমিত্ত কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপালাভ করিবার যত্ন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ব্রহ্মসংহিতা'র অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম' তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'। তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপদমনীরূপ

মহিষাসুরমর্দ্দিণী, শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী, ষড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিণী, পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী, কালশোভাবিশিষ্টা বলিয়া সর্প-শোভিনী—এই সকল আকার বিশিষ্টা দুর্গা, সেই দুর্গা দুর্গ বিশিষ্টা। 'দুর্গ' শব্দের অর্থ—কারাগৃহ। তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ। কর্ম্মচক্র তাঁহার দণ্ড। বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধনপ্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা বা কর্ম্ম, দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিরূপট কৃপালাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, সন্তানাদির আরোগ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশমহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক লীলা' বিস্তার করেন। জীব চিৎকণ স্বরূপ। তাহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ হইলেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাহাকে কয়েদীর পোশাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিবদ্ধ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ একটী লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকে।"

অতএব দুর্গাদেবী গোবিন্দ তথা রামচন্দ্রের নিত্যদাসী অর্থাৎ রামচন্দ্রের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সমস্ত কার্য্য। রামচন্দ্র নিজদাসী দুর্গাদেবীর পূজা কখনও করেন নাই বা করিতে পারেন না—ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীরথযাত্রা-মাহাত্ম্য

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মাহাত্ম্য।
'ভবিষ্যোত্তরে' বর্ণিয়াছে যথা সারমর্ম্ম॥
পৃথ্বীধর—শ্রীদামোদর-জাগরণকালে।
করেন দরশন যাহা যাহা স্থানে॥
সে-সব স্থানের লোক মহাভাগ্যবান্।
স্বর্গ-সদৃশ বলিয়া শাস্ত্রের প্রমাণ॥
হে নরনায়ক! শ্রীহরির রথের দড়ি।
ধারণ ক'রে যত পদ যাবে আগুবাড়ি॥
তত পথ স্থান হয় যজ্ঞায়তন-তুল্য।
রথ-রজ্জু ধারণ এতই মহামূল্য॥
কৌতুকেও রথে হরিকে করে দরশন।
শ্বপচগণেও হতে পারে দেবগণ॥
নারীসবে যদি হয় রথ-পরায়ণ।
পিতৃ-মাতৃ-পতিকুল মুক্তির কারণ॥
রথাগ্রে কেহ কৌতুকে করে নৃত্য-গীত।
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত অপ্সরা-সহিত॥
গীত-বাদ্যাদি যাঁরা রথাগ্রে করেন।
দেবলোকে বহুদিন হয় অবস্থান॥
আসিয়া ধরাধামে হন নরপতি।
যাবৎ সুকৃতি তাদের আছয়ে সম্প্রতি॥
রথাগ্রে নৃত্য-গীতে করে বিত্তগ্রহণ।
গায়ক-বাদক সবের হরিলাক-গমন॥
আনন্দে রথোৎসব করে দরশন।
চৌদ্দ ইন্দ্রপাতে নাহি নরক-গমন॥
পুণ্য কিম্বা লোভবশে দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
রথোৎসব মহিমা করেন প্রচার॥

রত্নধাতুপূর্ণা সসাগরা সপর্ব্বতা।
সপ্তদীপা পৃথ্বী বন-পুষ্প বিরাজিতা॥
এ হেন সুলক্ষণা পৃথিবীর দানসম।
অনায়াসে লভে ফল—শাস্ত্রের বচন॥
রথারূঢ় হরির যেবা করি' দরশন।
আরাধিলে মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণ॥
শক্ত্যানুসারে কৃষ্ণ-রথ করে অলঙ্কৃত।
সূর্য্যাদি দেবে করে পূর্ণ মনের বাঞ্ছিত॥
পতাকা-মাল্যাদিতে করে রথের সাজন।
ষট্‌মন্বন্তর যাবৎ সেই ভাগ্যবান্॥
উত্তমা নারীর সহিত করেন বিহার।
যাবৎ সুকৃতি সঞ্চিত আছয়ে তাহার॥
হে বৎস! অতি হর্ষে যেবা ভাগ্যবান্।
রথশোভা অনায়াসে করে সম্পাদন॥
পদে পদে সেই ব্যক্তি প্রয়াগের ফল।
অবশ্য হইবে লাভ নাহিক নিষ্ফল॥
রথে যবে জগন্নাথ করে আরোহণ।
তৎকালে জয়ধ্বনি-ফল শুনহ এখন॥
হে নরেশ্বর! তীর্থ—প্রয়াগ-গঙ্গাদ্বার।
গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, বারাণসী আর॥
দেবগণ দর্শনে তাহার যে হয় পুণ্য।
পথোপরি হরি জয়ধ্বনিতে সেই পুণ্য॥
ভক্তিসহ পুষ্পে পূজে রথারূঢ় কৃষ্ণের।
অন্তিমে সর্ব্বাভীষ্ট পূরেণ তাহাদের॥
সমাগত হরিবাসরে রথারূঢ় হরিকে।
মাঙ্গল্যদ্রব্য—ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদিকে॥
স্তুতি-বস্ত্র-নিরাজন করে যেই জন।
অন্যে দূরে থাক হরি জ্ঞাত হন॥

ব্রহ্ম-নিন্দুক, ব্রহ্মঘ্ন-মদ্যপায়ী গোহন্তা।
গুরুদারগামী মহাপাতক ভ্রূণ-হন্তা॥
কলিমুগ্ধ, আর সর্ব্ব পাতকীসকল।
অনায়াসে ভক্তি লাভ হইবে সফল॥
রথারূঢ় মহাবিষ্ণুর দিয়ে জয়ধ্বনি।
করিয়া পূজা তাঁরা হরিধামগামী॥
পূর্ব্বে দৈত্যপতি প্রহ্লাদ-দেবগণ।
সিদ্ধ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব করে রথাকর্ষণ॥
হে হরি! তোমার কৃপায় হইল সঙ্কলন।
সাধন-ভজনহীন দাস মধুসূদন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ

শ্রীনন্দলালের জন্মকথা

যদুবংশোদ্ভূত শ্রদেবমীঢ় মথুরায় বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী ভার্য্যা ছিল; তন্মধ্যে প্রথমা পত্নী ক্ষত্রিয়া ও দ্বিতীয়া পত্নী বৈশ্যা। প্রথমা পত্নীর গর্ভে 'শূর' এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে 'পর্জ্জন্য' জন্মগ্রহণ করেন। শূর হইতে শ্রীবসুদেব আবির্ভূত হন। শ্রীনন্দের পিতার নাম পর্জ্জন্য। পর্জ্জন্য বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতেন—তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া সকল বস্তু দান করিতেন। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। যাবজ্জীবন তিনি শ্রীহরির পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেবর্ষি নারদের আজ্ঞাক্রমে নিজাভিমত সন্ততি কামনা করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর আকাশে দৈববাণী হইয়াছিল,—'হে ধন্য! এই তপস্যার দ্বারা তোমার পঞ্চপুত্র হইবে। তাঁহার মধ্যে নন্দ-নামক মধ্যম পুত্রের ব্রজানন্দকর এক নন্দন হইবে। সুর ও অসুর সকলেই শিখারত্নদ্বারা তাঁহার পদাম্বুজ নিরাজন করিবেন।'

সেই বরে তুষ্ট হইয়া শ্রীপর্জ্জন্য নন্দীশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশীদৈত্য আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিলে তিনি ভীত হইয়া তথা হইতে বৃহদ্বনে গমন করেন। ইঁহার ক্লেশ শুক্লবর্ণ, বস্ত্রও শুক্লবর্ণ। ইনি কৃষ্ণকে সর্ব্বদা

মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া সুখী করেন। ইনি কৃষ্ণের পিতামহ। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী। ইনি পৃথিবীর মান্যা এবং কুসুম্ভবর্ণা। ইনি খর্ব্বাকৃতি এবং ইঁহার হরিদ্বর্ণবস্ত্র ও দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কেশ। শ্রীনন্দের দুই পিতৃব্য—একজনের নাম উজ্জন্য ও অন্যের নাম রাজন্য। উজ্জন্যের পত্নীর নাম নটী। রাজন্যের পত্নীর নাম শুরা। পর্জ্জন্যের ভগ্নীর নাম সুজন্যা। সুজন্যার পতির নাম গুণবীর। ইনি বলবান্ ও পশুযুদ্ধে পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দলাল। তিনি শ্রীনন্দের নিত্যপুত্র। নন্দগৃহেই তাঁহার নিত্য বাসস্থান। শ্রীনন্দ ব্রজানন্দপ্রদ ও ভুবনবন্দিত। ইনি দীর্ঘাকৃতি, চন্দনবর্ণ, ইঁহার স্থূল তনু, বান্ধুলীপুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণ বসন ও শুক্ল শ্মশ্রু। ইঁহাকে লোকে উপনন্দানুজ, বসুদেব-সুহৃত্তম, গোপরাজ, যশোদেশ, কৃষ্ণতাত ও ব্রজেশ্বর বলিয়া থাকেন। ইঁহারা পাঁচ ভাই—উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ বা সুনন্দ ও নন্দন। শ্রীনন্দমহারাজের দুই ভগ্নী—সানন্দা ও নন্দিনী। উপনন্দ ও অভিনন্দ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত এবং সন্নন্দ ও নন্দন কৃষ্ণের খুল্লতাত।

কৃষ্ণের মাতামহের নাম সুমুখ। ইঁহার শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ লম্বিত শ্মশ্রু ও পাকা জামের ন্যায় বর্ণ। ইঁহার পত্নীর নাম পাটলা। ইহার শ্বেতবর্ণ কেশ, পাটলবর্ণ ও হরিদ্বর্ণ বস্ত্র। ইঁহার মুখরা নামে গোপী প্রিয়সহচরী ছিলেন; তিনি স্নেহ করিয়া শ্রীযশোদাকে স্তন্য দিয়াছিলেন। নন্দপত্নী শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের মাতা। ইঁহার ইন্দ্রধনুসদৃশ বসন, তনু নাতিস্থূল, কিঞ্চিত দীর্ঘাকৃতি এবং নবঘনের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ। আদিপুরাণ বলেন, 'নন্দভার্য্যার যশোদা ও দেবকী দুইটী নাম।' শ্রীযশোদার মাতুলের নাম গোলগোপ। ইঁহার ধূমল বর্ণ ও বানরের ন্যায় মুখ। ইঁহার ভার্য্যার নাম দুর্ম্মুখী জটিলা। এই জটিলার কাকের মত বর্ণ ও অত্যন্ত স্থূলোদর। শ্রীযশোদার তিন ভ্রাতা—যশোধর, যশোদেব ও সুদেব। শ্রীযশোদার ভগ্নীদ্বয়ের নাম—যশোদেবী ও যশস্বিনী। যশোদেবী শ্যামবর্ণা, যশস্বিনী গৌরবর্ণা। তাঁহারা রাজন্যের পুত্র চাটুক ও বাটুকের পত্নী। অম্বিকা ও কিলিম্বা এই দুইজন শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িকা অর্থাৎ শিশুকালে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের স্তন পান করিতেন। বিশেষতঃ অম্বিকা দুইজনের মধ্যে প্রধানা; যেহেতু ইনি শ্রীব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যা। গৌরাবতারে শ্রীবাসপত্নী শ্রীমালিনীদেবী অম্বিকা এবং শ্রীবৃন্দাবন-জননী শ্রীনারায়ণী দেবীই অম্বিকার ভগ্নী কৃষ্ণোচ্ছিষ্টভোজিনী কিলিম্বিকা।

দ্বাপরযুগে কংসাদি দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে আক্রান্ত হইয়া ধরণী লোকপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা গাভীরূপধারিণী রোরুদ্যমানা পৃথিবীর

দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেব, অন্যান্য দেবতা ও পৃথিবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তব করিতে থাকেন। ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিবার পর আকাশবাণীতে শুনিতে পান যে,—"শীঘ্রই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কালাখ্য শক্তিদ্বারা ভূভার হরণ করিবেন। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ং বসুদেবগৃহে প্রকটিত হইবেন। অতএব দেবপত্নীগণ পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধনজন্য এবং তৎপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের দাসত্ব করিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। শ্রীবলদেব ভগবানের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইবেন।"

দেবতাগণ ত্রিলোচনের সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন—এই বাক্যে দেবতাগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে মাত্র গমন করিয়াছিলেন, শ্বেতদ্বীপ-সংজ্ঞক ভগবদ্ধামে গমন করিতে পারেন নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। কেন না, ভগবদ্ধামে দেবতাদিরও প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীবাসুদেব স্বয়ং লীলাপুরুষোত্তমের—শ্রীনন্দনন্দনের বৈভব-প্রকাশ। শ্রীবাসুদেবের ক্ষত্রিয়-অভিমান, আর নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের গোপাভিমান। শ্রীরূপপ্রভু-কৃত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত-পাঠে জানা যায়, যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে গমন করেন না অর্থাৎ প্রকটলীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি স্থানে গমনাগমন করিলেও অপ্রকটলীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কোনও কালে চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একটীমাত্র গোপীর সহিত নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলাস্থান মথুরা-ধাম নিত্য। ভগবদ্ধাম কালদোষে অন্য স্থানের ন্যায় অন্তর্হিত হন না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—"ভগবান্ মাথুরমণ্ডলে নিত্য অবস্থান করিতেছেন—এই বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন—বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপ নহে। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাবসময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপ হইতে অংশাবতারগণ আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হন এবং লীলান্তে তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করিতে থাকেন; সুতরাং অন্যান্য অবতারগণ বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হন, ইহাও সূচিত হইল।"

দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণের জন্য বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু শ্রীবসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণ-

রূপের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন। এই শ্রীবাসুদেব প্রাকৃত জন্মকর্ম্মশীল বস্তু নহেন; তিনি অধোক্ষজ বস্তু। বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত আত্মাতেই তাঁহার নিত্য আবির্ভাব। তিনি সেবোন্মুখ ভক্তের হৃদয়ে নিত্যকাল প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা নিত্য। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এ জগতে যাহা আছে, তাহা ত' মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণলীলাকে নিত্য বলা যায় কিরূপে? তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিত্য। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক লীলা কোথাও না কোথাও হইতেছে বলিয়া চক্রবৎ বর্ত্তমান। সেইরূপ সকল প্রকটলীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই নিত্যবর্ত্তমান। প্রকটলীলা সকল ব্রহ্মাণ্ডেই হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটী ব্রজধাম আছে। গোলোক স্বপ্রকাশ বস্তু, সকল ব্রহ্মাণ্ডে লীলাধামরূপে বর্ত্তমান। আবার সকল ভক্তহৃদয়েও গোলোক প্রকটিত। যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট, তথাকার মাথুরমণ্ডল কেন প্রকট থাকেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সেইস্থানে অপ্রকটলীলা নিত্য বর্ত্তমান। তত্রস্থ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধাম বর্ত্তমান থাকেন।"

শ্রীবসুদেব যখন দেবকনন্দিনী শ্রীদেবকীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান, তখন উগ্রসেন-পুত্র কংস ভগ্নীর সুখবিধানের জন্য সেই রথের সারথ্য করে। অশ্বরজ্জুধারী কংস রথ চালনা করিতেছিল, তখন দৈববাণী হইল—'অরে মূর্খ কংস! তুই যাঁহাকে বহন করিতেছিস, তাঁহার অষ্টম গর্ভ তো'কে হত্যা করিবেন।'

এই কথা শ্রবণমাত্রই ভোজকুলকলঙ্ক ক্রূর পাপিষ্ঠ কংস তৎক্ষণাৎ এক হস্তে দেবকীর কেশবন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক অপর হস্তে খড়্গ লইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। পরম-চতুর শ্রীবসুদেব কলে-কৌশলে কংসকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কংস ভগ্নীবধে নিবৃত্ত হইলে তখন শ্রীবসুদেবও পূর্ব্ববৎ গীত-বাদ্যাদির সহিত দেবকীকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

এখানে প্রশ্ন এই যে, শাস্ত্র অষ্টম পুত্র বা কন্যা না বলিয়া অষ্টম গর্ভের কথা বলিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, ভাবি-কন্যা-জন্ম-দর্শনে কংসের মনে যাহাতে সন্দেহ না হয়, এই জন্যই অষ্টম পুত্র না বলিয়া অষ্টম গর্ভ বলা হইয়াছে। আরও প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিবাহোৎসবময় সুদিনে দেবগণ দুঃখকর আকাশবাণী করিলেন কেন? আকাশবাণী না করিলে ত' আর কংস কোন অত্যাচার করিত না। তদুত্তর এই যে, স্বজননী শ্রীদেবকীর প্রতি স্নেহশীল কংসকে শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া হত্যা করিবেন?—এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া ভগবদ্ভক্ত শ্রীদেবকীর চরণে কংসের অপরাধ উৎপাদনের জন্যই দেবগণ আকাশবাণী করিয়াছিলেন। দৈববাণীতে স্বগৃহে ভাবী

ভগবদবতার হওয়া-সম্বন্ধে শ্রীবসুদেব-দেবকীও দৃঢ়নিশ্চয় ও পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে সর্ব্বদেবময়ী শ্রীদেবকী প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া আটটী পুত্র এবং সুভদ্রানাম্নী একটী কন্যা প্রসব করিলেন। এই আটটী পুত্রের মধ্যে প্রথম ছয়টী পুত্র কংসহস্তে নিহত হয়। প্রথম পুত্রের নাম কীর্ত্তিমান্। এই কীর্ত্তিমান্ নামটী দেবকীপুত্রের তৃতীয় জন্মগত। প্রথম জন্মে ইঁহার নাম 'স্মর' ছিল। মহর্ষি মরীচির ঊর্ণানাম্নী পত্নীর গর্ভে স্মর, উদ্গীথ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র জন্মে। ইঁহারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে মৃগরূপিণী কন্যার প্রতি রমণোদ্যত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেই অপরাধফলে ইঁহারা কালনেমির ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু হইতে উৎপন্ন হয়। কালনেমির পুত্র হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা-নামে বিখ্যাত ষড়্গর্ভ-নামক অসুরগণ সুরগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও সমরবিশারদ ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কালনেমির পুত্রগণ পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মার আরাধনায় রত হইয়াছে দেখিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করে—পিতার হস্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে। তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই কংসই তোমাদিগকে হত্যা করিবে। হিরণ্যকশিপু তাঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমির অবতার কংসের হস্তে নিহত হন। পরে দ্বারকালীলায় দেবকীর প্রার্থনা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সুতল হইতে আনিয়া মাতার শোক নিবারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সদ্গতি দান করেন।

কংস ভয়ে চিন্তিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ চিন্তান্বিত আছে, এমন সময়ে শ্রীনারদ সুরলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক মথুরার উপবনে উপস্থিত হইয়া কংসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত রাজসমীপে তদীয় আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে অসুরবর কংস নারদের আগমনসংবাদ-শ্রবণে হর্ষান্বিত হইয়া অতি সত্বর স্বপুর হইতে বহির্গত হইল এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী অতিথি ব্রহ্মর্ষি নারদকে দেখিতে পাইল। কংস দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশনার্থ সুবর্ণ-নির্ম্মিত আসন আনাইয়া দিল। শ্রীনারদ উপবিষ্ট হইয়া কংসকে কহিলেন—"হে বীর! তুমি ত' বিধিমত আমার যথোচিত পূজা করিয়াছ, এখন আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে তাত, আমি নন্দনকানন, চৈত্ররথ-বন তথা ব্রহ্মপুরাদি স্বর্লোক-সকল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য-সখ বিপুল সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ অনেকেই

আমার সহগামী হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই অনেক সুতীর্থ অতিক্রম করিয়া ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা দিব্যগঙ্গাকে দর্শন করিলাম। একদা ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া সেই সুমেরুশিখরে সভা করিলে তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, তাঁহারা নিজ অনুচরগণের সহিত তোমার নিদারুণ বধোপায়ের কথা মন্ত্রণা করিতেছেন। হে কংস! মথুরাতে তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে; তাঁহার অষ্টম গর্ভ হইতে তোমার মৃত্যু হইবে।" দেবর্ষি এই কথা বলিয়া মথুরা হইতে বহির্গত হইবামাত্রই কংস যদুদিগকে দেবতা এবং দেবকীর গর্ভজ সন্তানমাত্রকে আপনার মৃত্যু-কারণ বিষ্ণু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবসুদেব-দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং জীব-বৎ জন্মরহিত বিষ্ণু হইতে নিজ মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেক পুত্রকেই জন্ম-মাত্র বধ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কংস যখন পৃথিবীতে কালনেমি-অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ দেবর্ষি নারদ হইতে অবগত হইয়া কংস যাদবগণের সহিত বিরোধাচরণ করিতে লাগিল। এমন কি, যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি নিজপিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। তাহার কঠোর অত্যাচারে অনেকে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করিলেন। কেবল অক্রূর প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনোৎকণ্ঠায় বা শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনরূপ স্বার্থের অপেক্ষায় কংসের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তথায় রহিলেন। তারপর ক্রমে কংসকর্ত্তৃক ছয় পুত্র নিহত হইলে দেবকীর হর্ষ-শোকজনক সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হইল। দেবকীর এককালে হর্ষ ও শোক হইবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—'আনন্দময় ভগবান্ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়াই আনন্দ, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রকে কংস বধ করিয়াছে, ইহাকেও সেইরূপ বধ করিবে, তজ্জন্য শোক যুগপৎ হইয়াছিল।'

দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট ভগবানের অবতার-বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। কারণ, দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা জীবের হিতের নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ শীঘ্র আবির্ভূত হইলে দৈত্যতাড়িত দেবকুলের আনন্দ হইবে, তিনিও আপনার অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন এবং কংসকে ভগবানের দ্বারা নাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান করাইবেন ও যাঁহারা কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাব-বিষয়ে নিশ্চয়ত্ব জ্ঞাপন করাইয়া তাঁহাদের সন্দেহভঞ্জন প্রভৃতি বহুবিধ মুখ্য কারণে দেবর্ষি নারদ কংসকে নিগূঢ় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন

প্রকট ও অপ্রকটভেদে শ্রীভগবানের দ্বিবিধ লীলা। শ্রীভগবান্ স্বরূপভূত-অনন্ত-প্রকাশ ও লীলাদ্বারা সর্ব্বদাই নিত্যধামে ক্রীড়া করিতেছেন। কখনও কখনও তিনি সেই অনন্ত-প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত প্রপঞ্চমধ্যে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদি-লীলার বিস্তার করিয়া থাকেন।

লীলা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা অনুসারে তৎপরিকরগণের অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব বিস্তার করেন। প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইলে সেই লীলাকে **প্রকটলীলা** কহে। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই **অপ্রকটলীলা**। সেই অপ্রকটলীলাসমূহ প্রপঞ্চের অগোচরীভূত। উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে।

কংসাদি দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে ধরণী আক্রান্তা হইলে ধরিত্রীদেবী লোকপতি-ব্রহ্মার শরণাপন্না হন। ব্রহ্মা গাভীরূপ-ধারিণী রোরুদ্যমানা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেব, অন্যান্য দেবতা ও পৃথিবীর সহিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরে ক্ষীরোদশায়িবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন। ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিবার পর আকাশবাণী শুনিতে পান যে,—"শীঘ্রই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কালাখ্য শক্তিদ্বারা ভূভার হরণ করিবেন। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ং বসুদেব-গৃহে প্রকটিত হইবেন, অতএব দেবপত্নীগণ পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন জন্য এবং তৎপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের দাসীত্ব করিতে জন্মগ্রহণ করুন। বলদেব ভগবানের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইবেন।"

ব্রহ্মার এই আদেশে দেবাদির অংশ-পরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্গস্থিত বাসুদেবাংশ কশ্যপাদি বসুদেবাদি অংশীর সহিত ঐক্য লাভ করিয়া শূর (বসুদেবের পিতা) প্রভৃতি হইতে মথুরাতে প্রাদুর্ভূত হন।

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাব-লীলার অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ ব্যূহের আবির্ভাব করেন, তৎপরে স্বীয় অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক দুইটী ব্যূহকে যথাসময়ে আবিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন্। বিশুদ্ধচিত্ত অথবা সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বসুদেব'।

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণজন্য বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণ

রূপের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন্। সুতরাং বাসুদেব প্রাকৃত জন্মকর্ম্মশীল বস্তু নহেন, তিনি অধোক্ষজ বস্তু। বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত আত্মাতেই তাঁহার নিত্য প্রাদুর্ভাব, তিনি সেবোন্মুখ ভক্তের হৃদয়ে নিত্য-কাল প্রকটিত।

বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে বাসুদেবের নিত্য প্রাকট্য। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির মহানিশায় কৃষ্ণ দেবকীর হৃদয় হইতে কংস-কারাগারের সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমের স্বভাবানুসারে দেবকী ও বসুদেব মনে করিলেন যে, লৌকিক রীতিতেই এই শিশু অতি সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। এই চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তমেরই বৈভবপ্রকাশ। এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ অথবা দ্বিভুজ যে কোনও রূপেই প্রকাশিত হউন, তিনি কখনই 'কৃষ্ণত্ব' পরিত্যাগ করেন না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপই স্বয়ংরূপের রূপ বলিয়া প্রধানরূপে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্ব অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন ভাগবতের সপ্তম-স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন,—"হে রাজন্, নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে তোমাদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

দেবকীনন্দন কংসকারাগারে দেবকীর শয্যায় প্রকটিত হইলে বসুদেব গোকুল মহাবনস্থ যশোদার গৃহে প্রবেশ করেন এবং তথায় স্বীয়পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া যশোদার যোগমায়ানাম্নী কন্যাকে লইয়া আসেন। এই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। যোগমায়া স্বরূপশক্তি; যোগমায়ারই ছায়াশক্তি বিমুখ-জীব-মোহিনী জড়মায়া। যশোদাদির বাৎসল্যরসের মধুরতা ও বৈচিত্র্য উৎপাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় এই যোগমায়া যশোদার নিকট প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং যখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া গেলেন, তখন আর যশোমতী সে কথা জানিতে পারিলেন না। যশোমতীর এরূপ অজ্ঞতা প্রাকৃত জীবের ন্যায় অজ্ঞানতা বা মোহাদি নহে; পরন্তু লীলারসবিচিত্রতা বিস্তারের হেতুরূপা। উহা শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাসম্ভূত। এইরূপে অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে বিরাজিত থাকায়, প্রকটলীলায় দেবকীর ন্যায় যশোদাকেও দ্বারভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দের উৎসবে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে ক্রমে বাল্যাদি লীলা

প্রকাশ করেন নন্দ-যশোমতীর অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য-বশে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়া জানেন।

আবার কোনও কোনও ভাগবত বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণ—বসুদেব ও নন্দ উভয়েরই আত্মজ অর্থাৎ কেবল বসুদেবের আত্মজ এবং নন্দের পালিত পুত্র মাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, মথুরায় বসুদেব-গৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব এবং গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে আগমনপূর্ব্বক যখন যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যাটিকে লইয়াই তিনি মথুরায় আগমন করেন। এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলেন। এই বিষয় অতি গূঢ় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি ভাগবতগণ যথাক্রমে না বলিলেও প্রসঙ্গক্রমে কোন কোনও স্থলে উহার সূচনা করিয়াছেন। যেমন ভাগবতে (১০।৫।১)—"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥" "বন্যস্রজে কবল-বেত্র- বিষাণবেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" (১০।১৪।১) ইত্যাদি।

তাঁহারা যামলবচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক্, যিনি পূর্ণতত্ত্ব এবং অনাদিরাদি মূলপুরুষ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও গমন করেন না। তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি গোপীকুল-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যকাল তাঁহাদেরই সহিত বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত
A FEW WORDS ON VEDANTA
ও
RELATIVE WORLDS
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর]

সময় যখন সংক্ষিপ্ত, তখন সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবস্থা নেব। সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবস্থা কি রকম? —Supreme Authority-র সেবা করব। গাছের মূলেতে জল দেব, ডালে ডালে, পাতায় পাতায় জল দেওয়ার প্রয়োজন নাই।—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

গাছের গোড়ায় জল দাও, তাহলে বৃক্ষ সঞ্জীবিত হবে, দারুণ গ্রীষ্মের নিদাঘে সে বৃক্ষ জীবন লাভ করবে, ফল-ফুলে সুশোভিত হবে। গাছটা মারা যাবে না। "মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর।" আমি গাছের গোড়ায় জল দিলাম না, পাতায় একটু জল ছিটিয়ে দিলাম, কি ডালে একটু জল ছিটিয়ে দিলাম, গাছ বাঁচবে না। গোড়ায় জল ঢালতে হবে। গোড়াটা কে?—'প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্'। খুব ক্ষুধা লেগেছে একজনের। মুখে আহার না দিয়ে নাকের মধ্যে, চোখের মধ্যে, কানের মধ্যে চারটে ভাত গুঁজে দিলাম। বাঁচবে লোকটা?—বাঁচবে না, মরে যাবে। মুখে আহার দিতে হবে। 'প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥' অচ্যুত শ্রীভগবানের আরাধনাটা এই রকম। আচ্ছা, সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আর যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করব? অনেক ত' আধিকারিক দেবদেবী বসে আছেন। তেত্রিশকোটী দেবদেবী আছেন বলে শুনতে পাই। যাই হোক, নূতন নূতন দেবদেবী সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের মনের থেকে। এই কয়েক বছর আগে সিনেমার পর্দায় একজন দেবীর আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের কোন জায়গায় সেই দেবীর নাম পেলাম না। সে দেবী আবার ছোলা-গুড় খান, শুক্রবারটা তার পূজার নির্দ্দিষ্ট দিন। মানুষ এত ভ্রান্ত! মূলের সেবা না করে ঐ সকল হাবিজাবি নিয়ে সময় কাটাবে, জীবনটাকে শেষ করে দেবে। শ্রীজন্মাষ্টমী করবে না, রামনবমী করবে না, অন্যান্য উপবাস করবে না। কিন্তু ঘেঁটু মাকালে বড় আসক্তি।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের সামাজিক অবস্থাটা কি ছিল? ঐতিহাসিকদের যে বর্ণনা আছে সেখানে বলছেন—"ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে।" ব্যবহার-রসটা কি? দুই জমিদার—এক জমিদারের ঘরের বিড়ালের

সঙ্গে আর এক জমিদারের বিড়ালীর বিয়ে হচ্ছে। এক জমিদারের ঘরের পোষা বাঁদরের অন্য জমিদারের বাঁদরীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। কুকুরের বিবাহ, পোষা বিড়ালের বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। এই হল সামাজিক চিত্র। দ্বিতীয় হল—লেখাপড়ার গৌরব। নবদ্বীপ তখন ছিল **Oxford of Bengal**। নব্য ন্যায়ের চর্চ্চা। লোকের সঙ্গে দেখা হলে রাস্তাঘাটে কেবল ঐ ঠেলাঠেলি। কে কাকে ঠকাবে, কে কাকে তর্কে পরাজিত করবে। গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ নাম কখন কারও মুখে শোনা যেত না। কালে ভদ্রে গঙ্গাস্নানের সময় কেউ হয়ত হঠাৎ 'গোবিন্দ' নাম বললেন, আর না হয় 'পুণ্ডরীকাক্ষ' বললেন। "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ॥" কদাচিৎ কেউ হয়ত বলে উঠলেন। স্বাভাবিকভাবে শোনা যেত না এ সব। এই ত' অবস্থা দেশের! কি আর করা যাবে?

সাধন-ভজনের ব্যাপারটা লোকে বোঝে না আজকাল। আর এখন আমাদের সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছেন, - এই ধর্ম্ম যত অনিষ্টের মূল, সুতরাং ধর্ম্মকে হঠাও, ধর্ম্মকে তাড়াও দুনিয়া থেকে। মৌরসী পাট্টা নিয়ে রাজনীতি চলুক ভালভাবে। ধর্ম্ম ভয়ানক ভুল করেছে, ধর্ম্ম পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভীষণ অন্যায় করেছে, সেইজন্য সমাজ থেকে ধর্ম্ম তুলে দাও। সরকার ধর্ম্ম তুলেও দিচ্ছেন। তাই ধর্ম্মীয় নীতি, ধর্ম্মের যে **Principle**, সেটা কেউ মানছেন না। যদি কিছু খারাপ কেউ করছেন, তাদের ধরে ধরে সাজা দেওয়া হোক। আর যাঁরা ভাল করছেন, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হোক। দুটো পাশাপাশি রাখা হউক। কিন্তু তা না করে এই ধর্ম্মই সব খারাপ করেছে, সুতরাং ধর্ম্ম তুলে দাও। এ ব্যাখ্যা আমরা রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নেতাদের কাছে শুনছি। কি আর বলব! ধর্ম্ম যদি বাদ গেল, তাহলে থাকল কি? চোর, গুণ্ডা, অসামাজিক, বদমায়েসদের ত' একেবারে পোয়াবারো! সুন্দর বিচার চলছে বাজারে, বলার কিছু নাই। বড় বড় সব নেতা ও মহারথীরা বসে আছেন, কারও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। এরা সব গরীবের বন্ধু, সর্ব্বহারার একমাত্র আশ্রয়স্থল!

ধর্ম্মের **Theory** হল, --সব মিলেমিশে চল। যা আছে ভাগ করে খাও, শান্তি স্থাপিত হোক জগতে, মৈত্রীবন্ধন থাক, শান্তিতে মানুষ বসবাস করুক। এটা কারও দরকার নাই। রাজনীতি না করলে ত' খেতে পাব না, সুতরাং রাজনীতি করার অবশ্যই দরকার আছে। ধর্ম্মনীতি করলে ত' খেতে পাওয়া যাবে না, রাজনীতি করলে খেতে পাওয়া যায়। কিছু না হোক, অন্ততঃ **Arrested** হয়ে গিয়ে সেখানেও ত' দুবেলা খেতে পাওয়া যায়। ভাল বিচার! সর্ব্বত্র এই অবস্থা। কেন হচ্ছে?—কালপ্রভাব।

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥

কাল কলি! ভাল কিছু হতে দেবে না। কেউ কিছু ভাল করতে যাচ্ছে ত' অন্যরা বলছে করিস্ না, করিস্ না। সট্‌কে (শতকিয়া) শিখিয়ে দেবে। সে আবার কি?—অমরশক্তি নামে একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে কিছুতেই লেখাপড়া শিখবে না। রাজপুত্র তারা। তাদের দুজনকে কিছুতেই সট্‌কে (শতকিয়া) শেখানো যাচ্ছে না। রাজা ঘোষণা করলেন—আমার এই ছেলে দুটোকে যদি কেউ লেখাপড়া শেখাতে পারেন, তাঁকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব। বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে হাজির হলেন। আমি আপনার ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগ আমি চাই না। রাজবাড়ীতে তিনি থাকলেন। মাষ্টার মশায় মাঝখানে শয়ন করেন, আর দুই ভাই দুই পাশে থাকে। কড়ি-বরগার ঘর। একদিন মাষ্টার মশায় বড় ছেলেটাকে বলছেন,—দেখত' কটা কড়ি আছে?—চারটে। বরগা কটা আছে? —এক, দুই, তিন, চার করে গুণতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় ছোট ভাইটা গিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরেছে। কিরে, তুই ওরকম করছিস্ কেন? আমরা দুজনে প্রতিজ্ঞা করেছি না—সট্‌কে শিখব না। মাষ্টার মশায় কৌশল করে সব শিখিয়ে দিচ্ছে। খবরদার, গুণবি না, যা গুণেছিস্ গুণেছিস্, আর গুণবি না। এই হল—বর্ত্তমান সংসার। এই সংসারে বাস করি আমরা। "আমরা বাঙালী বাস করি এই তীর্থবরদ বঙ্গে।" আমি বলি, —'আমরা বাঙালী বাস করি এই খিস্তিমুখর বঙ্গে।' আমাদের ভালটা কে শিখাবে? আদর্শ কই সামনে, দিশারী কই, কে পথ দেখাবে? আর দেখানোর যদিও বা আছে শিখবার কেউ নাই।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

বক্তা থাকলেও গ্রহণ করবার লোক নাই, বুঝবার লোক নাই, কেউ বুঝবে না, কেউ **Ready**—প্রস্তুত নাই। যদিও বক্তা, শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ত' নাই, তাহলে কি হবে? কাকে পড়ানো হবে? সভার মধ্যে যিনি বক্তা বক্তৃতা করবেন, শ্রোতা ত' চাই। শ্রোতা ছাড়া চলবে? শ্রোতা ছাড়া বক্তার কি বাহাদুরি আছে? 'কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যন্তে।' যেখানে বক্তা নাই,

ধর্ম্মোপদেশক নাই, ধর্ম্মের কথা, নীতি-আদর্শের কথা শুনবার লোক নাই, সেখানে একরকম কথা। যেখানে বক্তা আছেন কিন্তু শুনবার লোক নাই, সেখানে বক্তা কি করবেন? 'নগ্নঃ ক্ষপণক-দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি?'—যে দেশের সব মানুষ ন্যাংটা, সেখানে রজকের আর কি কাজ আছে? তার ত' কোন **Duty** নাই। এখন বর্ত্তমান সমাজের এই অবস্থা হয়ে গেছে।

এক জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে সামনে সব ভাল ভাল পণ্ডিত বসে আছেন। আমি প্রথমে বন্দনা করে আরম্ভ করলাম—সভা কাকে বলে? দেখি খুব আগ্রহ তাঁদের। আমি বললাম—এটা ত' ধর্ম্মসভা। শাস্ত্রে সভার সংজ্ঞা আমরা এইরকম পেয়েছি,—

　　ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ,
　　বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ॥

সেই সভাকে সভা বলে মানা হবে না, যদি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ সেই সভা সমলঙ্কৃত না করেন। সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বৃদ্ধ বলে মানা হবে না, তাঁরা যদি ধর্ম্মকথা—তত্ত্বসিদ্ধান্ত লোককে না জানান, না শিখান। "ধর্ম্ম স নো যত্র ন সত্যমস্তি'—সেই ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে মানা হবে না, যে ধর্ম্মের মধ্যে সত্য বর্ত্তমান নাই। 'সত্যং ন তৎ যচ্ছলমভ্যুপৈতি'—যার ভিতরে ছল, কপটতা বর্ত্তমান, তার ভিতরে সত্য বলে কিছু নাই। কথাগুলো ত' খুব ভাল, কিন্তু আমরা মানছি কোথায় ভগবানের উপদেশ, মুনি-ঋষিগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ। শিক্ষা-উপদেশ যিনি যতটুকু নেবেন, তিনি ততটুকুই ভাল।

শ্রীবিনোদবিহার

জয় জয় বিনোদকুঞ্জ, বিনোদবিহার।
বিনোদিনী রাধাসঙ্গে মিলন দোঁহার ॥ ১ ॥
রতিরস-সুধাপান একমাত্র সার।
বিষয়-আশ্রয় তবে করে অঙ্গীকার ॥ ২ ॥
দিব্যগৃহ রত্নবেদী অতিমনোহর।
অনঙ্গ-বিহার-সুখে মগ্ন বংশীধর ॥ ৩ ॥

সুগন্ধ সৌরভ বহে, ভ্রমর ঝঙ্কার।
আনন্দ কুসুম-কুঞ্জে ফুটয়ে অপার ॥ ৪ ॥
অলিকুল গুণগান করে সর্ব্বক্ষণ।
হরয়ে দোঁহার মন করি দরশন ॥ ৫ ॥
কুঞ্জ-চারিপাশে শোভে কল্পবৃক্ষগণ।
কামধেনু নিত্যসেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
বিরহকাতর দোঁহা নাহি পারাবার।
অন্তরঙ্গ সখি সেবা করেন দোঁহার ॥ ৭ ॥
বিবর্ত্ত আনন্দ-সুখ পুরাতে যতন।
প্রণয় আনন্দ স্নেহ করেন গ্রহণ ॥ ৮ ॥
পূর্ণ মনোরথ রতি কুণ্ডেতে ক্রীড়ন।
পূরাণ সবার ইচ্ছা বিনোদ রমণ ॥ ৯ ॥
সমাপন করি ক্রীড়া উঠেন যখন।
বস্ত্র অঙ্গরাগ সেবা করে সখিগণ ॥ ১০ ॥
অপূর্ব্ব দোহার রূপ করেন রচন।
অলঙ্কার গন্ধমাল্য করে বিভূষণ ॥ ১১ ॥
কুঞ্জ-মধ্যে সেবা-সুখ আনন্দিত মন।
প্রণয় মাধুর্য্য রস করে আস্বাদন ॥ ১২ ॥
কস্তুরী-চন্দন অঙ্গে করেন লেপন।
দোহা দরশনে দোহে বিমোহিত হন ॥ ১৩ ॥
নয়ন-মঞ্জরী তবে করেন অর্চ্চন।
বিনোদ-মঞ্জরী সঙ্গে করেন গ্রহণ ॥ ১৪ ॥
শ্রীরাধারচরণপদ্ম যাঁহার জীবন।
শ্রীগুরুপাদপদ্মসহ করেন সেবন ॥ ১৫ ॥
রূপানুগভাবে সেবা যাহার চিন্তন।
রাগাত্মিকা সিদ্ধভাব—পায় বৃন্দাবন ॥ ১৬ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

গ্রামের মূর্খ চাষী মাঠে চাষ করে, ফসল ফলায়, আর তদ্দ্বারা সে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন করে। গ্রামের বাহিরে কোথাও যায় না, কোন খবরও রাখে না। চাষের ক্ষেত্র আর সংসার—এই তাহার জগৎ। এইটুকুই সে চক্ষু দিয়া দেখে, কর্ণ দিয়া শ্রবণ করে, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করে, নাসিকা-দ্বারা ঘ্রাণ লয় ও ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ-সুখ অনুভব করে এবং নিজেকে একজন সক্ষম বিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া মনে করে। এই গণ্ডীর বাহিরে যে কি বিশাল জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে ও সেইখানে যে অসংখ্য কর্ম্মযজ্ঞ চলিতেছে, সে তাহার কোন খবরও রাখে না, বিশ্বাসও করে না। কেহ তাহাকে জানাইবারও নাই, জানাইতে চাহিলেও সে উটপাখীর মত নিজেকে বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া বালিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।

এহেন এক কৃষকের সহিত এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর দৈবযোগে আলাপ হয়। বিজ্ঞানী তাহাকে বর্ত্তমান যুগের অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কথা, কৃত্রিম উপগ্রহের কথা প্রভৃতি বলিতে থাকেন। চাষী ভাবে,—বিজ্ঞানী তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ঠকাইতেছে, বিজ্ঞানীর নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে। সে তাঁহাকে চাপিয়া ধরে, তুমি যা-যা বলছ তার এখনই সব প্রমাণ দাও, কি করে হয় সব দেখিয়ে দাও। বিজ্ঞানী পড়েন ফাঁপরে, তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এখনই এখানে তোমাকে কিভাবে দেখাইব! চাষী বলে কেন? 'আমি চাষ করি, বীজ বুনি, গাছ হয়, ফল ধরে, কেমন করে হয় সব তোমাকে দেখাতে পারি।' তোমারটাও যদি সত্য হয়, তুমিও নিশ্চয় আমাকে দেখাতে পারবে; কারণ আমার চোখ, কান, মন সবই আছে।

বিজ্ঞানী বলেন, ঠিক আছে, তুমি আমার গবেষণাগারে চল, সেখানে দেখাইব। অগত্যা চাষী রাজী হইল। সেখানে পৌঁছাইয়া সে দেখিল, একটী ঘর আর কয়েকটী খেলনার মত কিছু জিনিসপত্র আছে। বিজ্ঞানী চাষীকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,—বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণার কথা। চাষী কিছুতেই বোঝে না; শুধু বলে,—আমাকে দেখিয়ে দাও, আর কি করে হয় বুঝিয়ে দাও। বিজ্ঞানী বলেন,—এগুলো বুঝতে গেলে তোমাকে এই সব বই পড়ে আগে সব জানতে হবে, তবে তুমি সব বুঝতে পারবে। তুমি আগে এগুলো পড়। চাষীতো কখন পড়তে জানে না, তাই বিশ্বাসও করে না।

অগত্যা সে অ, আ, ক, খ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে বলিল, "এইতো আমি এবার বই পড়তে পারছি, এবার বুঝাও।" বিজ্ঞানী বলেন,—ও পড়া নয়, তোমাকে আরও অনেক পড়তে হবে, তারপর এইসব বিজ্ঞানের বইও পড়তে হবে তবে তুমি বুঝতে পারবে। চাষী বলে,—আমায় শ্বশুর বাড়ীর একজন অনেক লেখাপড়া জানে, সে গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ায়, তাকে জিজ্ঞাসা করব। সে সব কিছু জানে, তোমাকে বিশ্বাস করি না। জিনিস চোখ দিয়ে দেখব, হাত দিয়ে স্পর্শ করব, তার সাথে আবার বই পড়ার কি সম্বন্ধ? কাজ করব, হাতে-হাতে ফল পাব। তুমি একটা মিথ্যাবাদী—এই বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানী হাসিবেন না কাঁদিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। ওদিকে চাষী তাহার সুপরিপক্ক ধারণা সুপরিকল্পিতভাবে জগতে প্রচার করিতে লাগিলেন—বিজ্ঞানী একজন ভাঁওতাবাজ, বিজ্ঞান একটা ভাঁওতা ইত্যাদি ইত্যাদি। নানাপ্রকার উন্নত ভাবসমৃদ্ধ বহুমূল্য গ্রন্থসমূহ তাহার কাছে শুধু কাগজ মাত্র। বিজ্ঞানের মহামূল্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ তাহার নিকট কিছু লোহা ও ধাতুর খেলনা মাত্র। পণ্ডিতমন্য নাস্তিকের নিকট শাস্ত্র ও ভগবান্‌ও তাহাই। তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ অন্ধ।

অন্ধকার-জগতে একশ্রেণীর লোক বাস করে, তাহারা কেহ রাজা, বাদশা, বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, আবার ওস্তাদ-নামে তাহাদের মধ্যে সর্দার বলিয়াও কাহারও পরিচিতি হয়। ইহাদের হাতে সরকারী সেনাবাহিনীর মত কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রাদিও থাকে, কিছু লোকবল, কিছু মোসাহেব থাকে, একটা আস্তানা থাকে। অর্থবলও থাকে, আবার কিছু নিয়ম-কানুন ও বিচার-ব্যবস্থাও থাকে। তাহারা এক একজন বিভিন্ন জ্ঞানে, গুণে, বুদ্ধিতে, চেহারাতে, বিভিন্ন ভাষায়ও সুদক্ষ থাকে। তাহারা বলে,—আমি বা আমরাই সরকার, আমরা অন্য সরকার মানি না। এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহার মানুষের উপর অত্যাচার চালায় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। জনসাধারণ বলেন,- রাজা আছেন বিচার করবেন। তাহারা বলে,—রাজা আবার কে? দেখাতে পারবে? কারণ তাহারা জানে, এভাবে রাজার নিকট গিয়া যাহার তাহার যখন তখন দেখা করা সম্ভব নহে। যদি বা কেহ চলিয়া যান, তবে রাজপ্রহরীরা তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দান করিবে, আসল রাজার দেখা হইবে না। অতএব নিজেরাই রাজা সাজিয়া নারকীয় উল্লাসে মাতিয়া উঠে। অবশেষে একদিন রাজার কর্ণে ইহাদের নামে অভিযোগ আসিল, রাজার কিছু ফৌজ আসিয়া মূর্খের স্বর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

হায়! বেচারী দুঃখিনী ভারতমাতা! আজ কোথায় তোমার নারদ, ব্যাস, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি ঋষি, রাজর্ষি, মহর্ষিগণ! কোথায় তোমার সুসন্তান আর্য্য মুনি-ঋষিগণ। যাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবনদ্বারা অনুশীলন করিয়া মানবের একমাত্র পরম কল্যাণের জন্য সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া তোমার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ তোমার অসহায় অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের কতিপয় অনুগামী নিষ্ফল অভিমানে নীরবে ডুকরাইয়া বোবা-কান্না কাঁদিতেছেন। আর তুমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তানদের শ্বাপদতুল্য লোভাতুর ভয়ঙ্কর থাবা ও করাল কুৎসিত দংষ্ট্রার নারকীয় পৈশাচিক উল্লাসের বিস্তার দেখিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে, নিরালায়, নিঃশব্দে নিজেকে ক্ষয় করিয়া অধোমুখে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছ! হায় মাতঃ, আজ তোমার চোখের জলও গভীর বেদনায় শুকাইয়া গিয়াছে। স্নেহময়ী জননী আজ পাথর হইয়াছেন। তোমার সুনীতি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য আজ সমস্তই নষ্ট হইয়া পদদলিত হইতেছে। কে তাহাকে পুনরুদ্ধার করিবে? কোথায় তোমার সেই বর্ণধর্ম্মাশ্রমের আদর্শ, শান্তপরিবেশ! ধর্ম্মপ্রাণ সুযোগ্য শাসকবর্গ!

আজ তোমার রাজত্বে নিম্নবর্ণ হওয়াই একমাত্র উচ্চ পদ পাইবার শ্রেষ্ঠ যোগ্যতার মাপকাঠি। উচ্চবর্ণ সুযোগ্য হইলেও তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইবে; তাঁহারা উচ্চবর্ণ—এই তাঁহাদের অপরাধ। সনাতন ধর্ম্ম জীব-জগতের নিত্য কল্যাণকর, তাই এই সনাতন ধর্ম্মের উপর সর্ব্বতোভাবে জোর-জলুম করা, আঘাত করাই হইল ধর্ম্মনিরপেক্ষতার একমাত্র মাপকাঠি। যে রাজা ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন, তিনি ততবড়, উদারচেতা প্রগতিশীল মহানুভবরূপে স্বীকৃতি পাইবেন। যিনি সত্যের যতবড় অপলাপ করিতে পারিবেন তিনি ততবড়ই বিচক্ষণ। যিনি ধর্ম্মত্যাগ করিয়া যত অধর্ম্ম করিবেন, তিনি ততই উদারচেতা।

আমি অধম হইয়াছি, তাই বলিয়া তুমি উত্তম হইবে কেন? আমরা সবাই সমান। আমি দুঃশ্চরিত্র, গুণ্ডা, তাই বলিয়া তুমি সচ্চরিত্র, সাধু হইবে কেন? আমি কদাচারী, কদাহারী, তাই বলিয়া তুমি সদাচারী, সাত্ত্বিক হইবে কেন? আমরা সবাই সমান। আমি অধম, তুমি সর্ব্বদিক্ দিয়া উত্তম হইয়া আছ, অতএব তোমাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড় করিয়া সমান করা হইবে। তবেই সাম্যবাদ আসিবে এবং জীবের এইভাবেই মুক্তি ঘটিবে। শান্ত ভারতবর্ষের শান্ত তপোবনে আজ তাই আওয়াজ উঠিয়াছে শান্তির বাণী, — ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।" **ক্রমশঃ**

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

বিবিধ প্রসঙ্গ

বারবিষা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ গত ২২শে জুন, ১৯'৯৫ জলপাইগুড়ি জেলান্তর্গত বারবিষার হাউলি-পটিস্থ শ্রীপাদ চন্দ্রশেখর দাসাধিকারী (চাঁদমোহন সাহা) প্রভুর বাসভবনে উপস্থিত হন। পরদিবস বহুদিন যাবৎ অপেক্ষারত শ্রোতৃবর্গ, বিশেষতঃ শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাসধিকারী প্রভৃতি তাঁহাদের চিরপরিচিত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাতার নিকট হরিকথাসুধা পান করিয়া আনন্দিত হন। ২৫শে জুন উক্ত অঞ্চলের ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন শ্রীযুক্ত নরেশ দাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিলে সকলে বিশেষ আকৃষ্ট হন। উক্ত দিবসই তিনি আসামের বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠাভিমুখে সগোষ্ঠী যাত্রা করেন।

বাসুগাঁও

গত ২৮শে জুন কোকড়াঝাড় জেলার (আসাম) বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের অনতিদূরে 'শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে' ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও স্থানীয় সত্যানুরাগী কতিপয় শিক্ষিত যুবকের উদ্যোগে এক হরিসভার আয়োজন হয়। উক্ত গোবিন্দ মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্রীল আচার্য্যদেব বহু শ্রদ্ধালু জনগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে সাত্বত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯শে জুন শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন দিবস উপলক্ষে শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা কীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামিকৃত অনুভাষ্য ব্যাখ্যার দ্বারা উপস্থিত সমগ্র ভক্তবৃন্দকে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের প্রকৃত তাৎপর্য্যে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন,—শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন লীলাটী কিছু বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। ইহা সাধক-সাধিকাগণের জন্ম-জন্মের চেতোদর্পণমার্জ্জনের বহিঃ প্রতিফলিত রূপ।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা

শিলিগুড়ির শক্তিগড়স্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে সেবিত পরমকারুণিক শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে গত ৩০শে জুন এই প্রথমবার মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া দীর্ঘ নয় দিবস মঠের

সেবকবৃন্দের প্রেমসেবা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের বহুকাল-লালিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। এই আশার বীজ যাঁহার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম উপ্ত হইয়া অন্যান্য সেবকবৃন্দে উজ্জীবিত হয়, সেই স্বধামগতা শ্রীযুক্তা কল্যাণী মাতার অভাবে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেও ভক্তবৎসল ভগবানের এরূপ শুভাগমন "সেইত' পরাণনাথ পাইনু" বিচারে সকলকে সঞ্জীবিত ক'রয়া সেবকবৃন্দের পারস্পরিক অসংবদ্ধতার অবসান ঘটান।

ঐশ্বর্য্যশিথিল সেবাতৎপরতাময় রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র সেব্যেরও সেব্যবস্তু সেই ব্রজরাজনন্দনকে গো-বেত্র-বিশাল-বেণুময় মাধুর্য্যলীলাভূমিতে আকর্ষণের গুপ্তাভিলাষই শ্রীরথযাত্রার গুপ্তরহস্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়-কোঠরের গুপ্ততম এই ধনকে করুণাকর শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। পরদিবস ১লা জুলাই শ্রীল আচার্য্যদেবের দৈবাৎ শুভ পদার্পণে পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হন। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহত্রয়, শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী, শ্রীরাধা-



শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে সেবিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ

শ্যামসুন্দর নিত্যনূতন বস্ত্র-শৃঙ্গার, বনমালা, পত্র-পুষ্পনির্ম্মিত মুকুটে সুশোভিত হইয়া ভক্তকুলের নয়নপথের পথিক হন। চতুর্ব্বিধ ভগবৎপ্রসাদের নিত্যনূতন আয়োজন দর্শনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সেবকবৃন্দের সেবাসৌষ্ঠবের প্রশংসায় মুখরিত হন। প্রত্যহ প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণান্তর্গত শ্রীপুরুষোত্তম খণ্ড, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ শ্রবণে শত শত

ভক্ত পরমানন্দিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীজগদীশ দাস ব্রহ্মচারী প্রকৃতি হরিকথা পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রোতৃমণ্ডলী চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

৪ঠা জুলাই—শ্রীহেরাপঞ্চমী উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে দ্বিসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি, শ্রীমহাপ্রসাদ আকণ্ঠ সেবন করিয়া ধন্যাতিধন্য হন। অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব শুশ্রূষু ভক্তবৃন্দকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা ও হেরাপঞ্চমী-রহস্য কীর্ত্তন করেন। মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্যে বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিমুখতায় কুপিতা লক্ষ্মীদেবীর স্বীয় ঐশ্বর্য্য শতগুণ বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানই শ্রীহেরাপঞ্চমীর পটভূমি। মাধুর্য্যের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রমাণ করিতেই বস্তুতঃ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এবম্প্রকার প্রয়াস।

৮ই জুলাই দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোগারতি ও বিশ্রাম গ্রহণান্তে শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ শ্রীরথারোহণপূর্ব্বক ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শক্তিগড় মঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রতিবৎসর তাঁহাদের এইরূপ শুভাগমন ঘটুক—মঠবাসী ও পল্লীবাসী ভক্তগণের ইহাই আকুল প্রার্থনা।

গত ৩০শে জুন বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, কোচবিহারে সর্ব্বপ্রাচীন শ্রীমদনমোহনের অভাবে সেখানে শ্রীরথযাত্রানুষ্ঠান গত দুই বৎসর যাবৎ বন্ধ থাকায় কোচবিহারবাসিগণ নিকটস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে সমবেত হন। বলাবাহুল্য, শ্রীসমিতির মূলমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং অন্যান্য শাখামঠ—চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে এবং উড়িষ্যার কোরণ্টে শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে মহাসমারোহে শ্রীরথযাত্রা সম্পন্ন হয়।

গত ২৪শে জুন '৯৫ শিলিগুড়িতে শ্রীপ্রভুপাদ-পদাশ্রিত শ্রীপ্রপন্নবন্ধু দাসাধিকারীর সুযোগ্য পুত্র এবং শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতি গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত শ্রীগোস্বামী দাসাধিকারীর নবগ্রামস্থ বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত হইয়া হরিকথাপিপাসু জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বার্ত্তা অকাতরে পরিবেশন করেন। এইরূপে গত ২রা আগষ্ট শিলিগুড়ির মহানন্দা পাড়াস্থ শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ মহোদয়ার গৃহে এবং পরদিবস ৩রা আগষ্ট হাকিমপাড়াস্থ শ্রীসুনীল সাহা মহোদয়ের বাসস্থানে সগোষ্ঠী শুভবিজয় করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বে শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগোপাল মন্দির, শ্রীহৃষীকেশ দাসাধিকারী (সাহা), শ্রীসুবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুনীল কুমার পালচৌধুরী, শ্রীযুক্তা ছন্দা (ছায়া) ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, শ্রীদিলীপকুমার দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনামুখে মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২৭শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

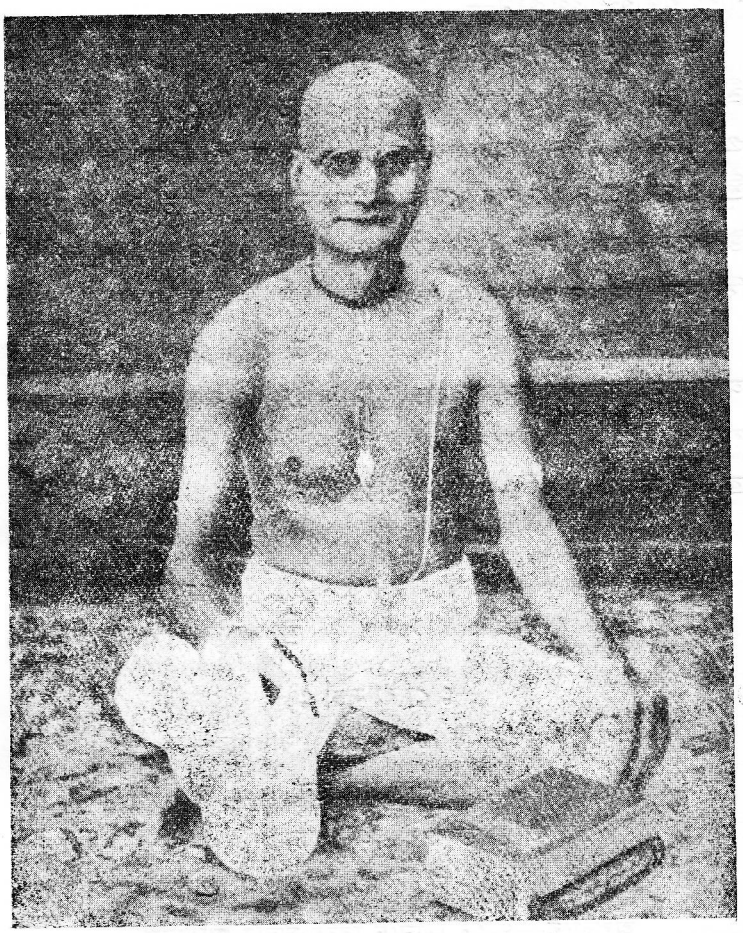

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৭ হৃষীকেশ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ১৪০২ (ইং ৮।১০।৯৫) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৭শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩২শে ভাদ্র, ১৪০২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২০শে আশ্বিন (ইং ৮।১০।৯৫), রবিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ৯ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ৩২ ভাদ্র, সোমবার, ১৪০২, ইং ১৮/৯/৯৫ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীমদনগোপালো জয়তি ॥

বনভুবি রবি-কন্যা স্বচ্ছ-কচ্ছালিপালি-
ধ্বনিযুত-বরতীর্থ-দ্বাদশাদিত্য-কুঞ্জে।
সকনক-মণিবেদী-মধ্যমধ্যাধিরূঢ়ঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥ ১॥

বন-ভূমিতে রবি-তনয়া যমুনার সন্নিহিত তট প্রদেশবর্ত্তী ভ্রমর-গুঞ্জিত উৎকৃষ্ট তীর্থ-রূপ 'দ্বাদশাদিত্য' নামক কুঞ্জে স্বর্ণমণ্ডিত মণিবেদীর উপরে

যিনি অধ্যাসীন রহিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

সুভগ-নবশিখণ্ড-ভ্রাজদুষ্ণীষ-হারা-
ঙ্গদ-বলয়-সমুদ্রা-ধ্বান-মঞ্জীর-রম্যঃ।
বসন-ঘুসৃণচর্চ্চা-মালিকোল্লাসিতাঙ্গঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২ ॥

সুন্দর ও নূতন ময়ূরপুচ্ছের সহিত দেদীপ্যমান উষ্ণীষ ও হার, অঙ্গদ, বলয়, সাক্ষরাঙ্গুরীয়ক ও শব্দায়মান নূপুর প্রভৃতি আভরণে যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং বসন, কুঙ্কুম লেপন ও পুষ্পমালায় যাঁহার অঙ্গ সুশোভিত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

কটিকৃত-বরভঙ্গ-ন্যস্ত-জঙ্ঘান্যজঙ্ঘঃ
করযুগ-ধৃতবংশীং ন্যস্য বিম্বাধরাগ্রে।
সুমধুরমতি-তির্য্যগ্‌গ্রীবয়া বাদয়ংস্তাং
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৩ ॥

উত্তম কটিপ্রদেশে শ্রেষ্ঠ ভঙ্গীর নিমিত্ত যিনি বামজঙ্ঘায় দক্ষিণজঙ্ঘা ন্যস্ত করিয়াছেন এবং যিনি কর-যুগলধৃত মুরলীকে অধর-বিম্বের অগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক বক্রগ্রীবায় সুমধুর স্বরে মুরলী-বাদনে রত, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল করিতেছেন ॥ ৩ ॥

বিধিকৃত-বিধুসৃষ্টি-ব্যর্থতাকারি-বক্ত্র-
দ্যুতিলব-হৃত-রাধা স্থূল-মানান্ধকারঃ।
স্মিত-লপিত-মধুল্যোন্মাদিতৈতদ্বৃষীকঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্ব কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৪ ॥

বিধি-নির্ম্মিত চন্দ্রের ধিক্কারকারী মুখমণ্ডলের কান্তিলেশদ্বারা যিনি শ্রীরাধার স্থূলতর মানরূপ অন্ধকার হরণ করিতেছেন এবং সুমধুর হাস্যযুক্ত আলাপ-রূপ মধুদ্বারা যিনি শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়গণকে উন্মাদিত করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

শরদুদিত-সরোজব্রাত-বিত্রাসি-নেত্রা-
ঞ্চল-কুটিল-কটাক্ষৈর্মন্দরোদ্দণ্ডচালৈঃ।
ঝটিতি মথিত-রাধা-স্বান্ত-দুগ্ধার্ণবান্তঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৫ ॥

শরৎকালে বিকসিত পদ্মসমূহেরও ভয়োৎপাদক অর্থাৎ তৎসদৃশ লোচনাঞ্চলে মন্দরগিরির উদ্দণ্ড সঞ্চালন-তুল্য কটাক্ষদ্বারা যিনি শীঘ্র শ্রীরাধার অন্তঃকরণরূপ দুগ্ধ-সাগরকে আলোড়িত করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কুটিল-চটুল-চিল্লীবল্লি-লাস্যেন-লব্ধ-
প্রথিত-সকল-সাধ্বী-ধর্ম্মরত্ন-প্রসাদঃ।
তিলকবদলিকেন ধ্বস্ত-কামেষু চাপঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৬ ॥

যিনি কুটিল ও চঞ্চল ভ্রূলতার বিক্ষেপদ্বারা বিখ্যাত সাধ্বীগণের ধর্ম্মরত্নরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার তিলকবিশিষ্ট ললাটদ্বারা কন্দর্পের ধনুর্ব্বাণও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

শুকযুব-বরচঞ্চু-প্রাংশুনাসাংশুসিন্ধৌ
জনিত-কুলবধূটী-দৃষ্টিমৎস্যী-বিহারঃ।
স্মিতলব-যুত-রাধাজল্প-মন্ত্রোন্মদান্তঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৭ ॥

শুক-যুবকের উৎকৃষ্ট চঞ্চুপুটতুল্য যাঁহার উন্নত নাসিকা-কিরণরূপ সমুদ্র-মধ্যে অল্পবয়স্কা গোপবধূদিগের দৃষ্টিরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যসকল বিহার করিতেছে এবং শ্রীরাধার ঈষৎ হাস্যযুক্ত জল্পনা-মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ উন্মত্ত হইয়াছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিকসদধর-বন্ধুকান্তরুড্ডীয়-গন্ধৈঃ
পতিতমুপবিধর্ত্তুং রাধিকা-চিত্তভৃঙ্গম্ ॥
দশন-রুচিগুণাগ্রে দত্ত-তৎসীধুচারঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৮ ॥

স্বীয় বিকসিত অধররূপ বন্ধুজীব-পুষ্পের মধ্যে গন্ধলোভে উড্ডীন হইয়া আপতিত শ্রীরাধার চিত্তভৃঙ্গকে সমীপে ধারণ করিবার নিমিত্ত যিনি দন্ত-কান্তিরূপ মনোহর রজ্জুর অগ্রে ভ্রমরকে মধুরূপ ভক্ষণ সামগ্রী অর্পণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

শ্রবণ-মদনকন্দ-প্রেক্ষণোড্ডীন-রাধা-
ধৃতি-বিভব-বিহঙ্গে ন্যস্ত-নেত্রান্ত-বাণঃ।

অলক-মধুপ-দত্ত-দ্যোত-মাধ্বীক-সত্রঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ৯ ॥

শ্রবণরূপ মদন-কন্দের (মূলের) দর্শন-হেতু শ্রীরাধার ধৈর্য্য-সম্পত্তি-রূপ বিহঙ্গ উড্ডীন হইয়া সমাগত হইলে যিনি তাহার উপর নেত্রাঞ্চলরূপ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যিনি চূর্ণ কুন্তলরূপ ভ্রমরসমূহকে কান্তিরূপ মধু-বন অর্পণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

পরিমল-রুচিপালী-শালি-গান্ধর্ব্বিকোদ্য-
স্মুখকমল-মধূলী-পানমত্ত-দ্বিরেফঃ।
মুকুরজয়ি-কপোলে মৃগ্য-তচ্চুম্ব-বিম্বঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১০ ॥

জন-মনোহর গন্ধ ও কান্তিবিশিষ্ট শ্রীরাধার সমুদিত মুখকমলের মধুপানে যিনি উন্মত্ত ভ্রমর-স্বরূপ হইয়াছেন এবং যিনি দর্পণ-বিজয়ী স্বীয় কপোলে শ্রীরাধার মুখবিম্বের অন্বেষণ করিতেছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মকর-মুখ সদৃক্ষ-স্বর্ণবর্ণাবতংস-
প্রচলন-হৃত-রাধ-সর্ব্বশারীর-ধর্ম্মঃ।
তদতিচল-দৃগন্ত-স্বস্থ-বংশে ধৃতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১১ ॥

মকরমুখ সদৃশ স্বর্ণরচিত কর্ণভূষণের সঞ্চালনদ্বারা যিনি শ্রীরাধার সমস্ত শারীরিক-ধর্ম্ম অপহরণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার চঞ্চল দৃগঞ্চলকে অতিশয় চঞ্চল করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয় হস্তে বংশীধারণ করিয়া তাহার উপরে দৃষ্টিন্যস্ত নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

হরিমণি-কৃতশঙ্খ-শ্লাঘিতোল্লঙ্ঘি-লেখা-
ত্রয়-রুচিবৃত-কণ্ঠস্তোপকণ্ঠে মণীন্দ্রম্।
দধদিহ পরিরব্ধুং রাধিকাং বিম্বিতাঞ্চ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত শঙ্খের শ্লাঘা-উল্লঙ্ঘনকারী রেখাত্রয়ের কান্তি-সমাবৃত কণ্ঠসমীপে যিনি মণীন্দ্রে প্রতিবিম্বিতা শ্রীরাধাকে আকর্ষণের নিমিত্ত ঐ কৌস্তুভ-মণি ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

কুবলয়-কৃত-বক্ষস্তল্পমুচ্চং দধানঃ
শ্রম-বিলুলিত-রাধা-স্বাপনায়ৈব নব্যম্।
ভুজযুগমপি দিব্যং তৎপ্রকাণ্ডোপধানং
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥ ১৩॥

যিনি পরিশ্রান্তা শ্রীরাধার বিশ্রামের নিমিত্ত নীলোৎপলসদৃশ বক্ষঃস্থলরূপ সমুন্নত নূতনশয্যা এবং দিব্য ভুজযুগ-রূপ প্রকাণ্ড উপধান ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন॥ ১৩॥

রুচির জঠরপত্রে চিত্র-নাভী-তটোত্থ-
তনুরুহততি-নাম্নীং বল্লবীবৃন্দ-ভুক্ত্যৈ।
স্মর-নৃপতি-সমুদ্র-স্বাক্ষরালীং দধানঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥ ১৪॥

রাজা যেরূপ ব্রাহ্মণাদিকে ক্ষেত্রাদি চিরভোগের নিমিত্ত মোহরযুক্ত দানপত্র প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মণগণও তাহা গ্রহণ করিয়া নিরাপদে উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ গোপীবৃন্দের ভোগের নিমিত্ত যিনি মনোহর উদরপত্রে নাভী-তটোত্থিত লোমাবলী নামক কন্দর্পরাজের মুদ্রাযুক্ত (মোহর-সমন্বিত) স্বাক্ষর-শ্রেণী ধারণ করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন॥ ১৪॥

যুবতী-হৃদলসেভ-প্রৌঢ়বন্ধায় কাম-
স্থপতি-চিত-রসোরুস্তম্ভ-জৃম্ভাভিরামঃ।
মরকত-কটজৈত্র-ক্ষুল্লজানু-প্রসন্নঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥ ১৫॥

যুবতীগণের হৃদয়রূপ অলস হস্তীর সুদৃঢ় বন্ধনের নিমিত্ত কন্দর্প-শিল্পী-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সরস উরু-যুগলরূপ স্তম্ভদ্বয়ের কান্তিদ্বারা যিনি মনোহর এবং মরকত মণি নির্ম্মিত গজগণ্ড যাহা অপেক্ষা হীন বোধ হইতেছে তাদৃশ জানুদ্বারা যিনি শোভমান, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন॥ ১৫॥

প্রণয়-নবমধূনাং পানমাত্রৈকগত্যা
সকল-করণজীব্যং রাধিকা মত্তভৃঙ্গ্যাঃ॥
অরুণ-চরণ-কঞ্জদ্বন্দ্বমুল্লাস্য পশ্যন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ॥ ১৬॥

প্রণয়রূপ নব-মধু যাঁহার একমাত্র গতি অর্থাৎ প্রণয়-নবমধু পান করিবার নিমিত্ত যিনি ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এতাদৃশী শ্রীরাধা-রূপ উন্মত্ত ভ্রমরীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের

জীবনোপায়-স্বরূপ স্বীয় আরক্ত পাদপদ্ম-যুগলের উল্লাস বর্দ্ধন করত যিনি শোভমান, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

অতুল-বিলসদঙ্গশ্রেণি-বিন্যাস-ভঙ্গ্যা
গ্লপিত-মদনকোটি-স্ফার-সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তিঃ।
বললব-হত-মত্তাপার-পারীন্দ্রদর্পঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৭ ॥

যাঁহার অতুল বিলাসান্বিত অঙ্গশ্রেণীর বিন্যাস-ভঙ্গীতে কোটি কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-কীর্ত্তি গ্লানিযুক্ত হইয়াছে এবং যিনি শক্তিলেশদ্বারা মত্ত অথচ অপরিসীম বলসম্পন্ন সিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

তরণি-তুহিতৃ-কচ্ছে স্বচ্ছ-পাথোদধামা
সমুদিত-নব-কামাভীর-রামাবলীনাম্।
তড়িদতি-রুচিবাহু-স্ফুর্জ্জদংসোঽতিজৃম্ভন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্ব কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৮ ॥

রবিতনয়া যমুনার তীরভূমিতে যাঁহার কান্তি মেঘ-সদৃশ এবং অভিনব সমুদিত কামী গোপরমণীদিগের বিদ্যুদ্বিজয়ী ভুজোপরি যাঁহার স্কন্ধদেশ অতিশয় শোভমান হইতেছে, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

নব-তরুণিম-ভট্টাচার্য্য-বর্য্যেণ শাস্ত্রং
মনসিজ-মুনি-ক্লপ্তং ন্যায়মধ্যাপিতাভিঃ।
নব নব-যুবতীভির্বিভ্রদ্‌গ্রাহমস্মিন্
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ১৯ ॥

অভিনব যৌবনরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাঁহাদিগকে কামমুনি-রচিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন, তাদৃশ নব নব যুবতীগণের সহিত যিনি এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রাগ্‌লভ্য বিচার করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

রতিমতি-রচয়ন্ত্যা রাধিকা-নর্ম্মকান্ত্যা
স্বগিত-বচনদর্পঃ স্ফারিতান্য-প্রসঙ্গঃ।
খরমিতি ললিতাস্যে কিঞ্চিদঞ্চৎ-স্মিতাক্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীরাধিকার অত্যুৎকৃষ্ট রতিকারিণী নর্ম্মকান্তি-কর্ত্তৃক বচন-দর্প খর্ব্বীকৃত হওয়ায় যিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন এবং যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ললিতার বদনে স্বল্প প্রকাশমান মধুরহাস্য-শোভিত নেত্র নিক্ষেপ করিতেছেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

সবিধ-রমিত রাধঃ সাগ্রজ-স্নিগ্ধরূপ-
প্রণয়-রুচির-চন্দ্রঃ কুঞ্জখেলা-বিতন্দ্রঃ।
রচিত-জন-চকোর-প্রেমপীযূষ-বর্ষঃ
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপি গোপাল এষঃ ॥ ২১ ॥

যিনি নিকটে শ্রীরাধাকে ক্রীড়া করান এবং অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর সহিত বর্ত্তমান 'রূপ' গোস্বামীর প্রণয়-কুমুদের প্রকাশার্থ যিনি চন্দ্র-স্বরূপ, যিনি কুঞ্জক্রীড়ায় নিরলস এবং যিনি জন-রূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করেন, এই সেই অনির্ব্বচনীয় মদনগোপাল বিরাজ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

মদনবলিত-গোপালস্য যঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি সুমতিরুদ্যৎ দৈন্য-বন্যাভিষিক্তঃ।
স খলু বিষয়-রাগং সৌরি-ভাগং বিহায়
প্রতিজনি লভতে তৎপাদ-কঞ্জানুরাগম্ ॥ ২২ ॥

সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি সমুদিত দৈন্যরূপ জলে অভিষিক্ত হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত দৈন্য-সহকারে মদনগোপালের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যপুত্র যমের অধিকারযোগ্য বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করত প্রতিজন্মে শ্রীমদনগোপালের পাদপদ্মে অনুরক্ত হন ॥ ২২ ॥

প্রশ্নোত্তর

পারমার্থিক সাহিত্য

১। 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কিরূপ কাব্য? এই গ্রন্থের সমালোচনায় কাহাদের অধিকার?

"গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এরূপ কাব্য-গ্রন্থ আর নাই। সাধারণ সমালোচকগণ প্রাকৃত

রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। জয়দেব-কবি সেইসকল সমালোচককে তাঁহার নিজ-গ্রন্থ সমালোচনার জন্য অর্পণ করেন নাই বরং তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে জয়দেবের সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয়-মাত্র।"

—'সমালোচনা (শ্রীগীতগোবিন্দ), সঃ তোঃ ৭।২

২। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম কি? শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব কি প্রকৃতির অধীন?

"শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থের মর্ম্ম অতি গূঢ়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চগত হইলেও ইহাতে প্রপঞ্চ-গন্ধমাত্র নাই। জীবের মঙ্গলের জন্য এই অতি-পবিত্র রসলীলা সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিক্রমে জড়জগতে ব্রজের সহিত অবতারিত হইয়াছে। মানবের জড়শরীরে যে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ দেখা যায়, সে অতি ঘৃণ্য। চিৎশরীরে জীবের যে গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও কৃষ্ণসঙ্গ লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

৩। ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ ভাগবতী-সম্প্রদায়ের পরমাদরের বস্তু কেন?

"কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-পূজিত শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। তত্ত্ব-সন্দর্ভ—প্রথমাংশ, ভগবৎ-সন্দর্ভ—দ্বিতীয়াংশ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ—তৃতীয়াংশ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—চতুর্থাংশ, ভক্তি-সন্দর্ভ—পঞ্চমাংশ এবং প্রীতি-সন্দর্ভ—ষষ্ঠাংশ। শ্রীমদ্ভাগবতী-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

৪। গ্রাম্য ও পারমার্থিক সংবাদপত্রের পার্থক্য কি? পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনার চমৎকারিতা কাহার নিকট প্রতিভাত?

"যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখবিধান করেন, তাঁহারা জড়-বিষয়ে বিচিত্র নূতন-কথা বলিতে পারেন; হরিকথা সেরূপ নয়। হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়। হে পাঠকবর্গ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে মহাজনগণের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। এই পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে

প্রতি সংখ্যায় পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তিরস-বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এক-এক ফর্ম্মায় প্রকাশ করা উচিত বোধ করি। খোসগল্প যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব-রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার খোসগল্পময়, ইহার মধ্যে শ্রীসজ্জনতোষণীর যে হরিভক্তিতত্ত্ব ও লীলা-বর্ণন স্বল্পাক্ষরে পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এ বিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ?

আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ পান, তাঁহাদিগের পূর্ব্বসাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ-রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থের রস প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখ বৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজ রচনা বা নবীন প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মূল-তাৎপর্য্য এই যে,—'আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব্ব-মহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করতে পারি ; কিন্তু এই ভ্রমটি যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না। মহৎ লোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না। তাঁহারা বিরল, সুতরাং শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা-পাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্যে ও রচনায় সুখ বোধ করা কেবল দুগ্ধাভাবে ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছি' মনে করা মাত্র।

আমাদের নিকট পূর্ব্বমহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা অন্য কিছুই মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রীভাগবতামৃত' গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।"　　—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

৫। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরই কি বঙ্গভাষার আদি কবি ?

"শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বটে। গীতি রচনায় তৎপূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কাব্য রচনা করেন নাই। শ্রীমালাধর বসুর গ্রন্থ 'কৃষ্ণমঙ্গল' (কৃষ্ণবিজয়) গীতি-মধ্যে পরিগণিত আছে।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, —শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস' প্রবন্ধ।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন্ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়? 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় কেন?

"গোস্বামী মহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামী মহোদয়-দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃত রচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীকবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্' এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক্ বিচারপূর্ব্বক আমরা শ্রীচরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

৭। উপন্যাসাকারেও হরিকথা-প্রসঙ্গ-শ্রবণে জীবের কোন মঙ্গল লাভ হয় কি?

"আজকাল লোকেরা উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন। উপন্যাসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কেন না, বিষয়ীদের চিত্তে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বকথা প্রবেশ করিতে করিতে চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।১২

৮। সহজিয়া-পুঁথিগুলিকে বিন্দুমাত্রও আদর করা উচিত কি?

"অমৃতরসাবলী গ্রন্থখানি আবার সহজিয়া-পুঁথি। ইহাতে লেখা আছে :—'সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হৈল।'

এই প্রকার পুস্তিকা বাউল ও সহজিয়াদিগের নিকট অনেক আছে। আমরা কোনও সময় পুস্তক অন্বেষণ করিতে গিয়া এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক পাইয়া-ছিলাম। পড়িতে পড়িতে ঘৃণা হইল, গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া পবিত্র হইলাম।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।১

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

রাধাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা যদি আমাদের চেতনের ভূমিকায় জন্মগ্রহণ করেন, তবেই আমরা রাধানাথের সেবামাধুরীর চমৎকারিতা বুঝিতে পারিব। তিনি যদি জন্মগ্রহণ করেন, তবে জানিতে পারিব যে, তিনি নন্দ-যশোদা হইতেও বড়। ইহাদ্বারা নন্দ-যশোদার কিছু অপূর্ণতা প্রকাশিত হইতেছে না। চেতনের জগতে এইরূপ অপূর্ণতার প্রকাশ নাই। সেখানে কেবল রসচমৎকারিতার তারতম্য।

'রাধিকার দাস্য' বলিতে গেলে নন্দ-যশোদার দাস্য, সখাগণের দাস্য প্রভৃতি বাদ যায় না। যাঁহারা যমুনার জলে স্নান করিয়াছেন, যাঁহারা রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য আছে। আপনাদের আত্মবৃত্তির বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়া যখন প্রাপ্তবয়স লাভ হইবে, তখনই আপনারা রাধাদাস্যটি কি, জানিতে পারিবেন।

শ্রীরাধিকার কথা সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যের কথা। রাধিকা যদি তাঁহার শক্তি delegate করেন, তবেই পৃথিবীর যাবতীয় নারী, স্বর্গের যাবতীয় দেবী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ও গোলোকের অসংখ্য গোপী প্রকাশিত হইতে পারেন। পঙ্গু, অন্ধ আমি এত বড় বড় কথা কি করিয়া জানিব? কিন্তু আমার মস্ত বড় ভাণ্ডার আছে। রাধা-মদনমোহনের যুগলিত স্বরূপের যে চারিখানা পা, সেই চারিখানা পা যিনি নিত্যকাল তাঁহার শিরোভূষণ করিয়াছেন, সেই মহান্তগুরুর পাদপদ্মই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিষয় জানিবার আমার একমাত্র আশ্রয়। সেই গুরুপাদপদ্মের চরণধূলি মস্তকে লইয়া আমি যে সাম্রাজ্য গঠন করিব, তাহাতে জড়ের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দূরের কথা, মুক্তিদাতৃগণের সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রভৃতিও আমার আকাঙ্ক্ষণীয় হইবে না। অধিক কি, নারায়ণের দাস্যলাভের আশাও আমাকে শ্রীরাধাজনের পদরেণুলাভের আশা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

শ্রীরাধিকা কি করিয়া কৃষ্ণভজন করেন, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-অবতার। রাধিকা উপদেশকরূপে এদেশে আসেন না। কারণ, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ যখন এক হইয়া যায়, তখন শ্রেয়ঃ ও প্রেমের যুগলমিলন হয়।

তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। তখনই শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ, প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ হয়।

উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, গীতা—এই সকল **infant primer**. ইঁহাদের মধ্যে পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বোত্তমা কথার পূর্ণ বিকাশ থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শুনিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল **infant primer**কে রাধাগোবিন্দের সেবায় লাগাইতে পারেন। সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বৃষভানুনন্দিনী, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুতা—তাঁহার কুণ্ডে স্নান।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু।

শ্রীবার্ষভানবী এখন নাই, তাহা নয়। এখন তাঁহাকে কোথায় পাব? এখনই আমরা তাঁহাকে পাইতে পারি, তাঁহার সেবা করিতে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তাহা হইলে শ্রীবার্ষভানবীকে এখন কোথায় পাব, এইরূপ বিচার নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখসেবা আমরা লাভ করিতে পারি। মধুররসে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা অভিন্ন-বার্ষভানবী।

শ্রীনন্দলালের জন্মকথা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

যাদবগণের কংস হইতে ভয় উৎপন্ন হইতেছে জানিয়া শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে উৎসাহ দিয়া আদেশ করিয়া বলিলেন,—"হে দেবি! হে ভদ্রে! তুমি ব্রজধামে গমন কর। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীদেবী গোকুলে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অন্যান্য ভার্য্যাগণও কংসভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। তুমি সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক দেবকীর সপ্তম গর্ভে আমার যে অগ্রজ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতে সপ্তম মাসে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবে। তারপর আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এখানে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—অংশভাগে অর্থাৎ অংশাংশরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, সর্ব্বাংশে নহে। এইজন্যই শ্রীদেবকী আমাতে ঐশ্বর্য্যভাবময়

বাৎসল্য করিবেন, ইহাই ভাবার্থ। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে আমার সম্পূর্ণ প্রীতি হয় না। সুতরাং ঐশ্বর্য্যভাবশূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্যসুখ আমি একমাত্র শ্রীযশোদাতে প্রাপ্ত হইব, ইহাই সূচিত হইয়াছে। "যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসি" অর্থাৎ 'যশোদার গর্ভে সম্যগ্‌রূপে পুত্রত্বী প্রাপ্ত হইবে'—ইহা না বলিয়া "যশোদায়াং ভবিষ্যসি" অর্থাৎ 'যশোদাতে উৎপন্ন হইবে মাত্র'—ইহা বলিবার কারণ এই যে, তুমি (যোগমায়া) যশোদার দুহিতা হইলেও যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবেন না ; যেহেতু তুমি অলক্ষ্যবিগ্রহ-স্বরূপেই ব্রজে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যোগমায়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করিবার কালে দেবকীর গর্ভাকর্ষণ-জনিত কোন কষ্ট বা রোহিণীর উদরে গর্ভস্থাপনজন্য রোহিণীর বিস্মরাদি কিছুই হয় নাই। পুরবাসিগণও অপর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কেবল আর্ত্তনাদে "হায়! হায় এবার কংসভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হইল কিংবা বোধ হয় কংসই কোন মন্ত্র বা ঔষধাদিদ্বারা গর্ভ নষ্ট করিয়াছে"—এইরূপ সন্দেহে রোদন করিতে লাগিলেন।

যোগমায়া সঙ্কর্ষণকে রোহিণীর গর্ভে কিরূপে সংক্রামিত করিলেন? তদুত্তরে শ্রীহরিবংশ বলিতেছেন,—রোহিণী অর্দ্ধরাত্রে গাঢ়নিদ্রাদ্বারা অভিভূতা হইয়া শয়ন করিলে তাঁহার গর্ভ নিপতিত হয়। রোহিণী স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় গর্ভকে নিপতিত হইতে দেখিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জাগরিত হইয়া সত্য সত্যই তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। রোহিণী উদ্বিগ্না হইলে নিদ্রাদেবী (যোগমায়া) তাঁহাকে বলিলেন,—"হে শুভে! দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হইয়া তোমার গর্ভে স্থাপিত হইল ; অতএব তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন।"

যখন ভগবান্ শ্রীবলরাম দেবকীর সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করিলেন, তখন বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণী দেবীরও গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কংসের ভয়ে বসুদেব রোহিণীকে গোপনে গোকুলে নন্দের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দেবকীর অপ্রাকৃত গর্ভাকর্ষণ মাঘমাসে ঘটে। দেবকীর গর্ভে প্রবেশকাল হইতে রোহিণীর গর্ভে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত গণনায় চৌদ্দমাসে শ্রাবণী-পূর্ণিমায় শ্রীবলরাম জগতে প্রকট হন। শ্রীরোহিণীদেবী এই শ্রীবলদেবস্বরূপের নিত্যমাতা। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইবেন, জানিয়া শ্রীবলদেব অগ্রেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং শয্যাসনাত্মক নিজ অংশ শেষকে তথায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং নিজমাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবের শুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত হইলেন। বৈধ-দীক্ষা-বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্ শ্রীহরি স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গভীর নিশীথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—যদিও অষ্টমীর চন্দ্র পূর্ণরূপে উদিত হয় না, তথাপি স্বীয় বংশে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইতেছেন দেখিয়া আনন্দে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উদিত হইলেন এবং সেইকালে ভগবান্‌ও সর্ব্বাংশে পূর্ণরূপে কলাদির সহিত প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীহরি অন্য বালকের ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই, কিন্তু কংসাদি অসুর-বিমোহনের জন্য গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতে অষ্টমমাসেই শ্রীদেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীবসুদেব দেখিলেন—এই বালক বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার নয়ন দুইটী নীলপদ্মের তুল্য মনোহর, তিনি চতুর্ভুজ এবং সেই ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবসন, বর্ণ জলধরশ্যাম হইতেও সুন্দর। তাঁহার রূপের ছটায় কারাগার আলোকিত। শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন এবং কৃষ্ণাবতার-মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইয়া সানন্দে মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করিলেন। শ্রীবসুদেবের বিস্ময়ের চারিটী কারণ সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—(১) ভগবদ্দর্শন মহামুক্ত মুনিগণেরও দুর্ল্লভ, কিন্তু তাহা কিরূপে অবিদ্যামুগ্ধ কংসকর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ মাদৃশ জীবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? (২) যিনি সর্ব্বব্যাপক পরম ব্রহ্ম, তিনি মানবীর গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? (৩) সকলেরই পুত্র বস্ত্রালঙ্কার-বর্জ্জিত উলঙ্গাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু এই বালক শঙ্খ-চক্রাদি বিবিধ অস্ত্র ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা আবার কিরূপ? (৪) যিনি মহাকালের কালস্বরূপ সাক্ষাৎ আদিপুরুষ ভগবান্, তিনি কি আমাকে কংসভয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন?

যখন ভগবান্ শ্রীহরি নিজ অলৌকিক দিব্যপ্রভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত করিতেছিলেন, তখন বসুদেব ঐ পুত্রকে পরমপুরুষ জানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে নির্ভয়ে নানাভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবসুদেবের স্তব শেষ হইলে কংসভীতা শ্রীদেবকী পুত্রে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবকী ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিলেন,—পাপী কংস

যেন আমাতে তোমার জন্ম জানিতে না পারে। আমি তোমার জন্য কংসভয়ে ভীতা ও অস্থির চিত্তা হইয়া পড়িয়াছি। তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ গোপন কর। তখন ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মাতঃ! আমি কেবল এই জন্মে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু জন্মান্তরেও তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি। প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি ছিলে; তৎকালে এই শুদ্ধচিত্ত বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টির জন্য আদেশ করিলে, তোমরা ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। মদ্গতচিত্তে এইরূপ কঠোর তীব্র তপস্যা করিতে করিতে দ্বাদশ সহস্র দৈববর্ষ গত হইয়াছিল। তখন আমি তোমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট বর প্রদানার্থ তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া 'বর প্রার্থনা কর' এই কথা বলিলে, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। দ্বিতীয় জন্মে তুমি অদিতি ও বসুদেব কশ্যপ-রূপে আবির্ভূত হইলে আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া উপেন্দ্র নামে খ্যাত হই। আমি খর্ব্বাকৃতি ছিলাম বলিয়া লোকে আমাকে 'বামন' বলিত। তোমাদের তৃতীয় জন্মে সেই আমিই এই চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজরূপ দেখাইলাম। তাহা না করিলে মনুষ্যরূপ দেখিয়া তোমরা কখনই চিনিতে পারিতে না।

শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ নিজরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীতোষণী বলেন,—প্রকৃতি-স্বভাব; প্রাকৃত—লোক (নর) স্বভাববিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত-শব্দে প্রকৃষ্ট আকৃত, আকৃতি—আকার অর্থাৎ দ্বিভুজত্বরূপ লক্ষণ যাঁহার তদ্রূপধৃক্। শিশু—নবজাতক নরবালক প্রতিম; অতএব মনোহরণকারী বলিয়া তিনি হরি। তাঁহার শঙ্খ-চক্রাদি দিব্যাস্ত্রসমূহের সংগোপন এবং নাভিনালাদির সহিত বিদ্যমানতাও দ্রষ্টব্য। অন্যথা গোকুলবাসিগণের অতিশয় বিস্ময়াদির উৎপত্তি হইত। নাভিসহ বিদ্যমানতাই অশৌচলক্ষণ। তদ্ধেতু শ্রীনন্দকর্ত্তৃক পশ্চাদ্ বক্ষ্যমান (পুত্রোৎসবে) দানাদিরও যুক্তিযুক্ততা দৃষ্ট হয়। পিতামাতার সাক্ষাতে অর্থাৎ অবিলম্বে অথবা তাঁহার মায়ার পরমাশ্চর্য্য শক্তি দর্শিত হইয়াছে অথবা তাঁহাদের দৃষ্টিতে তাদৃশ অর্থাৎ দ্বিভুজ হইলেন। তাঁহারা চতুর্ভুজমূর্ত্তি-সকলকে অধিকতর অস্নিগ্ধ মনে করেন। দ্বিভুজরূপের অবিদ্যমানতায় তাঁহার চতুর্ভুজরূপটীই দিব্যরূপ জানিতে হইবে। কেহ কেহ ইহার তাৎপর্য্য এইরূপও

বলেন যে, পূর্ব্বে শ্রীবাসুদেব দ্বিভুজ নরবালকরূপেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর পিতামাতার নিকট নিজ জন্ম ব্যক্ত করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার ভগবত্তা জ্ঞাপনের জন্য তিনি দিব্যরূপ হইলেন। অতএব প্রথমে অদ্ভুতরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, পরে প্রাকৃত—স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ দ্বিভুজ ছিলেন, সেইরূপ দ্বিভুজ হইলেন, ইহাই মর্ম্ম।

ভগবান্ স্বভাবসিদ্ধ বালকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে শ্রীবসুদেবের পদের শৃঙ্খল স্খলিত হইয়া গেল। ভগবান্ আজ্ঞা করিলেন যে,—যদি তুমি কংসকে ভয় কর, তাহা হইলে আমাকে নন্দগৃহে রাখিয়া, আমার মায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর। এই আদেশে যখন শ্রীবসুদেব পুত্রকে কোমল বস্ত্রাবৃত পেটিকার মধ্যে রাখিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক সানন্দে সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করিলেন। সেইসময় ভগবানের যোগমায়া জন্মরহিত হইয়াও নন্দ-জায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—ইহাতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেই যোগমায়ার নন্দালয়ে আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হরিবংশে উক্ত হইয়াছে, দেবকী ও যশোদা অসম্পূর্ণগর্ভকালে অর্থাৎ অষ্টম মাসের একই সময় প্রসব করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ নিশ্চয় হয় যে, যে-সময় দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, ঠিক সেই সময়েই যশোদাও অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে, পরে যোগমায়াকে প্রসব করিয়াছিলেন।

একই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দগৃহেও যোগমায়ার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে নন্দালয়ের কেহই তাঁহার সে আবির্ভাব জানিতে পারেন নাই। ভগবানের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীবসুদেব পুত্রকে লইয়া গোকুলে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল। কারাগৃহের দ্বারগুলি নিজে নিজে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়া বারি বর্ষণ করিতেছিল, অনন্তদেব নিজের ফণার দ্বারা ছত্রের ন্যায় বৃষ্টি হইতে বাসুদেব কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অতিশয় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও বসুদেব অনায়াসে যমুনা পার হইলেন। সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিল, সেইরূপ যমুনাও বসুদেব নিকটস্থ হইলে অতি সহজেই পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব যমুনা পার হইয়া গোকুলে উপস্থিত হইলেন। নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যোগমায়া-প্রভাবে সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, দ্বারসকল উন্মুক্ত। বসুদেব তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া পুনরায় যমুনা পার হইয়া

কংসের কারাগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কন্যাটীকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। তখনই পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ ও কারাগৃহের কপাটসমূহ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সমস্ত কার্য্যই যখন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন অবসর বুঝিয়া কন্যা ক্রন্দন করিলেন। সদ্যপ্রসূত শিশুর রোদনধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিয়া প্রহরীসমূহ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল ও কংসের নিকট গিয়া দেবকীর সন্তানপ্রসবের কথা জানাইল। কংস তৎক্ষণাৎ সূতিকাগৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। কংসকে দেখিয়া দেবকী অতিশয় করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"এই কন্যাটী তোমার পুত্রবধূ হইবে। উহাকে মারিয়া স্ত্রীবধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার ছয়টী শিশুকে হত্যা করিয়াছ, এইবার এই শেষ কন্যাটীকে রক্ষা কর।"

কংস ইহাতে দেবকীকে আরও অধিক তিরস্কার করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে কন্যাটিকে কাড়িয়া লইল ও সদ্যোজাত শিশুকন্যার পদদ্বয় ধরিয়া একটী শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যাটী তৎক্ষণাৎ কংসের হস্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে দিব্য অষ্টভুজারূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার আটটী হস্তে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ছিল। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপহার লইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কংসকে ডাকিয়া বলিলেন, —"আমাকে মারিতে পারিলেই বা তো'র কি হইত? তো'কে যিনি হত্যা করিবেন, তিনি অন্য কোন স্থানে জন্মিয়াছেন।"

প্রসববশতঃ পরিশ্রান্তা নন্দপত্নী যশোদা যোগমায়াবলে অপহৃতস্মৃতি হওয়ায় কেবলমাত্র সন্তান প্রসূত হইয়াছে, এইমাত্র জানিতে পারিলেন, কিন্তু পুত্র কি কন্যা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীযশোমতী নিজ পুত্রকে পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দানুভব হইয়াছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে যে, কংস হইতে মিত্রকন্যাকে বধ করাইয়া নিজ পুত্রকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করা কি বসুদেবের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ মহাত্মার পক্ষে বিহিত হইয়াছে? তদুত্তর এই যে,— "বসুদেব অন্যায় করেন নাই, বরং ধার্ম্মিকের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন; কারণ পুত্ররূপী ভগবানে তাঁহার এরূপ প্রবল স্নেহ জন্মিয়াছিল যে, তিনি সেইসকল বিষয় ভাবিবার কিছুমাত্র সময়ই পান নাই। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, তিনি ভগবানের আজ্ঞাক্রমেই এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে অন্যায় হয় নাই। বরং তিনি যদি ঐরূপ কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে ভগবানের আজ্ঞা-লঙ্ঘনজনিত পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিত।

কোন কোন ভাগবত বলেন,—কৃষ্ণ বসুদেব ও নন্দ উভয়ের আত্মজ অর্থাৎ কেবল বসুদেবের আত্মজ এবং নন্দের পালিত-পুত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, মথুরায় বসুদেব-গৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব এবং গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে আগমনপূর্ব্বক যখন যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যাটীকে লইয়াই তিনি মথুরায় আগমন করিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—শ্রীযোগমায়া রোহিণীর সপ্তম মাসের গর্ভ আকর্ষণ করিয়া দেবকীর সেইরূপ সপ্তমাসিক গর্ভ তাহাতে যোজনা করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দশমাসে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত-কালে রোহিণী পরমশোভাবিজয়ী শুভ্রশালী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। এই বালকের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য গুপ্তভাবে সম্পন্ন হইল। ঐ বালক জন্ম হইতে কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্ম পর্য্যন্ত জড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেবল শ্রীব্রজেশ্বরী যখন শ্রীকৃষ্ণকে মনোমধ্যে ধারণ করেন; সেই সময় তাঁহার ক্রোড়দেশে বলদেব গমন করিলেই লোকে তাঁহাকে উল্লসিতের ন্যায় লক্ষ্য করিতেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী-তিথিতে বুধবারে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীযশোমতীর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রিতে সমস্ত দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সেই সময় অনেক অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমতী যশোদা প্রসবজ্ঞান ব্যতীতই শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন। কত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার যে ঘটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আচার্য্যগণ তাহাতে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন না; কেননা, তাঁহারা জানিতেন, সর্ব্বাশ্চর্য্যের নিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগমায়া বাল্যশরীর ধারণ করিয়া কেবলমাত্র সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের কৃপামূলক আনুকূল্য বিধান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার সূতিকা-শয্যায় অগ্রজ করিয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহার পর সকলে দেখিতে পাইলেন, শ্রীবিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী অষ্টভুজারূপে প্রতিভুজে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন।

শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীর অন্তরে যে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপ স্ফূর্ত্তি পাইতেন, তাহাই বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার শ্রীব্রজেশ্বর ও শ্রীব্রজেশ্বরীর অন্তরে যে কেবল দ্বিভুজ-মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেন, তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন নৃশংস কংসের ভয়ে নিজদেহাবির্ভূত চতুর্ভুজরূপের আচ্ছাদন-পূর্ব্বক দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকীর ইচ্ছা হইল, ঠিক

সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব দ্বিভুজরূপ যোগমায়ার সহিত শ্রীযশোদার অন্তরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই দ্বিভুজরূপেই দেবকীর শয্যাতে সন্নিধানপ্রাপ্ত হইয়া এবং চতুর্ভুজকে অন্তরে আবৃত করিয়া যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। যশোদাপুত্রের তথায় সংস্থাপন ও চতুর্ভুজ-রূপের আবরণকার্য্য-বিষয়ে মায়া সাকার-রূপে যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকারভাবে ঊর্দ্ধগতিশীল শরীর অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন। যোগমায়া যশোদার পুত্রকে সকলের অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিয়া মথুরাপুরে লইয়া গেলেন ও যশোদাকে বিমোহিত করিলেন। সেই যোগমায়াই গর্ভস্থিত আকারের দ্বারা জননীর প্রসব-ভ্রমবিস্তার এবং সেই বাহ্যরূপ প্রকটিত করিয়া প্রসূতিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যোগমায়া স্বয়ংই অপ্রাকৃত জগৎকে এবং নিজ অংশভূতা জড়মায়ার দ্বারা প্রাকৃত জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন। 'কার্য্য' দুই প্রকার – যোগমায়ার কার্য্য ও জড়মায়ার কার্য্য। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ তথা যশোদাকে নিদ্রাভিভূত করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। জড়মায়া নিজ নিয়ন্তা বলভদ্রকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিতে সমর্থা নহে। দেবকীকন্যারূপে কংসবঞ্চনাদি কার্য্য জড়মায়ার, যোগমায়ার নহে। কারণ এতাদৃশ দুষ্টলোকদিগকে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে ১১শ অধ্যায়ে জড়মায়া স্বয়ং বলিয়াছেন,—"বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশযুগ উপস্থিত হইলে আমি নন্দগোপের আলয়ে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব এবং বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া আমি সেই দুইজনকে নাশ করিব।" রাসাদি ভগবল্লীলা-সম্পাদনার্থ ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতি, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়গণের মোহন যোগমায়ার কার্য্য, জড়মায়ার নহে। "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই ভাগবত-বচনই ইহার প্রমাণ। শাল্বাদি অসুরগণ এবং দুর্য্যোধনাদি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ভগবানের গরুড়বাহন বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও ইনি ঈশ্বর নহেন, এইরূপ বুদ্ধিতে মোহিত হইয়াছিল। এইরূপ মোহনকার্য্য জড়মায়ারই জানিতে হইবে। শাল্বাদি ধৃষ্ট-যাদব-বিমোহনক্রিয়াও জড়মায়ার। এক্ষণে বিমুখ-মোহন-ক্রিয়া জড়মায়ার এবং উন্মুখ-মোহন-ক্রিয়া যোগমায়ার, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। চিন্ময় ধামের বাৎসল্যরসের পরমরসিক নন্দ-যশোদাদির বরুণলোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যদর্শনান্তেও বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্য-প্রযুক্ত যে সম্ভ্রমজ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা যায়, উহা যোগমায়া বা জড়মায়ার কার্য্য নহে, কিন্তু উহা প্রেমেরই স্বভাব।

প্রকৃত বন্ধু কে ?

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পক্ষে একাকী বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। একাকীত্ব অর্থাৎ নিঃসঙ্গতার জ্বালা তাহার নিকট দ্বীপান্তরে কঠোর সশ্রম কারাবাসের ন্যায় দুর্ব্বিসহ মনে হয়। তাই সে পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকে, মনের সকল গোপন কথা বলিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক বন্ধুর প্রয়োজন হয়। বন্ধুহীন জীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। 'বন্ধু' শব্দে সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়কে বুঝায়। বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র, সখা প্রভৃতি সমার্থক শব্দ হইলেও প্রত্যেকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

"প্রণয়াস্পদদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপরের ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বন্ধু; যিনি অন্যতরের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যে দুইজনের একবিধ ক্রিয়া, তাঁহারা পরস্পর মিত্র এবং যিনি অন্যতরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা।" দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। দার্শনিক **Aristotle** এর ভাষায় "**Friendship is a single soul dwelling in two bodies.**" বন্ধুতা প্রায়শঃ সমস্বভাব-সমমতাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। একজন প্রকৃত বন্ধু আদর্শ জীবন সংগঠনের পক্ষে প্রধান সহায়ক। তাই প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—"**A good friend is a link in the chain of life.**"

নিজ দুরভিসন্ধি-সাধনে ব্যস্ত বন্ধু কপট ও মহানিষ্টকারক

সুসময়ে অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রচুর পরিমাণ থাকিলে বন্ধু-বান্ধবের কোন অভাব হয় না, হাজার হাজার বন্ধু এমনিতেই জুটিয়া যায়। অসময়ে অর্থাৎ কপর্দকশূন্য অবস্থায় পৌঁছাইলে স্বার্থান্বেষী বন্ধুর দল একে একে সরিয়া পড়ে। তাই ত' প্রচলিত বাক্যে পাওয়া যায়,—

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়॥

ইহ জগতে আজ যে পরম বন্ধু, দুইদিন পরে সেই আবার ঘোরশত্রু হইয়া

দাঁড়াইতে পারে। নকল তথা কপট বন্ধু পরম বন্ধুর ছদ্মবেশে সাধারণ লোকের চরম সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মহোপকার যেরূপ প্রকৃত বন্ধুর দ্বারা সাধিত হয়, তদ্রূপ কপট বন্ধুর দ্বারা মহা-অনিষ্ট সাধিত হয়। লোকের সুসময়ে সুযোগসন্ধানী কপট বন্ধুগণ ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই কুটিল মনের অন্দরমহলে লুক্কায়িত প্রয়োজন-সিদ্ধি করিয়া লয়। কপট বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে গিয়া কত লোকের যে বিরাট্ ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কপট বন্ধুর উপদেশানুসারে চলিলে নরকের দ্বার পরিষ্কার হওয়া ব্যতীত কোন মঙ্গললাভ সম্ভবপর হয় না। নিজের স্বার্থে যে বন্ধুগণের অনিষ্ট করিতে দ্বিধাবোধ করে না, তাহার নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। বিপদে পড়িলেই কে প্রকৃত বন্ধু, কে নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কার্য্যের দ্বারাই যথার্থ বন্ধুর পরিচয় মেলে। এই বিষয়ে "দুই বন্ধু ও এক ভল্লুকের কাহিনী ত' কাহারও অজানা থাকার কথা নয়। জাগতিক বন্ধুগণের (প্রকৃত বন্ধু নহে) পরস্পর বিরোধে শত্রুদেরও পরম উল্লাস প্রকাশ করিতে দেখা যায়—"Quarrels of friends are the opportunities of foes." ব্যবহারের দ্বারাই শত্রু-মিত্রের পরিচয় মিলিয়া থাকে। যিনি পরমার্থ-ধন লাভের বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি যথার্থ বন্ধু এবং তাঁহারই সাহচর্য্যের জন্য সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। নীতিবাদিগণ যাহাকে 'প্রকৃত বন্ধু' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, বাস্তবিকপক্ষে তিনি কিন্তু তাহা নহেন। নীতিবাদিগণের মতে,—"যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দলাভ করেন, যিনি আমাদের জাগতিক কল্যাণ কামনা করেন এবং আমাদের জাগতিক মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত হইয়া আপনার বিপদকে ডাকিয়া আনিতেও প্রস্তুত, তিনি প্রকৃত বন্ধু।" নীতিবাদিগণের প্রকৃত বন্ধুর দ্বারা জাগতিক লাভ হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থ ধন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ কখনও কিছুতেই সম্ভবপর নহে, যেহেতু এই বন্ধুর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত কোন সম্পর্কই নাই।

ভক্তবন্ধুই প্রকৃত বন্ধু, যেহেতু তাঁহার কৃপাবলে পরমবন্ধু শ্রীহরিকে অতি সহজেই লাভ করা যায়

ইহজগতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত আমাদের প্রকৃত ও নিত্যসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানই আমাদের আপনজন তথা পরমবান্ধব। তাই কোন বৈষ্ণব কবি "প্রেমের ঠাকুর গোরা"র উদ্দেশ্যে গাহিয়াছেন, —"তব নিজজন পরমবান্ধব সংসার কারাগারে।" সকল শাস্ত্রই প্রকৃত প্রীতির পাত্র গুরুবৈষ্ণবগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। গুরুবৈষ্ণবগণ ব্যতীত বন্ধু-অভিমানিগণের নিকট কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-

তর্পণ তথা ভোগের কথাই শুনিতে পাওয়া যাইবে, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণকথা বাদ দিয়া অনিত্য জড়ভোগের কথা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। বন্ধুব্রুবদের সঙ্গ করিলে হরিভজন করিবার পিপাসা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, প্রজল্প করিবার পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং পাপ-প্রবৃত্তি কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। যাহাদের উপকার বা উপদেশের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এমনকি, মাতা-পিতা-আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকেও আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলা যাইবে না, যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবায় নিয়োগের উপদেশ প্রদান না করিয়া মায়ার ভজন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দেন। যিনি কৃষ্ণভক্তি দিতে পারেন, কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশীভূত, তিনিই পতিত জীবের একমাত্র পরমবন্ধু। তাই স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু, তাঁহার সঙ্গ বাদ দিয়া একাকী থাকিবার চেষ্টা করিলে মায়ার চরের কবলে কবলিত হইয়া নানাপ্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। হরিভক্ত-বন্ধুর সঙ্গ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। জীবের প্রকৃত বান্ধবগণ নিজেরা হরিভজন করেন এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকলের হরিভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য —এইকথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া জীবের চরম উপকার করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে ভগবানের দীনবন্ধু, প্রাণবন্ধু, জগদ্বন্ধু, ভক্তবৎসল প্রভৃতি অনেক নামই উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীহরি ভক্তেরই অধীন বলিয়া তাঁহার নাম 'ভক্তবৎসল'। তাই ভক্ত-বন্ধু ব্যতীত নিত্য পরমবন্ধু শ্রীহরিকে লাভ করা যায় না। ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইবার জন্য ঐকান্তিক ভক্তের ডাকে ভগবান্ সাড়া দেন এবং তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন না।

অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভক্ত-বন্ধুত্ব পদবী লাভ করেন। বিপদের সময়ে হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিয়া দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, শোকের দীর্ঘ-নিশ্বাস কমাইতে, তাপিত প্রাণ জুড়াইতে ভক্তবন্ধু ব্যতীত জগতে আর কেহই নাই। যেদিন আমাদিগকে এই ধরণী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সেইদিন ইহ জগতের বন্ধু-বান্ধব, ধনরত্নাদি 'কছুই আমাদের সঙ্গে যাইবে না অথবা কেহই আমাদিগকে এখানে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ভক্ত-বন্ধু ব্যতীত কেহই সেই সময় দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে সাহায্য করিবেন না।

যাঁহারা বৈষ্ণবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া হরিসেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন

তাঁহাদের জীবন সার্থক। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়,—"সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।" ভক্তের নিকট দুস্তর ভবসমুদ্র গোষ্পদতুল্য প্রতীয়মান হয়। প্রাণবন্ধু শ্রীহরির অভয় পাদপদ্মে ধন-জনাদি যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বৃথাই আমরা মায়ানিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছি। সময় থাকিতেই শ্রীহরির নিজজন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মায়ানাশক হরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বজীব-বান্ধব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, —

তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম-মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি'॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৭ পৃষ্ঠার পর]

পথ চলিতে চলিতে একদা কোন এক দেওয়াল-গাত্রে একটী লেখা পড়িলাম —"স্বাক্ষরতা দেশের প্রাণ, স্বাক্ষরোত্তর দেশের মান।" সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল—"থাক্ মান যাক্ প্রাণ" অর্থাৎ মানহীন প্রাণ মৃতবৎ, পশুতুল্য। অধুনা সর্ব্বস্তরেই প্রায় মানহীন প্রাণের বহুমানন দেখা যাইতেছে—শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্তরে। প্রাণের উপর দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু যথেষ্ট সঞ্চিত প্রস্তুত যোগ্যতাকে অবহেলা করিয়া নূতনভাবে সামান্য যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য হাজার চেষ্টা, বিপুল অর্থ ও সময় নষ্টের কি যৌক্তিকতা, ইহা কেহই সঠিক বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, —"প্রায়সা দিন নাহি রহেগা"। অর্থাৎ তোমরা একদিন সমাজের মাথায় ছিলে; অতএব আজ তোমাদিগকে আমরা সেইজন্যই পদদলিত করিব। অর্থাৎ তোমরা উচ্চবর্ণ, উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, উচ্চ বুদ্ধি, উচ্চ বিচারবৃত্তি পাইয়াছ

—ইহাই তোমাদের অপরাধ। এ যেন সেই বাঘ ও হরিণের গল্প। "না, না, তুই নয়, তোর বাবা আমাকে একবার গালি দিয়াছিল। সেইজন্য তোমায় আজ প্রাণ দিতে হইবে।"

"নতুন কিছু কর রে ভাই নতুন কিছু কর, পায়ের জুতো মাথায় তুলে ধর।" সনাতন ধর্ম্মই জীবের একমাত্র প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখায়। এতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আইন, প্রশাসনের সদ্ব্যবহার শিখানো হয়। সনাতন ধর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম, তাই ইহার আর এক নাম জৈবধর্ম্ম, ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মের মূলকথা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। পুরাকালে ধর্ম্মপরায়ণ রাজাগণ এই ধর্ম্মের পালন করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলিয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। অদ্য সেইজন্য সেই অপরাধে সনাতন ধর্ম্মী বা ধর্ম্মকে যিনি যতখানি সর্ব্বতোভাবে আঘাত হানিতে পারিবেন, তিনি ততবড় ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাজা। যিনি সম্মানী উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষকে যতখানি অপমান করিতে পারিবেন, তিনি তত বড় অসাম্প্রদায়িক। **New elite, New trend.**

গত ৭ই জুন 'আজকাল'-পত্রিকায় একটী লেখা পড়িলাম, যাহার মর্ম্মকথা ধর্ম্মীয় ব্যাপার মানেই কুসংস্কার! মহাপুরুষগণের জীবনী পড়া নাকি কুসংস্কার এবং সমস্ত খারাপ প্রবৃত্তির উৎস। অবাক্ হইলাম একটা চামচিকের এতবড় স্পর্দ্ধা হয় কি করিয়া! আর একটা পত্রিকা, সৎবিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মুখপত্র, তাঁহারাই বা এইটা ছাপেন কি করিয়া? ভদ্রলোক স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ। তবে তিনি সেই সব লইয়া কথা বলিতে যান কিভাবে, তাঁহার কি বিন্দুমাত্রও লজ্জা বলিয়া বস্তু নাই? উনি অধার্ম্মিক, অধর্ম্ম করিয়া বেড়ান, তাই সবাই ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিক, অধর্ম্ম করুক! স্বল্প অভিজ্ঞতার চমক লাগাইয়া সস্তা হাততালির ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বটে! না হইলে জাতে উঠা যায় না। পরে শুনিলাম, ভদ্রলোক কুলীন হইয়াছেন। সদ্গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া অসদ্-গ্রন্থানুশীলনের অভ্যাসপূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনী না পড়িয়া কাপুরুষের জীবনী পড়। নিউ এলিট্, নিউ ট্রেণ্ড্।

কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে, সেই ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ বা বিশেষ অনুগামী জনের নিকটেই তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে এবং তাহাই বিশ্বাসযোগ্য হইবে। অনুরূপভাবে কোন গ্রন্থ বা কোন জীবনী হোক, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বা খেলাধূলা সম্বন্ধে বা ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হোক, সেই সেই অনুগামী জনের নিকটেই সেই দিক্‌কার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। অথচ

অবাক্ হইয়া যাই, যখন দেখি কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে একজন একনম্বর অধার্ম্মিক কিছু বলিল বা কিছু লিখিল, অমনই সেইটিকে লইয়াই শেয়ালের দল হুক্কা হুয়া রব তুলিয়া দিল। কাকে কাণ লইয়া যাইবার মত। তাহাদের একবারও ভাবিবার অবকাশ হয় না যে, যে যদো, মধো, সেধো কথাগুলি বলিতেছে তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র কি? তাহাদের এ সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার বা ক্ষমতা কতটুকু? কিম্বা আসল গ্রন্থটিতে কি আছে, তাহা একবার দেখি। তাহা হইলেই ইহাদের অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ কষ্ট-কল্পনার স্বপ্ন-সৌধ কুপোকাৎ হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ! এবিষয়ে সঠিক বিচার করিবেন।

শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয় খৃষ্টান্ হইয়াছেন। তিনি জাতি মানেন না, তাই একবার জাতিচ্যুত হইয়া পুনরায় খ্রীষ্টান্-জাতির আশ্রয় গ্রহণে জাতিত্যাগের উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সনাতন ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া তাহার পর খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মকে উদরস্থ করিয়া দেখিয়াছেন,—খ্রীষ্টধর্ম্মই একমাত্র উপাদেয়, তুষ্টি-পুষ্টিকারক এবং সনাতন ধর্ম্মে গরহজম হয় তাহাও জানিয়াছেন। শুনিয়াছি, কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা এতই বাড়িয়াছে যে, তিনি পুরাণ-উপনিষদ্-মহাভারত সকলকেই একচোখে দেখেন। বলেন—মহাভারতে লেখা আছে,—গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য খুন করেন। আবার তিনিই নাকি শ্রীমহাপ্রভুকে পুরীধামে খুন হইতে দেখিয়াছেন! তিনি শুধু ধর্ম্মের মধ্যে খুনোখুনিই দেখিতে পান। আবার বলেন,—তিনি কোন গ্রন্থ পড়ে শেখেন নি, দেখে শুনে শিখেছেন। কি বিরাট্ পণ্ডিত, ভয়ানক আবিষ্কারক! মাষ্টারমশাই, ওরে বাবা!

সকল জাতি-প্রজাতিরই একটা জাতি আছে। সাপ, ব্যাঙ, পশু, পাখী, বৃক্ষ, মনুষ্য সকলেরই। উঁচু জাতের সাপকে বলে জাত সাপ। যাহাদের বিষ নাই, যোগ্যতা নাই, সেগুলি হইল ঢোঁড়া, আর যেগুলির কোন জাত নাই, সেগুলি ঢেমনা। গাধারও জাত আছে, আবার ঘোড়ারও জাত আছে। যেগুলি গাধাও নহে, আবার ঘোড়াও নহে, সেগুলিকে বলে খচ্চর। মানুষ প্রধানতঃ নারীজাতি ও পুরুষজাতি; যেগুলি নারীও নহে, পুরুষও নহে সেগুলি কি? আর ভট্টাচার্য্য—খ্রীষ্টান্ অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যও নহে, খ্রীষ্টান্ও নহে, তাহারা কি জাতি? বোধ হয় অক্ষম লালসাক্রান্ত নারীও নহেন, পুরুষও নহেন, দলের উদার জাতি! চিংড়ি আবার মাছ, চামচিকে আবার পাখী, ভট্টাচার্য্য খ্রীষ্টান্—তাতে আবার শিক্ষিত। ইহারা সভা-সমিতিতে, ট্রেনে-বাসে, ক্লাবে, চা-পার্টীতে জাতি-ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণ করেন, আবার উচ্চ আদর্শ-পরিবারের বিবাহ, অন্নপ্রাশন,

উপনয়নাদি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করেন। বলিহারী বাহাদুরী!

যিনি বলেন, ভগবান্ টগবান্ কিছুই নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবান্ নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থে সত্যকথা লিখা হয় নাই। তাঁহার জ্ঞান কম ছিল, তিনি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী নহেন অর্থাৎ একমাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই পূর্ণ-জ্ঞানের অধিকারী। তাহা না হইলে এতবড় ধৃষ্টতাপূর্ণ কঠোর মন্তব্য পাগল আহাম্মক ছাড়া আর কে করিতে পারেন? **"Fools rush in where angels fear to tread"**—অর্থাৎ দেববৃন্দও যেস্থান মাড়াইতে ভয় পান, মূর্খ অর্ব্বাচীনগণ অনায়াসে তথায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। **New Elite. New Trend!**

যুগ বদলাইতেছে, পৃথিবী বদলাইতেছে, নীতি-আদর্শের মূল্যবোধ সমস্তই বদল হইতেছে! বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ শুধুমাত্র পুরাতন বলিয়াই বদল করিতে হইবে, সংস্কৃত-ভাষা শুধু পুরাতন বলিয়াই তুলিয়া দিতে হইবে! পিতামাতাও পুরাতন হইয়া গেলে বাতিল করিতে হইবে, ইহাই পরম গৌরবের বিষয়! লজ্জার নহে, ধন্য যুগের ধন্য শিক্ষা! একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি প্রস্তাব রাখিছেন,—"ধর্ম্মীয় গবেষণা সব তুলিয়া দেওয়া হোক, কি হইবে ওইসব আবর্জ্জনা, যেগুলি পেটের ভাত দিতে পারে না।" হায় বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মনুষ্য, সত্যই তোমরা পশুদের অপেক্ষাও অধিক উন্নত! তোমাদের সমস্ত কিছুরই মূল্যবোধ আবর্ত্তিত হইতেছে একমাত্র উদরপূরণ ও ইন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র করিয়া। তোমাদের নীরেট মস্তিষ্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? সেখানে ত' তোমাদের নোংরা ভোগপ্রবৃত্তির আভাস মাত্রও নাই! মতি, বুদ্ধিরও উপরে চিত্তরূপী দর্পণকে পরিমার্জ্জনের কথা দিয়া শুরু হইয়াছে তাঁহার নির্ম্মল বাণীর **অ, আ, ক, খ**। তাহা বুঝিতেই বহির্ম্মুখগণের কোটীজন্মের সাধনার প্রয়োজন। তাহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারিত্বের মুখ্যহেতু উন্নতোজ্জ্বল-রসকথার আভাস হতভাগাদের হৃদয়ে কোনজন্মে এক কণারও উদয় হওয়া সুদূরপরাহত। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধীজনের কোনদিন সুমতির উদয় হইবে কিনা অন্তর্যামীই জানেন। মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের সকলের উপর অবিচ্ছিন্ন ধারায় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করুন। অধম আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন—ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য-কেশরী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, তাঁহার প্রকটলীলায় যে-সমস্ত অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ প্রশ্নোত্তরে জানা যায়,—

'কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?'

'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥'

আচার্য্যকেশরী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনোভীষ্ট সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশ-নির্দ্দেশ আচার ও প্রচারের মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—"জগতে যত শ্রবণ-সদন প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই জগতের মঙ্গল।" অস্মদীয় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ—শ্রীবিগ্রহ ও মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যথাযথ পালন করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বহুগুণ ও মহিমার কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের বহুমুখী লীলার একটী দিক্ আলোচনা করিয়া আমি "শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় ভক্তি-অর্ঘ্য" নিবেদন করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার মহিমা। তাঁহার মহিমা ও গুণগান কীর্ত্তনই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। যাঁহারা গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবক, তাঁহারাই গুরুদেবের মহিমা ও গুণগান করিবার প্রকৃত অধিকারী। মাদৃশ অধম অযোগ্য হইলেও নিজের আত্মমঙ্গলের জন্যই এই কার্য্যে ব্রতী হইতেছে।

শ্রীগুরুদেব ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহার শ্রীমুখে যে অমৃতধারা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সাকার-নিরাকারবাদ, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, সগুণ-নির্গুণ, মঠ-মন্দির প্রভৃতি। শাস্ত্রযুক্তি প্রমাণদ্বারা তিনি যে দার্শনিক তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ,—ইহা জগতে বড়ই দুর্লভ। ভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। অদ্যাপিও তাঁহার বক্তৃতা-বিষয়ক আলোচনা বিভিন্ন আচার্য্যবর্গের শ্রীমুখে শোনা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে এবম্বিধ বিচারধারা তাঁহার অপ্রকট-লীলার পর কুত্রাপি শ্রুতিগোচর হয় না। ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মঠ-মন্দির কথাটি সর্ব্বত্রই শোনা যায়। অথচ মঠ কাহাকে বলে এবং মন্দিরই বা কি বস্তু, তাহা সাধারণের ধারণা বা উপলব্ধি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই অজ্ঞতার জন্য বিভিন্ন তথাকথিত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বহুল পরিমাণে দায়ী করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ 'মঠ'-শব্দের অর্থ বলিয়াছেন,—"মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদয়ো যত্র মঠঃ" অর্থাৎ যেস্থানে ছাত্রসমূহ বাস করেন, তাহাকেই মঠ বলা হয়। 'মঠ' ধাতুর অর্থ বাস করা অর্থাৎ যেখানে ছাত্র বা শিষ্যগণ বাস করেন, সেই গৃহকেই মঠ বলা যায়। সুতরাং মঠ ও গৃহ এই দুইটী শব্দের মধ্যে ধাতু-প্রত্যয়গত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তথাপি মঠ বলিতে সাধারণ গৃহকে বা গৃহস্থের কোন গৃহকে লক্ষ্য করা হয় না। শাস্ত্র বলেন,—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' অর্থাৎ ঘর বা গৃহকেই গৃহ বলা হয় না, 'গৃহিণীকেই' গৃহ বলা হয়। গৃহস্থের ঘর বা গৃহই গৃহ এবং ত্যাগী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের গৃহই মঠ। সুতরাং মঠ ও গৃহ এক নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা মঠ ও গৃহকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাহ্যতঃ একই উপাদানে বা দ্রব্যাদিদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তাহা এক নহে। মনু-পরাশরাদি ঋষিগণ শ্রীমঠাদিতে শ্রীমন্দিরের অবস্থিতির ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন।

আজকালকার স্কুল-কলেজের ছাত্রাবাস বা বোর্ডিং হাউস প্রভৃতিকে আদৌ মঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় না; এমনকি তদনুরূপ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর অবস্থিতিকেও 'মঠ' বলা হইবে না, যদিও শাস্ত্রকারগণের মতে "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদয়ঃ" বলিলে মঠ বুঝায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবিষয়ে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম পাঠকবর্গের অবগতির জন্য। কারণ এই বাণী আমাদের অমূল্য সম্পদ। ইহাই ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের শাশ্বত বাণী।—

"যেখানে শ্রীবিগ্রহের অবস্থিতি নাই অর্থাৎ উপাস্য তত্ত্বের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা কখনও মঠ নহে। 'মঠ' বলিলে শ্রীমন্দিরের অবস্থিতি অবশ্যই বুঝাইবে। সুতরাং 'মঠ-মন্দির' এই যৌগিক শব্দ আমাদের মঠ-শব্দের প্রকৃত অর্থকে জানাইয়া দেয়। ইংরাজী ভাষার শব্দ বিন্যাসে 'Q'-র সঙ্গে U-এর যে-প্রকার সম্বন্ধ, মঠের সহিত মন্দিরেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। মঠে সন্ন্যাসিগণই শিক্ষক ও ব্রহ্মচারিগণই ছাত্র। বানপ্রস্থিগণ অধিকার অনুসারে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়বর্ত্তীস্থানে অবস্থিত। সুতরাং 'মঠ' বলিলে ত্যাগিগণের 'আশ্রম' বুঝিতে হইবে। মঠের পরিচালনা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থী এই আশ্রমত্রয়

বাসিগণের একমাত্র কৃত্য। 'ত্যাগী' বলিলে বিশেষতঃ উক্ত আশ্রমত্রয়ে অবস্থিত ভক্তগণকে লক্ষ্য করা হয়। ঈশ্বরোপাসনাই ত্যাগের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা ব্যতীত ত্যাগ নিতান্ত শুষ্ক ও নিরর্থক।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সত্যতা ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে এ স্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী :—

"প্রভু কহে,—'সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৮)

শ্রীমদ্ভাগবত—"অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারং তমো মুকুন্দঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব" অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণদ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।

শাস্ত্রকারগণ মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মঠ-মন্দির বিশ্ববাসীকে মায়ার হাত হইতে অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাদির পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শিক্ষা দিবার জন্য। ত্রিগুণের অন্তর্গত স্থানে থাকিয়া গুণাতীত হওয়া কঠিন। এ সম্বন্ধে গীতা বলেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (৭।১৪)

বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ নির্গুণ-ক্ষেত্রই আমাদের একমাত্র উদ্ধার লাভের স্থান। আমাদের সেই স্থানেই অবস্থান করা কর্ত্তব্য। মঠ-মন্দিরই সেই নির্গুণ স্থান। 'নির্গুণ' বলিতে প্রাকৃতগুণহীন এবং অপ্রাকৃত গুণসমষ্টিকে লক্ষ্য করা হয়। শাস্ত্রকারগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই নির্গুণ বলিয়া থাকেন। এই নির্গুণস্থানই ভগবানের বিহার ও বসতিস্থল (মঠ-মন্দিরাদি)। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত। তাঁহার কোন প্রাকৃত আকার নাই।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই উক্তির অনুরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥ (৯।১১)

অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যা-বিমোহিত মূঢ়লোক আমার এই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ তনু বা বিগ্রহকে ধ্বংসশীল মানবতনু মনে করিয়া আদর করে না, বরং অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমি এই নরতনুতেই সর্ব্বভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা তাহাদের মায়িক জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারে না।

শ্রীচরিতামৃত বলেন, —

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহে সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭)

শ্রীবিগ্রহ-মঠ-মন্দির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিলেন, —মঠস্থাপন করিতে গেলে তাহাতে শ্রীবিগ্রহ থাকিবেই থাকিবে। শ্রীবিগ্রহের জন্যই মন্দিরের আবশ্যকতা। যাঁহারা শ্রীবিগ্রহ মানেন না, তাঁহাদের কখনও শ্রীমন্দিরের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। তবে সাধকগণের জন্য সকল ধর্ম্মেই উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা আছে। কেহ তাহাকে গীর্জ্জা, কেহ মস্‌জিদ, কেহ বা উপাসনা গৃহ, আখ্‌ড়া, আসনঘর, হরিসভা-গৃহ, মঠ ও আশ্রমাদি নানারূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন।

ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতির প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। বৈদিক যুগ হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় হিন্দুগণ বিগ্রহ-বিরোধিগণকে চিরদিনই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন। এমনকি, কোন সামাজিক ক্রিয়াকলাপও তাহাদের সঙ্গে করা হয় নাই। বৌদ্ধগণ, জৈনগণ, খৃষ্টান, মুসলমানগণ ইহাদের কেহ বেদবিরোধী নিরাকারবাদী, কেহ বা মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা ও ব্যুৎপরস্ত বলিয়া হেয় জ্ঞান করায় তাহারা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণের অস্পৃশ্য।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বলিতে তাঁহার নিত্যকালের অপ্রাকৃত বিশেষরূপকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ ঈশ্বরের রূপকে স্বীকার করেন। এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা ভগবানের রূপ স্বীকার করেন না। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত-ধারায় বিচার করিলে "নিরাকারের" অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় না। পরন্তু সাকারত্বেরই প্রমাণ হইয়া থাকে। ভগবানের যদি আকার বা রূপ না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান্ জগতে সাকার বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না।

বাইবেল ও কোরাণে সাকারের অস্তিত্ব গুপ্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ববিদ্ অস্বীকার করিতে পারেন না ভগবানের "সাকারত্ব"। Bible—'God

created men out of His own Image"—অর্থাৎ ভগবান্ মানুষকে তাঁহার "নিজের আকৃতি-অনুসারে তৈয়ার করিয়া থাকেন।" এখানে ভগবানের নিরাকারের কোন কথাই নাই। কোরণ বলেন—"ইন্নালাহা খালাকা মেন্ সুরাতিহি" অর্থাৎ খোদা তাঁহার নিজের আকারের ন্যায় মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা বাইবেলেরই প্রতিধ্বনি। পৃথিবীতে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান নিরাকারবাদী, তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেও 'ভগবান্ নিরাকার' প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু তিনি নরাকৃতি পুরুষ। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, যাঁহারা গীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্য ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য স্বীকার করেন না এবং ভগবানকে নিরাকার বলিয়া অযথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ভারতীয় ধর্ম্ম জগতের শত্রু এবং অস্পৃশ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাজনগণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত ও নির্গুণ-ভূমিতে অবস্থিত। নীতিশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই,—

কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

অতএব শ্রীনাম-বিগ্রহ-স্বরূপ এক তত্ত্ব।

'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—তিন 'চিদানন্দরূপ।' (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১)
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২২)

"Out of nothing, everything has been created"—ইহা বেদান্ত দর্শন স্বীকার করেন না। 'World is an accident'—ইহা অনীশ্বরবাদীদের কথা—নাস্তিকগণের উক্তি। গীতা এই মতবাদকে আসুরিক চিন্তাস্রোত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন,—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (১৬।৮)

মদভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যস্থাপন করিয়াছেন জগৎসভায়। কারণ বিশ্বের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সকল মঠেই শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর অদ্ভুত শ্বেতকান্তি ধারণ নিগূঢ় ভজনানন্দীর দুর্ভেদ্য ভজনরহস্যকে পরাজিত করিয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্বেতবর্ণের কারণ ব্যাখ্যামুখে বলেন, -

"শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহাপ্রভুর মন্ত্রের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে। অনেকে বলিতে পারেন, এই সমিতির সকল মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধারাণী ও গৌরসুন্দর—সকলের বর্ণ শ্বেত। উত্তর এই যে, আমরা রাধা-পক্ষের লোক। রাধারাণীর সঙ্গে কৃষ্ণের একটা বাহ্যভাব আছে। তাহা কৃষ্ণ-সেবার বৈচিত্র্যই বৃদ্ধি করিয়াছে। রাধারাণী একবার মান করেন, কৃষ্ণ তখন রাধারাণীর চিন্তায় বিভোর হইয়া গিয়া রাধারাণীর অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হইয়া যান।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই.—

"রায় কহে,—শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ (৮।১০৩-১০৪)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের "শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্" এর প্রথম শ্লোকে এই বিচারটী আমার দেখিতে পাই,—

রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধা-লিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভভাবে রাধারাণীর চিন্তায় বিভোর বা আত্মহারা হওয়ায় তাঁহার নিজ অঙ্গকান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণ-অঙ্গ লুপ্ত হইয়া রাধারাণীর কান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়াছেন,—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কখনও পৌত্তলিক নহেন বা প্রতীকোপাসনা করেন না; তাঁহারা পৌত্তলিকগণের বিসর্জ্জণীয় প্রতিমা-পূজার বিশেষ আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা যে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা বা উপাসনা করেন, তাহা স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। সেই বিগ্রহ ভক্তের সহিত কথা বলেন এবং চলিয়া বেড়াইতে পারেন। আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

—**শ্রীভক্তিকৃষ্ণ দাসাধিকারী**, ভক্তিভূষণ

সেবকের অনুভূতি ও উপলব্ধি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, ও সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাদিবস অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অনুষ্ঠান প্রারম্ভের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুষ্পবৃষ্টিযোগে দেবরাজ ইন্দ্র শুভসূচনা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সুসম্পন্নের ইঙ্গিত দেন। অপরাহ্নে নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভা-যাত্রার পুরোভাগে সুসজ্জিত ব্যাণ্ডপার্টি, শ্রীমঠের, পঞ্চতত্ত্বের ও মহামন্ত্রের ব্যানার, ভক্তগণের হাতে বিভিন্ন রঙের পতাকা। পশ্চাদ্‌ভাগে সুসজ্জিত রথে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগতের প্রতি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সর্ব্বোপরি মৃদঙ্গ-করতাল, মহামন্ত্র-সঙ্কীর্ত্তনের রোল আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া মহানগরীকে জানাইয়া দিল যে—জগদ্‌গুরু শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও তদনুকম্পিত আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্টওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা মহানগরীতে শুদ্ধাভক্তির যে বীজবপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অশেষ কৃপায় তাঁহাদের অধস্তনগণের দ্বারা উহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বৃক্ষাকারে পরিণত ও পুষ্পিত হইয়া বিরাট্ মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে। বহুদিন যাবৎ মহানগরীর এবম্বিধ নগর-সঙ্কীর্ত্তন দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই।

লীলাপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রজসুভ্রূগণকে লইয়া অপ্রাকৃত-রাস রচনা করিয়াছিলেন। এই 'রাস'—'রস' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন নিজবাঞ্ছাপূর্ত্তির উদ্দেশ্যে কলিযুগে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমাঝে অবতীর্ণ হইয়া ধরাধামে সঙ্কীর্ত্তন-রাস প্রকট করেন। শ্রীশচীনন্দনের নিজপরিকরগণের শুভানুধ্যায়ে সঙ্কীর্ত্তন-রস পান করিয়া মহানগরীর বহুদিনের তৃষ্ণিত প্রাণ পরমতৃপ্তি লাভ করে।

ইতোমধ্যে শ্রীইন্দ্রদেব মাঝে মাঝে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে সঙ্কীর্ত্তনরত ভক্তগণের ক্লেশ অপনোদনে নিযুক্ত ছিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে দেবীধামের মনুষ্যগণের প্রতি দেবরাজের কেন এত করুণাবর্ষণ? কেনই বা এত সেবাপ্রবৃত্তি? বোধ করি

শিব-পার্ব্বতী-সংবাদ তিনি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের জন্য কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়াছেন। কোন এক সময় পার্ব্বতীদেবীর প্রশ্নে শিবঠাকুর বলেন যে,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

শিবঠাকুরের এই বিখ্যাত উপদেশবাণী চতুর্দ্দশ ভুবনের কাহারও অবিদিত নহে। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে, দ্বাপরের অন্তে, বৈবস্বত-মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পূজাদ্বারা ইন্দ্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ব্রজবাসিগণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শ্রীগিরিরাজের মহিমা ঘোষণা করেন। কেনই বা শ্রীকৃষ্ণের এই গোবর্দ্ধন পূজা? ইন্দ্রগর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর শ্রেষ্ঠত্ব জগতকে প্রদর্শন। যশোদামাতার ন্যায় মাতৃস্থানীয়া গোপীগণও স্নেহের পুত্তলী গোপালকে নিকটে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। গাভীগণও বৎসচারক শ্রীকৃষ্ণসমীপে থাকিবার লালসা বহুদিন যাবৎ পোষণ করিত। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাগবতী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীশ্যামসুন্দরের ঘনিষ্ঠতা লাভের সুতীব্র বাসনা করিলে শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ তাঁহাদের সঙ্গলিপ্সু হন। ইহাই গোবর্দ্ধন পূজার মুখ্য রহস্য।

ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া যোগমায়া দেবী বিচার করিলেন যে, কোন বিপদ্ আসন্ন না হইলে এরূপ যোগ সম্ভব নহে। কারণ, বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে নিকটস্থ হইবার সুযোগ অবারিত হয়—তাহাতে কাহারও কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সুতরাং দেবী লীলাপুষ্টির উদ্দেশ্যে দাম্ভিক-ইন্দ্রকে ব্রজে আকর্ষণ করিলেন। দেবরাজ-ইন্দ্র প্রলয়ের সম্বর্ত্তক-মেঘদ্বারা ক্রমাগত সাতদিন ঘোরতম বর্ষণ করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন ভয়ভীত হইয়া কৃষ্ণপ্রিয় সুরভীর আশ্রয়ে দর্পহারী ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আকাশগঙ্গার বারিদ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিয়া 'শ্রীগোবিন্দ' নামে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

তথাপি মনে পূর্ণশান্তি অনুভূত না হওয়ায় ধন্য-কলিতে পুনঃ সুরভীমাতার আনুগত্যে গোদ্রুম-দ্বীপান্তর্গত গাদিগাছাতে আসিয়া ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনা করেন। এখন সেই শ্রীকৃষ্ণই রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইয়া ভক্তগণের সহিত নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দেবরাজজী শিবঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অবলম্বন করিয়া ভক্ত এবং ভগবানের যুগপৎ সেবার সুবর্ণ সুযোগ দেখিয়া নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়াই পুষ্পবৃষ্টিরূপ বর্ষণের মাধ্যমে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভাজন হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী,** বিদ্যালঙ্কার

কামনাই সর্ব্বপাপের মূল

মানব-জীবনের পারমার্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে শাস্ত্রকারগণ ষড়্‌রিপুর কথা উল্লেখ করেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়্‌রিপুর প্রধান ও প্রথমটী হল কামনা। কাম বা কামনা আসলে কি? সোজা কথায় বলা যায়,—যে-কোন ধরণের 'ভোগবাসনা'। শ্রীগীতায় অর্জ্জুন একসময়ে সখা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

'হে কৃষ্ণ, লোকে কাহাদ্বারা প্রযুক্ত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণ করে?'

আমরা সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজেদের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপাচরণ করি বা করতে বাধ্য হই। তাহাকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অপব্যবহার বলা যায়। তবে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে কে? সে কোন্ শক্তি, যা ইন্দ্রিয়ের প্রবল তাড়নাকেও তুচ্ছ করে দেয়। শ্রীভগবান্ বললেন,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

'ইহাই কাম, ইহাই ক্রোধ, ইহা রজোগুণ-উৎপন্ন; ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারের শত্রু বলে জানবে।'

এই কামনা—এই সর্ব্ব পাপের মূল কোথায়? ঠিক কি কারণের জন্য এই তীব্র বাসনা-কামনায় মানুষ দগ্ধ? শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যযোগে তার উত্তর দিয়েছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

(গীঃ ২।৬২)

বিষয়-সম্পত্তি ভোগের চিন্তা করতে করতে একসময় তীব্র আসক্তি জন্মে, সেই সম্পত্তি চোখের মণি হয়ে দাঁড়ায়। আসক্তি থেকে তীব্র কামনা, আর সেই কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলে অসম্ভব ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যে-কোন বিষয়েই কামনার জন্ম এইভাবেই হয়; এইভাবে কামনা সব অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়।

এই কামনার বশীভূত হয়ে মানুষ ভুলে যায়—'আমি কে?' ভুলে যায়—পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে, জীবন-পথের পাথেয় হয়ে যায় —কণ্টকময়। একে একে পাপ এসে তিলে তিলে গ্রাস করে জীবনকে। এর থেকে বাঁচবার পথ কোথায়? একটাই পথ। দয়াময় ভগবান্ তাঁর সর্ব্বকালের সত্য প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়েছেন সগর্ব্বে,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৫-৬৬)

পরমপ্রিয়-জন শ্রীহরিকে হৃদয়ে ও মনে স্থাপন করে একাগ্রমনে ডাকতে হবে। তুলসীমঞ্জরী হাতে নিয়ে ঐকান্তিকভাবে বলতে হবে,—

'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপোহরো হরিঃ॥'

আত্মোন্নতির পথে ঘৃণ্যতম কামনা যে বাধা সৃষ্টি করে; সে বাধাকে দমন করতে একমাত্র চাই এমনই করুণ আর্ত্তকণ্ঠস্বর। সাধনাদ্বারা ঐরূপ তমোগুণ অতিক্রম করে একসময় শুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলীর অধিকারী হওয়া যায়। সে গুণ এমনই যে, অধিকারী ভগবানকে পাওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই কামনা করতে পারেন না। ভগবানই সব চিন্তার মূল হয়ে দাঁড়ান। তিনি হন নয়নের মণি, সর্ব্বকালের বন্ধু।—

গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধবো মধুসূদন।
গোপীনাথ গোকুলেশ গোপাল গোপীবল্লভঃ॥

— **শ্রীমতী কুহু বেরা,** অমর্ষি (মেদিনীপুর)

ভ্রান্ত-কর্ম্মবীর

ওহে ভ্রান্ত কর্ম্মবীর পুরুষ-রতন !
হাসি পায় হেরি তব কর্ম্মের যতন !!
পর দুঃখে তব যদি, বিগলিত হয় হৃদি,
কিবা সাধ্য আছে তব দুঃখ বিমোচনে।
অন্ন-বস্ত্র-শুশ্রূষায় করিছ যেমনে ॥ ১ ॥
আপাতত হের তুমি দুঃখের লাঘব।
নূতন অভাব পুনঃ হ'তেছে উদ্ভব ॥
এইরূপে কতবার, নিবারিবে দুঃখভার,
চির-দুঃখানলে যার দহিছে হৃদয়।
কিরূপে তুষিবে তা'রে হইয়া সদয় ॥ ২ ॥
মায়াপাশে বদ্ধ জীব চিন্তে অনুক্ষণ।
কিরূপে হইবে তার ইন্দ্রিয়-তোষণ ॥
দুর্দ্দান্ত লালসাদ্বারা, হ'য়ে পড়ে আত্মহারা,
নৈতিক নিয়ম সব করিয়া লঙ্ঘন।
পর-নিপীড়নে পাপ ভাবে না কখন ॥ ৩ ॥
পাপী তাপী, ভোগি-সেবা—এই হবে সার।
পাপের প্রশ্রয় ভবে বাড়িবে আবার ॥
বিদ্যা, ধন, স্বাস্থ্য, বল, লভি' জীব এ সকল,
অভিমানে মত্ত তা'তে রহিবে সদায়।
যদি কৃষ্ণপদে সেহ ভক্তি নাহি পায় ॥ ৪ ॥
সাগর বারিধি যথা ঝিনুকে সিঞ্চন।
তোমার বাতুল চেষ্টা তাহারি মতন ॥
জান না কিরূপে হায়, পরদুঃখ ঘুচে যায়,
অরণ্যে রোদন তব হ'ল মাত্র সার।
দুঃখের কারণ তুমি জান না তাহার ॥ ৫ ॥
নিজ-স্বতন্ত্রতা-ভ্রমে স্বরূপ ভুলিয়া।
মায়ার আশ্রয় জীব নিয়েছে বাছিয়া ॥
মায়ার পেতেছ সাজা, কভু ভিক্ষু, কভু রাজা,
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, সদা অভিমান।
এ হেতু ত্রিতাপে দগ্ধ সদা তার প্রাণ ॥ ৬ ॥

জীবে দয়া করিবারে বাঞ্ছা যদি মনে।
স্বরূপে স্থাপন তা'রে করহ যতনে॥
জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস, জানিলে মায়ার ফাঁস,
কেটে যাবে আরো যত অভাব-যন্ত্রণা।
তাহাতে লভিবে হৃদে অশেষ সান্ত্বনা॥ ৭॥
সাধুগুরুস্থানে গিয়া লভি উপদেশ।
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবায় নিবেশ॥
ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা অতি, নষ্ট করে নিষ্ট মতি,
যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়।
শুদ্ধভক্তি আত্ম-ধর্ম্ম জীবের অভয়॥ ৮॥
ধন্য তুমি কর্ম্মবীর নৈতিক জীবনে!
কর্ম্মের প্রেরণা তব জাগিতেছে প্রাণে॥
করিয়াছ কর্ম্মাশ্রয়, কর্ম্মযোগে কিবা হয়,
ভোগময় স্বর্গলাভ হইবে তোমার।
"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" আবার॥ ৯॥
মায়াচক্র আবর্ত্তনে গতাগতি সার।
বিঘূর্ণিত হবে তুমি বলি বার বার॥
কর্ম্মকাণ্ড-অনুষ্ঠানে, নিয়োজিত কায়মনে,
বদ্ধদশা ঘুচাবার নহে গো উপায়।
শাস্ত্রকার কি বলেছে শুনহ নিশ্চয়॥ ১০॥
কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভুক্তি-মুক্তি তরে।
বিদ্ধা ভক্তি লাভ তারা করিবারে পারে॥
ভক্তি উত্তমা শুদ্ধা, শুদ্ধজ্ঞান কর্ম্মবিদ্ধা,
অভিলাষ শূন্য হ'য়ে কৃষ্ণানুশীলন।
"জীবে দয়া, নামে রুচি" করহ সাধন॥ ১১॥
গভীর তমসাবৃতে দিশেহারা পান্থ!
মিছে কেন ঘুরে তুমি হইতেছ ক্লান্ত॥
নিজ হিত যদি চাও, শাস্ত্রের শরণ লও,
অথবা সুধাও গিয়ে সাধু-মহাজন।
তাহাতে মঙ্গল তব হইবে সাধন॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ
রাণাপত ঘাট, বৃন্দাবন (মথুরা)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ২২শে কার্ত্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ৯।১১।১৯৯৫) বৃহস্পতিবার শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ-গণ প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৮।১১।৯৫) বুধবার অধিবাস ও ২২শে কার্ত্তিক (ইং ৯।১১।৯৫) বৃহস্পতিবার শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম ও ধর্ম্মসভাদি সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—৩২শে ভাদ্র, ১৪০২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ

শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে হইলে **শ্রীচারুকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

২১শে কার্ত্তিক (ইং ৮।১১।৯৫), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্ত্তন এবং ধর্ম্মসভা।

২২শে কার্ত্তিক (ইং ৯।১১।৯৫), বৃহস্পতিবার—

মঙ্গলারতি—প্রাতঃ ৪-৩০ টায়।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্ম্মসভা—'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ের ফোন নং ৩৩-৮৯৭৩ এর পরিবর্ত্তে ৫৫৫-৮৯৭৩ হইয়াছে। অতঃপর আপনারা পরিবর্ত্তিত নূতন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৭শ বর্ষ | ১০ দামোদর, অনিরুদ্ধ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ আশ্বিন, বুধবার, ১৪০২, ইং ১৮/১০/৯৫ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীঅনুরাগ-বল্লী

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতা]

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! যুগপৎ প্রযচ্ছ
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে যুগপৎ অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ এবং সেই প্রতিদেহে অর্ব্বুদ বদন ও সেই অর্ব্বুদ মুখে অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনা প্রদান করুন। হে প্রভো! অপর প্রার্থনা এই যে, আপনার অর্ব্বুদ গুণরাশি, মদীয় অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনায় নৃত্য করুক। ১।

কিমাত্মনা ? যত্র ন দেহকোট্যো
দেহেন কিং ? যত্র ন বক্ত্রকোট্যঃ।
বক্ত্রেণ কিং ? যত্র ন কোটিজিহ্বাঃ
কিং জিহ্বয়া ? যত্র ন নামকোট্যঃ ॥ ২ ॥

হে প্রভো ! যে দেহে কোটিসংখ্যক দেহ অবিদ্যমান, তাদৃশ দেহে প্রয়োজন কি ? যে দেহে কোটিসংখ্যক বদন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক ? যে বদনে কোটি রসনার অভাব, এতাদৃশ আননে কি ফল হইবে ? এবং যে জিহ্বায় তোমার "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম-কোটি বিরাজ না করে, সেই জিহ্বাদ্বারা প্রয়োজন কি ? অতএব প্রার্থনা এই যে, কোটি দেহে কোটি মুখ, কোটি মুখে কোটি জিহ্বা, কোটি জিহ্বায় কোটি নাম কীর্ত্তন করুক ॥ ২ ॥

আত্মাঽস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী
দেহস্তু নাথাস্তু সহস্রবক্ত্রম্।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষজিহ্বং
গৃহ্লাতু জিহ্বা তব নামকোটীম্ ॥ ৩ ॥

হে নাথ ! অপর প্রার্থনা এই যে, আমার আত্মা সর্ব্বদা শত শত দেহবর্ত্তী হইয়া বিদ্যমান থাকুক। দেহে সহস্রবক্ত্র হউক। মদীয় বদন লক্ষ সংখ্যক রসনান্বিত হইয়া অবিরত বিরাজ করুক এবং রসনা আপনার নামসমূহ গ্রহণ করুক ॥ ৩ ॥

যদা যদা মাধব ! যত্র যত্র
গায়ন্তি যে যে তব নামলীলাঃ।
তত্রৈব কর্ণাযুতধার্য্যমাণা-
স্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥ ৪ ॥

হে রাধানাথ ! বিশেষ প্রার্থনা এই, যে-যে ভক্তগণ যে-যে সময়ে আপনার শ্রীবিগ্রহ-সমীপে বা যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়া ত্বদীয় নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানে আমি অযুত সংখ্যক কর্ণে আপনার সেই লীলা-সুধা ধারণ করিয়া নিরন্তর পান করিব ॥ ৪ ॥

কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষ-
কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুবানি নিত্যং
তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥ ৫ ॥

যে-সময়ে অযুত কর্ণে আপনার নাম ও লীলা-সুধা পান করিব, সেইক্ষণে অযুত সংখ্যক কর্ণের লক্ষ কোটি রসনা হউক, যেহেতু অযুত কর্ণে আপনার লীলা শ্রবণ এবং লক্ষকোটি রসনাদ্বারা লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইব ॥ ৫ ॥

কর্ণাযুতস্যেক্ষণকোটিরস্যা
হৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্তাৎ।
শ্রুত্বৈব দৃষ্ট্বা তব রূপসিন্ধু-
র্মালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো! ধয়ানি ॥ ৬ ॥

অযুত কর্ণের কোটি নয়ন, কোটি নয়নের কোটি হৃদয়, কোটি হৃদয়ের অর্ব্বুদ-সংখ্যক রসনা হউক। হে প্রভো! সেই অযুতকর্ণে আপনার রূপ-সাগরের মহিমা শ্রবণ ও কোটিনেত্রে দর্শন, কোটি হৃদয়ে আলিঙ্গন এবং অর্ব্বুদ রসনায় তাহার মাধুর্য্য পান করিব ॥ ৬ ॥

নেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণ-
নাসারসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদম্বা।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপুর-
মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসনানুভূত্যৈ ॥ ৭ ॥

হে প্রভো! আপনার দেহ সৌন্দর্য্যানুভবের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নয়ন হউক এবং আপনার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ অর্ব্বুদ কর্ণ, আর শ্রীবিগ্রহের সৌরভ-সমূহ গ্রহণের জন্য নাসিকা, মাধুর্য্য-রসানুভূতির নিমিত্ত রসনা এবং আপনার আলিঙ্গন-রস উপলব্ধির নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥ ৭ ॥

ত্বৎপার্শ্বগত্যৈ পদকোটিরস্তু
সেবাঃ বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধিকোটি-
রেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান করুন, আপনার সমীপে গমনার্থ আমার কোটিপদ, আপনার আরাধনা করিবার জন্য আমার কোটিহস্ত, এবং আপনার সেবা-শিক্ষণার্থ আমার কোটি বুদ্ধি হউক ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

সজ্জনতোষণী

১। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার মূলনীতি-বাক্যটি কি ?

"অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।"
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥"

—সজ্জনতোষণীর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'মূল নীতি-বাক্য', সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

২। 'সজ্জনতোষণী' নামের অর্থ কি ?

"জৈবধর্ম্মের বিশুদ্ধ অবস্থার নাম—'ভগবৎপ্রেম'; তাহাই জীবের চরম প্রয়োজন। বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হইয়াও, যাঁহাতে সেই ধর্ম্মের উদয় হয়, তিনিই কৃতকৃত্য। যাঁহাদের সেই বিমল ধর্ম্ম উদিত হয় নাই, কিন্তু তাহা উদয় করিবার জন্য সমস্ত জীবন-চেষ্টা নিযুক্ত হয়, তাঁহারাও ধন্য; যেহেতু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইবেন; সেই মহাজনগণকেই আমরা 'সজ্জন' বলি। তাঁহাদের তুষ্টি সাধন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। অতএব এই পত্রিকার নাম—'সজ্জনতোষণী'।"

—'সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য', সঃ তোঃ ২।৪

৩। সজ্জনতোষণীর আলোচ্য বিষয় কি ?

"সজ্জনতোষণী সাংসারিক অনিত্য সংবাদ লইয়া আলোচনা করিবেন না। সেই সমুদায় সংবাদ নানাবিধ অনিত্য সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে। জীবের নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।' —সঃ তোঃ ২।৪, বাং ১২৯৩—'আশীর্ব্বচন'

৪। 'সজ্জনতোষণী' কি জাগতিক সংবাদ-সরবরাহকারিণী ?

"আমি কাঙ্গালিনী বৈষ্ণবী; আমার বড় বড় সাংসারিক কথায় প্রয়োজন নাই —ইংরাজ ও রুষের যুদ্ধবার্ত্তা, আফ্‌গানিস্থানের সীমা নির্দ্দেশ, লাটসাহেবদিগের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা লইয়া আমার কাল ক্ষেপণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণের পারমার্থিক মঙ্গল সাধনই আমার একমাত্র কর্ম্ম। সেই কার্য্যসাধন করিতে করিতে যে-কিছু বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক হয়, তাহাও আমার বিচার্য্য।

অনিত্য সংবাদপত্র-সমূহের সহিত আমার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তথাপি ভারতবাসীদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিষয়ে কতটুকু দিন দিন প্রস্তুত হইতেছে, তাহা

দেখিবার জন্য আমি প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রই পড়িয়া থাকি। সেই সমস্ত সংবাদ-পত্রে ইংরাজ ও বাঙ্গালীদের পরস্পর বিরোধ-বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়।"

—সঃ তোঃ ২।৫, বাং ১২৯৩—'আশীর্ব্বচন'

৫। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার প্রচার-ফলে কি সুফল হইয়াছে?

"আদৌ বৈষ্ণব-সমাজের কোন পত্রিকা ছিল না। এখন দেখিতেছি, সজ্জন-তোষণীর উৎসাহে ঢাকায় 'রত্নাকর' নামক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক-পত্র, বালেশ্বরে 'শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী' পত্রিকা, এবং কলিকাতায় 'বৈষ্ণব' নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। * * নব্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করাও সজ্জনতোষণীর একটা উদ্দেশ্য। * * পরম পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। আশা করা যায় যে, নব্য মহোদয়গণ অতি শীঘ্রই নির্ম্মল হরিভক্তি লাভ করিবেন। গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও সজ্জনতোষণী অনেকটা কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত পরিচারিকা এই ভিখারিণী পত্রিকা নিজ পরিশ্রমের শুভফল দৃষ্টি করত পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।"

—সঃ তোঃ ২।১২, বাং ১২৯৩—'সমাবেদন'

৬। 'সজ্জনতোষণী'ই কি বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম পারমার্থিক পত্রিকা? ইঁহার প্রচার-সাফল্য কিরূপ হইয়াছিল?

"এক সময়ে এই 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ব্যতীত আর কোনও পারমার্থিক পত্রিকা ছিল না। সম্প্রতি অনেক ব্যক্তির মনে সজ্জনতোষণী এরূপ পারমার্থিক উত্তেজনা আনয়ন করিয়াছেন যে, তৎফলে আজকাল এতগুলি পত্রিকার উদয় হইল —এইটী বড়ই সুলক্ষণ।"

—'গতবর্ষ', সঃ তোঃ ২।১

৭। মহাজন-চরিত্র প্রকাশ করিবার জন্য 'সজ্জনতোষণী'-সম্পাদকের কিরূপ আগ্রহ ছিল?

"আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, ঐসকল মহাপুরুষের মহিমা বিস্তাররূপে প্রকাশ করি। কিন্তু আমাদের সে মহদভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় নাই; কারণ, ভিখারিণী সজ্জনতোষণী অতি ক্ষীণ-কলেবরা। যদি সজ্জনমণ্ডলী ভিখারিণীকে কখনও পুষ্টকলেবরা করেন, তবেই আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।"

—'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী', সঃ তোঃ ২।৬

৮। সজ্জনতোষণী পত্রিকার ইতিবৃত্ত কি?

"সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রথমে ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে নড়ালে বাহির হয়;

নড়ালে একটী নূতন যন্ত্র আনিয়া তাহার স্বত্বাধিকারিগণ আমার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করায় আমি প্রথম সংখ্যা 'সজ্জনতোষণী' তথায় ছাপাইলাম। পরে স্থানের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আমরা নিয়মিতরূপে ঐ পত্রিকা বাহির করি নাই। শেষে বারাসতে অবস্থিতিকালে শ্রীউপেন্দ্র গোস্বামীর 'নিত্যরূপ সংস্থাপনম্' ইংরাজীতে আলোচনা করি। ১৮৮৩ সালে ঐ ইংরাজী সংখ্যাটি বাহির হইয়া এই পত্রিকা বন্ধ ছিল। ১৮৮৫ সালে আমার রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয়। * * * তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়। ঐ সময় হইতে আবার 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ যত্নের সহিত বাহির হয়। মধ্যে সজ্জনতোষণী একবার বিশ্ববৈষ্ণবসভায় অর্পিত হইয়া প্রকাশ বন্ধ হয়। সজ্জনতোষণী আবার ১৮৯২ সাল হইতে নিয়মিতরূপে বাহির হয়।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৯। 'সজ্জনতোষণী' দুই বৎসরকাল প্রকাশিত হয় নাই কেন? কে ইহার সহোদরা-স্বরূপিণী হইলেন?

"প্রায় দুই বৎসর হইল সজ্জনতোষণী নিদ্রিতা ছিলেন। নানাবিধ ঘটনাবশতঃ আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে অবসর লাভ করি নাই। এক্ষণে বৈষ্ণব-পত্রিকার অভাববশতঃ বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সভা ও অন্যান্য সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এই বৈষ্ণবী বালাকে নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় হরিগুণগান ও হরিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলাম। আনন্দময়ী বালিকাও নৈসর্গিক প্রেমদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় নিজ কার্য্য গ্রহণ করিলেন। সজ্জনগণ সমাহিত হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন। সজ্জনতোষণী পূর্ব্বে একা ছিলেন, এক্ষণে ঘটনাক্রমে প্রেমপ্রচারিণী নাম্নী তাঁহার সহোদরা ভগ্নীর সহিত একত্র মিলিত হইয়া হরিতত্ত্বসুধা বর্ষণ করিতে থাকিবেন। আশা করি, এবার সজ্জনহৃদয় অধিকতর পরিতৃপ্ত হইবে। সজ্জনগণ যত যত্ন প্রকাশ করিবেন, ততই বালিকাদ্বয় উৎসাহিত হইয়া নিজ-কার্য্য উত্তমরূপে করিতে থাকিবেন।

—সঃ তোঃ ২।১, বাং ১২৯২, ইং ১৮৮৫—'আবেদন'

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমাদের কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন; যে-কোনভাবে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হইলে তিনি তদনুরূপ কৃপা করিয়া থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবক সংশ্লিষ্ট ব্যাপার-সমূহসহ তাঁহাকে লাভ করেন। যাঁহারা সে বিষয়ে উদাসীন, তাঁহারা একাদশী-ব্রতাদির নামে পিত্তবৃদ্ধি করেন। তাঁহাদের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ করিতে হইলে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে আসিয়া সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তাহাদের যাহা বিচারপ্রণালী, তাহাতে তাহারা কাম-ক্রোধাদি নক্রমকরের দ্বারা কবলীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা হইতে উদ্ধার চাইলে ভগবানকে আশ্রয় করিতে হইবে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটী আগে হওয়া দরকার।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলিয়া আছি। যিনি কৃপা করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতে আসেন, তাঁহাকে আড়াল করিয়া কপটতা, প্রতারণা, কর্ম্মাগ্রহিতা লইয়া ব্যস্ত থাকি। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস করিয়া গুণজাত জগতের বিচারবৈকুব্যের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি, অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ শ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালার বালক যখন উপদেশ-শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কাণ টানিয়া মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেবও বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিপ্লবাত্মিকা বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়। বাণী শ্রবণ করিতে করিতে বাণীদেবীর কৃপায় আর কষ্ট থাকে না। বাণী শ্রবণে হৃদয়ের অনর্থ দূরীভূত হয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে অর্থের প্রয়োজন বোধ হয়। তদবস্থায় হৃদয়টী ভগবৎবাসোপযোগী হয়।

ভক্তি হইবে যাহাতে, তাহারই রাস্তা করা দরকার। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ-ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। সাধু বলিতে এরূপ নয় যে, যিনি একটু প্রাণায়াম, গঙ্গাস্নান, ব্রহ্মচর্য্য-পালনাভিনয় বা পাথর পূজা করিয়া বেড়ান। প্রকৃত

সাধু কিন্তু অসাধু-বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। চেহারায় সাধু থাকিলে সাধু হওয়া যায় না। সত্য-সত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বিক্রম, তাঁহার শক্তির পরিচয় জানা দরকার। সাধুই তাহা বলিয়া দিতে পারেন। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায়। অসাধুর সঙ্গে তাহা জানা যায় না। অসাধু নিজের বড়াই করে। সাধু কখনও নিজের বড়াই করেন না। তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে, প্রথমে নিজের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন কি না, নিজেকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সাধুসঙ্গের জন্য মন ব্যাকুল হইলে সাধু নিজেকে তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। নিজে জানিয়া লইব বা নিজে চিনিয়া লইব—এইরূপ চেষ্টার দ্বারা সাধু চেনা যায় না। সাধুর কৃপাই সাধুকে জানিবার একমাত্র উপায়। যেমন সূর্য্যদেবের কৃপায় সূর্য্য উদিত হইয়াছে কিনা জানা যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপারূপ সূর্য্য উদিত না হইলে সাধুকে চেনা যায় না। সূর্য্যালোক প্রকাশিত হইলে যেমন সূর্য্য ও সেই আলোকে অন্যান্য জাগতিক বস্তুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপালোক প্রকাশিত হইলে সাধুকে এবং তৎসম্বন্ধীয় অনেক জিনিষ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ সীমা—শ্রীহরিনাম। পণ্ডিত না হইলে হরিনাম হয় না। যাঁহারা জগতে বড় হইতে অভিলাষী, স্বর্ণপ্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা পণ্ডিত নন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখচিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি "ছোট" জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সকল লোক হরিভজন করিতেছেন,—"সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে" এই প্রতীতিটী না হইবে, সেইকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধ গ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। কেহ হরিনাম করিতেছেন কিনা, তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কীর্ত্তিত বিষয় "হরিনাম" নিশ্চয় নয়, জানিতে হইবে। কৃষ্ণনামে কৃষ্ণের তোষণ হয়।

সভ্যতা

আজকাল দেশ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মানুষ, আচরণ প্রভৃতি এবং আরও বহু কিছুর পূর্ব্বে 'সভ্য' বিশেষণ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ আবার 'ধর্ম্ম' ও 'ধার্ম্মিকের' পূর্ব্বে 'সভ্য' বিশেষণ প্রয়োগ করিতে গিয়া ব্যতিরেকভাবে 'জগতে যে অসভ্য ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক রহিয়াছে' তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপন গ্রামে কুকুর যেমন নিজকে রাজা বলিয়া মনে করে, তেমনই নিজের সামান্য গণ্ডীর মধ্যে সামান্য লোকও নিজকে বড় অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা সুসভ্য মনে করেন। নষ্ট হইলেও আপন ঘোলকে যেমন কেহ টক বলেন না, তেমনই অসভ্য ব্যক্তি সভ্য আচরণ না করিয়াও নিজকে 'সভ্য' বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'ই বর্ত্তমানে সভ্যতার মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপন ছিদ্র কেহই দেখেন না, প্রায় সকলেই পরের ছিদ্র অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত। এ যেন "সুঁচ বলে চালুনি তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা"র ন্যায় হাস্যকর ব্যাপার। এক ক্ষুরে মাথা মুড়াইয়াও 'সভ্য' মার্কা ছাপ লইবার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া পড়িয়াছেন। যাহারা কথা বেচিয়া খান অর্থাৎ লোককে ঠকাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহারা কখনও 'সভ্য' পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। যেমন কাক ও কোকিলকে বর্ণের দ্বারা না চিনিয়া স্বরের দ্বারা চিনিতে হয়, তেমনি সভ্য ও অসভ্য মানুষের প্রকারভেদ তাঁহাদের ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

'সভ্য' কথাটি হইতেই 'সভ্যতা' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদিম সভ্যতা, মধ্যযুগীয় সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, বাদশাই সভ্যতা, প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা, পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সভ্যতা প্রভৃতি এবং আরও কত যে সভ্যতার কথা রহিয়াছে তাহা এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা অসম্ভব। 'সভ্যতা' শব্দের প্রকৃত অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা। ভদ্রতার মধ্যে অসরলতা প্রকাশ পাইলে তাহাকে কিছুতেই সভ্যতা বলা যাইবে না, তাহাকে ইতর সভ্যতা বা অসভ্যতার প্রকারবিশেষ জানিতে হইবে। মনের দুষ্টতা বা কপটতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, কলিকালে তাহারই নাম 'সভ্যতা'। নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য লোকে অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। কপট ব্যক্তি কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহ-বলের দ্বারা সভ্যতার গৌরব প্রকাশ করিয়া নিজের হীনমন্যতার পরিচয় প্রদান করেন। যেরূপ কোকিল দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করিয়াও গর্ব্বিত হয় না, কিন্তু ভেক কর্দ্দমযুক্ত জলপান করিয়া গর্ব্বে মক্‌মক্ শব্দ করিতে থাকে; তদ্রূপ ভক্তগণ প্রকৃত

সভ্য বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সুধা পান করিয়াও নিজদের অহমিকা প্রকাশ করেন না, অথচ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বিষয়-বিষ ভক্ষণ করিয়াও নিজদের সভ্য পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতার শিকার হইতে বাধ্য হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও মেকী সভ্যসমাজের নিকট কোন সুখের আশা করেন না। বস্তুতঃ নিষ্পাপ সভ্যতা একমাত্র বৈষ্ণবগণের মধ্যেই থাকে, আর অবৈষ্ণবগণের যে সভ্যতা আদৃত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এবং তাহার সহিত জীবের নিত্যধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

লোকের সন্তোষজনক চাকচিক্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, অপরের ন্যায় মদ্য-মাংস প্রভৃতি অমেধ্য আহারাদি গ্রহণ করা এবং সমাজে কপটতাপূর্ণ মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া লোকের মন জয় করা—ইহাই আজ কলিকালের সভ্যতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরের চোখধাঁধান পোশাক পরিয়া নিজের দোষসমূহকে আচ্ছাদন করিবার প্রচেষ্টা সমাজের পক্ষে অহিতকর। লজ্জা নিবারণের জন্য যদি পোশাক পরিধানের প্রয়োজন হয়, তবে নারীগণের যে-পোশাক দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রদর্শন করায়, বর্ত্তমান সভ্যতায় তাহাকে সুরুচিকর বলিবার অর্থ কি? দরিদ্র অথচ হাতে হীরের আংটি পরিয়া লোকে যে বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করে, তাহাকেই বর্ত্তমানে সভ্যতার একটী অঙ্গরূপে চিহ্নিত করা হয়। ভিতরের কপট ভাব গোপন রাখিয়া সভ্যতা বৃদ্ধির প্রয়াস সমাজে কোন সুফল প্রদান করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ যেরূপ কখনও সিংহ হইয়া যায় না, তদ্রূপ ভিতরের দুষ্টভাব গোপন রাখিয়া বাহ্যে চাকচিক্য প্রদর্শন করিলেও 'অসভ্য' মানুষকে কখনও সভ্য বলা যাইবে না। যেরূপ কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্য-বিজড়িত হয় এবং এক একটী পালকে যদি গজমতি মুক্তা থাকে, তথাপি সে কাকই থাকে—কখনও রাজহংস হইতে পারে না, তদ্রূপ লোকে যত ভাল পোশাক পরিধান করুক না কেন, যতই অমেধ্য-কুমেধ্য আহারাদি করুক না কেন, যতই লোকরঞ্জক প্রিয়কথা বলুক না কেন, অন্তরে দুষ্টভাব থাকিবার ফলে তাহারা অসভ্য থাকিয়াই যায়, কোনকালে 'সুসভ্য' নামের অধিকার লাভ করিতে পারে না।

বস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে,—বস্ত্র লজ্জা নিবারণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং দুর্গন্ধদ্বারা শরীরের যাহাতে কোন ক্ষতি হইতে না পারে, তাহার জন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন হয়। নতুবা কেবল পোশাক পরিধানের দ্বারাই মানুষ সভ্য হইতে পারে না। লোকরঞ্জক বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে ত' বারবণিতাগণকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'সভ্য' বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পোশাক পরিধানের শালীনতাবোধই মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিতে

সাহায্য করে। মেকী সভ্যতায় লোকরঞ্জনের জন্য যে বস্ত্র পরিধান করা হয়, তাহা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় রহিবে? বস্ত্র ত' দূরের কথা, ভূষণে ভূষিত যে সাধের দেহ তাহার পরিণতিও কি হইবে? এই প্রসঙ্গে ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—

যে বস্ত্রে আদর কর', যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন?

*　　*　　*　　*

ভূষণে ভূষিত যেই, পচিয়ে পড়িবে সেই,
পোড়ায়ে করিবে তাহে ছাই।

বাদশাই সভ্যতার যে কথা পাওয়া যায়, তাহা কেবল সাংসারিক বা লৌকিক ব্যবহারকে নির্দ্দেশ করে; তাহাতে পরমার্থের কোন কথাই নাই। বস্তুতঃ লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা মনুষ্যের নিষ্পাপ জীবনযাপন করা অসম্ভব। পাপবৃদ্ধির সহিত যে সভ্যতা বৃদ্ধি, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

আহারাদি সম্বন্ধে এইরূপ বলা যায় যে, আহারাদি অবশ্যই অত্যন্ত পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়া উচিত। মদ্য-মাংসাদি অমেধ্য খাদ্যাদি স্বভাবতঃ অপবিত্র এবং তাহা যে অসহনশীলতা, নিষ্ঠুরতা ও হিংসারও উৎস—তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত লোকমনোরঞ্জক যে শঠতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সভ্যতার বড়াই করা হয়, তাহাতে সমাজের উপকার ত' দূরের কথা, সকল সময়ে অপকারই সাধিত হয়। দুষ্ট শৃগাল যেরূপ ছলনার আশ্রয়ে মিষ্ট কথায় মিষ্ট জলের লোভ দেখাইয়া মূর্খ ছাগকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তদ্রূপ দুষ্ট ব্যক্তি কপটভাব গোপন করিয়া অসরলতার আশ্রয়ে লোকের নিকট মনোরঞ্জক মিষ্ট মিষ্ট ইতরকথা বলিয়া তাহাকে পরমার্থচিন্তা হইতে বিরত করিয়া তাহার ঘোর সর্ব্বনাশ করে। যে হরিকথা প্রচারের দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাকে কলিকালের সভ্যগণ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। প্রকৃত সভ্যব্যক্তি মুখে কেবল ভাল ও মঙ্গলের কথা বলেন না, কার্য্যেও তাহা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু সভ্যাভিমানী অসভ্য ব্যক্তি মুখে ভাল ভাল কথা বলিলেও কার্য্যে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহাদের একমুখে দুই কথা, তাহাদের নিকট হইতে সমাজ কতটুকু মঙ্গলের আশা করিতে পারে? নিজের সভ্যতা শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করিয়া যাহারা বৈষ্ণবের তিলক-মালাদি ভক্তিমুদ্রা ধারণকে বাতুলের কার্য্য মনে করিতেন, তাহারা আজ কোথায়? বর্ত্তমানেও যাহারা ভক্তিমুদ্রা ধারণকে নিন্দনীয়

কার্য্যের সমতুল্য মনে করেন, তাহারাও ভবিষ্যতে কোথায় থাকিবেন ? এই প্রসঙ্গে ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—

ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ?

মানব-জীবন স্বল্প, তাই পার্থিব চাকচিক্য মানুষের জীবনে কতদিন থাকিবে ? জীবন অল্পদিন, তাহার উপরে উপদ্রব বা সমস্যা অনেক। এই স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে পান্থ-নিবাসীর ন্যায় থাকিয়া পরমার্থ ধন সঞ্চয় অর্থাৎ সরলতার সহিত জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন করা উচিত। অসত্য ব্যবহারের ফলেই মানুষ ভিতরের শঠতা গোপনপূর্ব্বক মিষ্ট বাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। জাগতিক-লৌকিক ব্যবহারের উন্নতির জন্য কালক্ষেপ অত্যন্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত অন্য কেহ করেন না। লৌকিক জ্ঞানের যতই চর্চ্চা করা হইবে, ততই পারমার্থিক বিচারের কালাভাব হইবে। মেকী সভ্যতার আদরে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, ভাল-মন্দ খাওয়া-পরার চিন্তা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে একান্তভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সভ্যতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই ভক্তকবির ভাষায় মেকী সভ্যতার প্রতি আসক্ত নিজকে ধিক্কার দিতে গিয়া বলিতে হয়,—

ভাল-মন্দ খাই হেরি', পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোনদিন।

* * * *

ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল অনুরক্তি,
যে-পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল।
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি ?
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি ভজিলাম অরি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

———

শ্রীএকাদশী

শ্রীএকাদশী মাধব তিথি। এই একাদশী পালন ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। এই একাদশীর মাহাত্ম্য ও তাহা পালনের অত্যাবশ্যকতা শ্রীমদ্ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বহুগ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই একাদশী নিত্যব্রত। এই তিথি বিষ্ণুর পরম প্রিয়তমা। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য একাদশী ব্রত পালন করিয়া থাকেন। একাদশীতে ভোজন করিতে নাই ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। এই দিনে মহাপ্রসাদ গ্রহণও নিষিদ্ধ। আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিমুখে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানই এই দিনের কৃত্য। ব্রহ্ম-হত্যাতুল্য যাবতীয় পাতক এই হরিবাসর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবতীয় পাতকই ভোজন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণ বলেন, যে একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, গুরুহত্যার পাতকী হয় এবং যমকিঙ্করগণ অগ্নিতে প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র তাহার মুখে নিক্ষেপ করে। মোহবশতঃ বা ভ্রমেও যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে সে পাতক হইতে মুক্ত হয় না।

একাদশীতে ভোজন করা ত' দূরের কথা, কাহাকেও ভোজন করিতে বলিলেও পাপ হয়। পাতকী ব্যক্তি একাকী নরকে গমন করে, কিন্তু একাদশীতে যে অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকে যায়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত শ্রীএকাদশীতে উপবাসাদি করিবেন।

অশৌচাদিতেও একাদশী ত্যাগ করিতে হইবে না। একাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—সকলেই এই একাদশীতে উপবাস করিবেন। কি সৌর, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গাণপত্য—সকলেই এই ব্রত আচরণ করিবেন। শাস্ত্র বলেন, যে হরিবাসরে ভোজন করে, সে সৌর নয়, সে শৈব নয়, সে আশ্রমী নয়, সে তীর্থসেবী নয়, সে চণ্ডাল হইতেও অধম। মহাদেব বলিতেছেন, হে গৌরি! যে দুষ্ট পাতকী আমাকে আশ্রয় করিয়া হরিবাসরে ভোজন করে, সে আমার অপ্রীতিজনক কার্য্য করায় অধঃপতিত হয়। শ্রীবরাহপুরাণ পাঠে জানিতে পারা যায়, দেহের অসমর্থ অবস্থায় ব্রত উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপত্নী বা বিনয়ান্বিত পুত্র কিংবা ভগ্নী বা ভ্রাতাকে উপবাস করাইলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় না। সমর্থপক্ষে নিরম্বু উপবাসই বিধি। অসমর্থপক্ষে কিঞ্চিৎ অনুকল্পের ব্যবস্থা। বালক, বৃদ্ধ, আতুর, রোগগ্রস্ত, যাহার পিত্তাধিক্য আছে—এইরূপ ব্যক্তি রাত্রিতে একবার মাত্র দুগ্ধ-ফল-মূলাদি

ভোজন করিতে পারেন। জল, ফল, মূল, দুগ্ধ ও গুরুবাক্য প্রভৃতিতে ব্রত নষ্ট হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার শয়নে, আমার উত্থানে ও আমার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে যে ব্যক্তি অন্ন বা ফলমূল ভক্ষণ করে, সে আমার বক্ষে শেলবিদ্ধ করে, সে মহা অপরাধী। তাহার অপরাধ আমি কখনও ক্ষমা করি না। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি।

যে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যব্রত পালন করে, সে করস্থিত মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র যাচ্ঞা করে। একবার মাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে জলদ্বারা অর্চ্চন করিলেও সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। প্রসঙ্গাধীন হইয়া বা দম্ভহেতু অথবা লোভবশতঃ একাদশী করিলেও সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে-সকল পাপ করা যায়, একাদশীর উপবাস-দ্বারা তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়। একাদশীর তুল্য পাপ-ত্রাণকারিণী বা ভক্তিদায়িনী আর কিছুই নাই। এই একাদশী ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ, স্বর্গ, রাজ্য, পুত্র, রোগ-নিবৃত্তি প্রভৃতি সকল ফলই দান করিয়া থাকে। গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, যমুনা প্রভৃতি তীর্থ কেহই হরিবাসরের তুল্য হয় না। ছলপূর্ব্বক একাদশী পালন করিলেও অনায়াসে পাতকনাশ ও বিষ্ণুলোক লাভ হয়। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞাদি একাদশীর উপবাসের ষোড়শকলার এক কলার তুল্যও হইতে পারে না। এই একাদশী সকল পাপ ও সংসার-নিস্তারের উপায়স্বরূপ।

যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া ভগবানের প্রিয় এই একাদশী-তিথি পালন করেন, এমন কি, যিনি এই একাদশী ব্রতের কথা শ্রবণ করেন, এই ব্রত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন এবং যিনি এই ব্রত করিবার জন্য অন্য লোকের শ্রদ্ধোৎপাদন করেন, তিনিও সকল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন। কাহারও সঙ্গবশতঃ অথবা ভুলক্রমেও যদি কেহ একাদশী পালন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও যমালয়ে যাইতে হয় না।

যিনি একাদশী ব্রত করেন, তিনি শত পুরুষকে উদ্ধার করেন। একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, আর একাদশীতে ভোজনকারী চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও কিছু নয়। ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই একাদশী-তিথি পরমপুণ্যস্বরূপা, পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতিশয় তুষ্টিদায়িনী। তাহাতে অমূর্ত্ত জগন্নাথ মূর্ত্তিমান্‌রূপে অবস্থিত। এই একাদশী পাপনাশিনী ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী। বিষ্ণুময়ী যে অনন্তশক্তি, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই একাদশী-তিথিরূপে বর্ত্তমান।

একাদশী দুইপ্রকার,—সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা

উচিত নয়। দশমীযুক্ত একাদশী করিলে সন্তান নষ্ট হয় ও মৃত্যুর পরে নরক লাভ হয় এবং তাহার শতবৎসরের পুণ্য নষ্ট হয়। যদি মুহূর্ত্তকাল মাত্রও দশমীর সহিত একাদশী যুক্ত হয় এবং মানব যদি মোহবশতঃ বা ভুলক্রমে তাহাতে উপবাস করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সুখ ও ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধৃতরাষ্ট নিজের পুত্রগণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্রেয় মুনি কহিলেন,—"হে রাজন! তোমার পুত্র-বিয়োগের কারণ এই যে, তুমি ভার্য্যার সহিত দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে।" ত্রিলোকে যত পাতক আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতিথিতে সকলই অবস্থান করে। দশমীযুক্ত একাদশী দিনে উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যার পাপে পাতকী হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে দশমীযুক্ত একাদশীর পালনে অসংখ্য কুফল লিখিত আছে। এমন কি, একাদশী-দিবসে যদি ত্র্যহস্পর্শ হয়, তাহা হইলে সেই একাদশী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস করিবে এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। দশমীযুক্ত একাদশী পালনে এত কুফল! কিন্তু দুঃখের বিষয় স্মার্ত্তগণ বা শাক্তগণ ঐ দিনই একাদশী করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণ কখনও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করেন না। সেইজন্য কোন কোন সময় পঞ্জিকাতে বৈষ্ণবমতে পরাহে অর্থাৎ বৈষ্ণবমতে পরদিনে একাদশীর কথা লিখিত থাকে। একাদশী দশমীবিদ্ধা হইলে দ্বাদশীতে উপবাসই বিধি। আমরা যাহা উল্লেখ করিলাম, এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে একাদশীর অসংখ্য মাহাত্ম্য লিখিত আছে। আমরা যেন এই সকল কথাকে অতিস্তুতি মনে করিয়া অপরাধী না হই, আবার একাদশীর বলে পাপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি না আসে। তাহা হইলে আমাদের কোন সুবিধাই হইবে না।

সকলেরই একাদশী-তিথি নিষ্ঠার সহিত পালন করা উচিত। শ্রীরুক্মিণীদেবী একাদশী ব্রত পালন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ-যশোদাও পূর্ব্বজন্মে একাদশী ব্রত পালন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকেও পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীশচীমাতাকে একাদশী-ব্রত পালনের আবশ্যকতা জানাইয়াছিলেন।

এই একাদশী-তিথি ভক্তিজননী। শুদ্ধভক্তগণ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া সযত্নে এই তিথির পূজা করিয়া থাকেন। তাই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

মাধব-তিথি, ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি',
পরম আদরে বরি॥

শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন-লীলা

মাতা শ্রীযশোদা, গৃহদাসীরে একদা,
কর্ম্মান্তরে করি' নিয়োজন।
গোপালের লীলা স্মরি, গায় গীত উচ্চ করি',
স্বয়ং দধি করেন মন্থন ॥ ১ ॥

পট্টবাস পরিধান, অঙ্গে নানা আভূষণ,
কনক কঙ্কণ মণিচ্ছটা।
রজ্জু করে আকর্ষণ, ভুজচলিত কঙ্কণ,
শোভে গোপী পৃথুকটীতটা ॥ ২ ॥

দোদ্যুল্যমান কুণ্ডল, স্খলিত কবরী মালা,
পুত্রস্নেহে ক্ষরে মাতৃস্তন।
হেনকালে আসি হরি, ধরে মন্থনের নড়ি,
নিষেধ করে দধি-মন্থন ॥ ৩ ॥

মায়ের আনন্দ মন, যত্নে পিয়াইল স্তন,
শ্রীমুখ করিয়া নিরীক্ষণ।
আর স্থানে চুলি-দুগ্ধ, উথলিয়া হয় দগ্ধ,
চিন্তে গোপী কি করি এখন ॥ ৪ ॥

পুত্রেরে ত্যজিয়া মাতা, ত্বরিতে চলিলা তথা,
কৃষ্ণের অতৃপ্ত স্তন-পান।
নয়নাশ্রুপাত করি, দশনে দংশিয়া হরি,
ক্রোধে হৈল অরুণ-বরণ ॥ ৫ ॥

ছোট এক নুড়ি ধরি, দধিভাণ্ড ভগ্ন করি,
গৃহেতে প্রবেশে সর্ব্বেশ্বর।
সদ্যোজাত নবনীত, করে ভক্ষণ নিভৃত,
চৌর্য্য-লীলা করে দামোদর ॥ ৬ ॥

চুল্লীদুগ্ধ নামাইয়া, মাতা আসেন ধাইয়া,
দেখিলেন ভগ্ন দধিভাণ্ড।

মনে গণে নন্দরাণী,　　কোথা গেল নীলমণি,
দেখি' হাসে বালকের কাণ্ড ॥ ৭ ॥
গৃহমধ্যে শ্রীগোপাল,　　দেখিলেন উদূখল,
তত্রোপরি করি' আরোহণ।
শিকার উপরে স্থিত,　　ছানা-সর-নবনীত,
বানরে করেন বিভাজন ॥ ৮ ॥
চৌর্য্যহেতু নেত্রদ্বয়,　　শঙ্কাগ্রস্ত অতিশয়,
পশ্চাদ্‌ভাগে করে নিরীক্ষণ।
আসে মাতা ব্রজরাণী,　　দেখিলেন চক্রপাণি,
হস্তে যষ্টি মন্থর গমন ॥ ৯ ॥
ভয়ার্ত্ত মনুষ্যতর,　　উখলি হৈতে সত্বর,
লম্ফ দিয়ে করে পলায়ন।
যোগিগণ তপোবলে,　　নহে লীন (হরি) পদ-কমলে,
তাঁরে গোপী ধরিতে গমন ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণ-অগ্রে আগুয়ান,　　মাতা পশ্চাৎ ধাবমান,
কবরী হৈতে পুষ্প স্খলিত।
পুষ্প ক্ষরি পিছে ধায়,　　শিশু-পৃষ্ঠে ধরে মায়,
মারণের ভয়ে কৃষ্ণ ভীত ॥ ১১ ॥
কজ্জল-নয়ন-জল,　　মাতার ভয়ে বিহ্বল,
দু'হস্তে চক্ষু মার্জ্জন করে।
পুত্রস্নেহে যশোমতি,　　না জানে অসীম গতি,
সেই পুত্রে দুই করে ধরে ॥ ১২ ॥
শিশু পাছে করে ভয়,　　চিন্তে গোপী অতিশয়,
মনে মনে কোন যুক্তি করে।
অনেক ভর্ৎসনা করি,　　হস্ত-যষ্টি পরিহরি,
দাম দিয়া বান্ধিব তাহারে ॥ ১৩ ॥
যাঁ'র আদি-অন্ত নাই,　　পূর্ব্বাপর নাহি পাই,
যাঁহার নাহি বাহ্য-অন্তর।

নিজপুত্র মনে করি, বান্ধিতে আনেন দড়ি,
উদূখলে বান্ধে দামোদর ॥ ১৪ ॥
অপরাধী ছাওয়ালে, যশোদা বন্ধন-কালে,
না আঁটে দুই অঙ্গুলি দড়ি।
গোপী রজ্জু আনে আর, জোড়ায় দেবী সত্বর,
সেও কমে দু' অঙ্গুলি করি ॥ ১৫ ॥
নিজগৃহে রজ্জু যত, তা' দিয়ে বন্ধনে রত,
তবু শিশু না হৈল বন্ধন।
দেখি' হাসে গোপীগণ, যশোদাও হাস্য-মন,
মাতা হৈল বিস্ময় তখন ॥ ১৬ ॥
অতি পরিশ্রম-তরে, ঘর্ম্ম-জল কলেবরে,
স্খলিত কবরীস্থিত মালা।
করি শ্রম দরশন, কৃপাদৃষ্টি হয় মন,
বন্ধপ্রাপ্ত হৈল গোপালা ॥ ১৭ ॥
অজ-ভব আদি যাঁ'র, অন্ত নাহি পায় পার,
তাঁ'র মায়ায় মুগ্ধ সংসারে।
ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তের অধীন হন,
এইরূপে বাল্যলীলা করে ॥ ১৮ ॥
জগতের মুক্তিদাতা, তাঁ' হৈতে যশোদা-মাতা,
যে প্রসাদ করিল গ্রহণ।
ব্রহ্মা-শিব আদি যত, গুণবতী লক্ষ্মী তত,
বহুযত্নে না লভে তেমন ॥ ১৯ ॥
কর্ম্মী-যোগী-জ্ঞানিগণ, কেবল করেন ধ্যান,
সম্যক্‌রূপে প্রভুরে না পায়।
গোপীসুত ভগবান্, ভক্তের সুলভ হন,
ভক্তি-ডোরে বদ্ধ সদা রয় ॥ ২০ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

দয়া না সেবা ?

মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবাভিমানি-গুরুব্রুবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং শেষোক্তব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্‌গুরু তাঁহার মহাভাগবত লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকারলীলায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা, এবং ভক্ত ও ভগবদ্‌দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গুরুব্রুবগণের আচরণ অন্য প্রকার। তাঁহারা শিষ্যের সন্তাপহারক না হইয়া বিত্তাপহারক। তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই কামক্রোধাসক্ত সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, গৃহব্রত জীববিশেষ। কোন কোন স্থলে যাঁহারা উহাদিগের মধ্যে লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্য অর্চ্চনমার্গীয় প্রাকৃত-কনিষ্ঠাধিকারে নিষ্ঠাযুক্ত তাঁহারাই তাঁহাদিগের ন্যায় সমশীল শিষ্যগণের নিকট শ্রেষ্ঠ-গুরু বলিয়া পরিচিত। এইসকল অসদ্ গুরুব্রুব —শিষ্যহিংসক জীববিশেষ। ঐ সকল গুরুব্রুব নিজেরা চিরকাল প্রাকৃতত্বকেই বহুমানন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের অনুগত-বর্গকেও চিরকাল প্রাকৃতত্ব হইতে আর উন্নত করিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কোন জন্মেই গুরুপদে উন্নীত হন না। এইরূপভাবে তাঁহারা শিষ্যের আত্মার চির অকল্যাণ বিধান করিয়া তাঁহাদের আত্মহিংসক হন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা শিষ্যের দ্রব্যাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন।

কিন্তু সদ্‌গুরুর আচরণ তদ্বিপরীত। তিনি মহাভাগবত-লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী, মধ্যমাধিকার লীলায়ও শিষ্যকে বহুবিধভাবে কৃপা করিয়া গুরুরূপে শিষ্যের হরিসেবন-প্রকৃতির সেবক। তিনি কখনও নিজকে শিষ্যের ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করেন না। গুরুব্রুবগণ ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বংশ-পরম্পরায় শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন।

সদ্‌গুরু মহাভাগবত-লীলায় কিরূপে শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় ভজননিপুণ নিষ্কিঞ্চন-মহাভাগবতপদাশ্রয়ী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। তথাপি উহার কিছু দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। ভজনমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। উভয়স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃতধারা অজস্রধারে প্রবাহিত—উহা আর কিছুই নহে, তিনি চান তাঁহার সকল আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণের

সেবায় মিলিত হউক্। আবার আশ্রিতবর্গও চান শ্রীবার্ষভানবীকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণমোহিনীর, কৃষ্ণনেত্রোৎসবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা অহংগ্রহোপাসনা হইত। তাই বলিতেছিলাম মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃতধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর প্রবাহিত এবং তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়াশীল। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু, চার পাঁচ দিনের বা দু'লক্ষ দশ লক্ষ বৎসরের কিম্বা ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গ-সুখ, ব্রহ্মলোকপ্রদান রূপ দয়া নয় কিম্বা নির্ব্বিশেষবাদীর জ্যোতির্দর্শন, যোগীর ঈশ্বর সাযুজ্য লাভরূপ ফল নয় এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া, ইহারই অপর নাম – মহাবদান্যতা, শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত। তাই সুধীপাঠকগণ বিচার করুন, ইহা কি দয়া না সেবা?

শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম— শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া অজ্ঞ জীবের চৈতন্য উৎপাদনই তাঁহার লীলা। তাই তিনি—

"যারে দেখে তা'রে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ রে॥

যিনি গৌরাঙ্গ ভজনা করিবেন তাঁহার নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত! এত বড় দয়া! তাই বলিতেছিলাম—এ কি দয়া না সেবা?

গুরুব্রুবগণ দয়া করা দূরে থাকুক্ শিষ্যের প্রতি এমন রাক্ষসী হিংসা করিয়া থাকেন যে ঐ রাক্ষসীর করালগ্রাস হইতে ছুটিয়া আসিতে খুব কম লোকেই পারেন। তাঁহার শিষ্যের চক্ষুরুন্মীলন করা দূরে থাকুক্ শিষ্যের ভগবৎপ্রদত্ত নির্ম্মল ও সহজ চক্ষুটীকে পর্য্যন্ত এতদূর অন্ধ করিয়া দেয় যে, উহারা জীবনে আর কখনও সত্য-সূর্য্যের আলোক দর্শন করিতে পারে না। এই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া করিবার জন্যই ভগবৎপ্রেরিত নিজজনগণ যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কতই না লাঞ্ছিত, উপহসিত হইয়াও চৈতন্যবিমুখ জীবের নিকট শ্রীচৈতন্য বিতরণ করিবার প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

গুরুব্রুবগণ যতই বৈষ্ণবাভিমান ও 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ভান প্রদর্শন করিয়া বোকা লোককে ফাঁকি দিন্ না, তাঁহারা মহাদাম্ভিক ও মহাহিংসক। আর সদ্গুরুই যথার্থ 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মহাবদান্য'। সদ্গুরু ব্যতীত গুরুব্রুবগণ কখনও—

"কাকেরে গরুড়" করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত, কখনও শিষ্যের সেবকাভিমান করিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের সে অবস্থা হয় নাই। তাঁহারা স্ত্রীপুত্রজিত হইয়া 'শালটা, কাপড়টা'র জন্য, কিম্বা দগ্ধোদর পূরণার্থ শিষ্যের সারমেয় বৃত্তি করিয়া থাকেন এবং শিষ্যের মুখাপেক্ষী হওয়াতে কখনও নিরপেক্ষ-ভাবে শিষ্যকে কোন মঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে সাহসী হন না।

কিন্তু মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্‌গুরু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। শিষ্যানুবন্ধ তাঁহার নাই। কিন্তু আবার যেজন্য হরিভজন করেন, সেই শিষ্যের তিনি সেবকাভিমানী।

গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে গুরুপদে উন্নীত করিতে পারেন না, কিন্তু সদ্‌গুরু তাহা পারেন। যেমন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রগণকে পড়াইয়া উহাদিগকে পাশ করাইয়া আবার কলেজের প্রফেসর্ করিয়া দিতে পারেন। প্রিন্সিপাল যেরূপ সিনিয়র প্রফেসরের ন্যায় কার্য্য করেন, তদ্রূপ সদ্‌গুরু ও মধ্য-মাধিকারলীলা প্রদর্শন করিয়া শিষ্যগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় বলেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

গুরুব্রুবগণ সর্ব্বদাই নিজদিগকে 'গুরু' বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা আর অপরকে কি করিয়া গুরুপদে উন্নীত করিবেন? অধ্যাপক (প্রফেসর্) অভিমানী নিকৃষ্ট ছাত্রপ্রতিম ব্যক্তি কি কখনও অপর ব্যক্তিকে অধ্যাপক করিয়া দিতে পারেন? তাই দেখিতে পাওয়া যায় গুরুব্রুবগণ শিষ্যহিংসক; আর সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রতি নিরতিশয় দয়ালু। পাঠকগণ এখন বিচার করুন, সদ্‌গুরুর দয়া কিরূপ দয়া; ইহা দয়া না সেবা?

———

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর নবদ্বীপ-ধামবাসী

বৈষ্ণবগণ-বন্দনা

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥

জয় ভকতিবিনোদ, যাঁ'র নামেতে আমোদ,
দরশনে পবিত্রতা গুণ।
মায়াপুর জন্মস্থান, করি' পুনঃ জাগরণ,
লোক-বাঞ্ছা করিলা পূরণ॥

সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, বিশ্বম্ভর আবির্ভূত,
শচী-জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে।
সুর-নর বাস করে, গৌর দেখে নিরন্তরে,
সংকীর্ত্তন নদীয়া-নগরে॥

গৌরধাম পরিক্রমা, নাহিক যার উপমা,
সবে চলে গৌরাঙ্গ দেখিতে।
অনুরাগে চলি' যায়, গৌর-গুণ সবে গায়,
আনন্দেতে লোক নাচে পথে॥

ভকতিবিনোদ পা'য়, অসংখ্য প্রণমি তায়,
চাহি গৌরপদে প্রেম-ধন।
সবারে প্রণতি করি, আমি অতি দুরাচারী,
শিরে ধরি সবার চরণ॥

গৌরধামবাসী, করহ আশীষ,
তোমার চরণ ধরি।
কৃপা কর মোরে, কহি করযোড়ে,
তুমি ভক্তি-অধিকারী॥

গৌরধামে বাস,　　পরম উল্লাস,
তোমার হৃদয়ে জাগে।
গৌর দয়াময়,　　তোমারে সদয়,
দেন প্রেম-ভক্তিযোগে॥
গৌর-নামাশ্রয়,　　করিয়া হৃদয়,
অনুরাগে সদা গাও।
তুমি মহাবিজ্ঞ,　　সাধ নাম-যজ্ঞ,
ভুবনে পূজিত হও॥
গঙ্গা-নীরে স্নান,　　কর গঙ্গা পান,
গৌরভক্তি মোরে দাও।
গৌর-প্রসাদান্ন,　　তাহে মান ধন্য,
নামে-প্রেমে মত্ত রও॥
এই হতভাগে,　　ভক্তি-বর মাগে,
করি বিনয়-কাকুতি।
পড়িয়াছি দুঃখে,　　রাখ মোরে সুখে,
দিয়া নির্গুণা ভকতি॥
ষড়্‌রিপু মোরে,　　স্ব-স্ব বলে ধরে,
যবে যে প্রবল হয়।
অসত্যে ডুবায়,　　নানা কামনায়,
অস্থির করিয়া লয়॥
ত্রিতাপ অনল,　　করয়ে বিকল,
কি করি আমি উপায়।
কাতর হইয়া,　　অগতি দেখিয়া,
কহিতেছি তুয়া পায়॥
আমি তব দাস,　　না হও উদাস,
অদোষদরশী তুমি।
শতদোষে দোষী,　　সর্ব্বদোষ নাশি',
ক্ষমা কর অন্তর্যামী॥

হে দীন-দয়াল, দেখিয়া কাঙ্গাল,
দয়া কর দীনজনে।
সংসার-জঞ্জাল, ভুঞ্জিয়ে কেবল,
সোয়াস্তি নাহিক মনে॥
ঘুচাইতে পার, তুমি শক্তিধর,
তোমা সম নাহি আন।
দয়ার ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
পতিতে করহ ত্রাণ॥
তারিতে পামর, স্বভাব তোমার,
অহৈতুকী কৃপাগুণে।
হরিয়া দুষ্কৃতি, দেহ প্রেম-রতি,
রাখ তব সন্নিধানে॥
তোমার প্রভাবে, সব দোষ যাবে,
পাব আমি পবিত্রতা।
তোমার আচার, করিয়া বিচার,
যাবে মম অজ্ঞানতা॥
তোমার সঙ্গেতে, শুনিতে শুনিতে,
গৌরাঙ্গের গুণগাথা।
তোমার প্রসাদে, রহিব আনন্দে,
যাবে ভবরোগ-ব্যথা॥
এই অভিলাষ, পূর্ণ কর আশ,
হও মোরে পরসন্ন।
মানব-জনম, সাধি' ভক্তিধর্ম্ম,
অধম হইবে ধন্য॥

শ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—

—শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা

তমালতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ

ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুরুক্ষেত্র। জগতের মধ্যে পরম পবিত্র ভূমি কুরুক্ষেত্র। মানবের একমাত্র নিত্যসত্য ধর্ম্মের প্রচারস্থলী কুরুক্ষেত্র। এ সেই স্থান—যেথান হইতে স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শাশ্বতী বাণীর নির্ম্মল ধারা জগতের কৈতবরাশি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং যে বাণীর আশ্রয়ে ভারত—মহাভারত।

আজ সে স্থলে যুযুধান কুরুপাণ্ডব পক্ষ সমবেত। বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের রথ উভয়দলের মধ্যদেশে স্থাপিত। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ যে কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত। গুরু, শিষ্য, পিতামহ, পৌত্র, ভ্রাতা ও বন্ধু প্রত্যেকেই যেন কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণায় পরস্পরের প্রাণ লইতে প্রস্তুত। এ কি ভীষণ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ কোথায়?

চেয়ে দেখ কে ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলানিকেতন অপার্থিব আনন্দের অনুপম মূর্ত্তি, অনন্ত জ্ঞান উদ্ভাসিত আননে সব্যসাচীর সারথিরূপে উপবিষ্ট। হে ভারত! ইনি সেই 'বেদান্তবেদ্য' উপনিষদ্‌মূর্ত্তি অর্জ্জুন সখা।

কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ—বড় বিষাদগ্রস্ত ম্রিয়মানচিত্তে মলিন মুখে রথোপরি আসীন। নিত্যসত্য রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে যে প্রশ্নের উদয় হয়, সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা আজ তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিতেছে। "কে আমি? এ কি করিতেছি? আমার কর্ত্তব্য কি?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি শ্রীভগবানের চরণে কাতরস্বরে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিলেন। হে জনার্দ্দন,—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

হায়! রাজ্যসুখলোভে এ কি মহৎ পাপ করিতে আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা মনে করিলেও সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। পরিবার, সমাজ আত্মীয়স্বজন—প্রভৃতি নিজের বলিতে যাহা কিছু সকলি ত' শেষ হইবে। কুল, আশ্রম ও জাতিধর্ম্ম সমস্ত ধ্বংস হইবে। দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! তুমি আমায় এ কি ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ! ইহা হইতে শত্রুহস্তে আমার নিজের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

শ্রেয়ঃকামীর শ্রেয়ো নির্দ্দেশ কামনায় এ বড় কঠিন সমস্যা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ কথা আজ যদি কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মুখ

হইতে বাহির হইত তাহা হইলে সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিকদিগের বাহবার বহরে নিশ্চয়ই তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত। আর নৈতিক হিসাবে এহেন পবিত্র সন্দেহের পরেও যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন তখন তাঁহাকে **Diabolical machinator** বলিতেও অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষী কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজবদ্ধ অবস্থায় যখন কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বসবাস করিতে থাকে এবং সেই সমাজ ও দেশের সহিত তাহার ভোগমূলক স্বার্থ বেশ জটিল হইয়া জড়াইয়া পড়ে তখন এহেন সত্যবিস্মৃতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। সঙ্কীর্ণ সমাজ ও পরিচ্ছিন্ন দেশরক্ষা তাহার একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে এবং ইহার জন্য সে যে তথাকথিত ত্যাগের অনুষ্ঠান করে তাহাতে সকলেই তাহার খুব পক্ষপাতী হয়, কারণ সে ত্যাগে যে সবারই স্বার্থের পরিপোষক ও সুবিধাবাদমূলক। আজ তাই ক্ষাত্রনীতিপর ও সমাজসংস্কারকে ঈশ্বরের আসনে বসাইতেই যেন জগৎ ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যস্ততা যে কত জড়ীয় স্বার্থময় ও বিচারশূন্য তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কারণ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ বহু সম্মানিত নেতা যদি সাধারণের মতের বিরুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কিছু করিতে যান, তবে তাহাকে পদদলিত ও ধূলি ধূসরিত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এ উদাহরণ আজ কোন দেশেই বিরল নহে।

কিন্তু সমাজ ও দেশে বলিতে কি বুঝা উচিত? সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে এক মানুষই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ইহার মূলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। সে বুদ্ধির শক্তিতেই অনেক হীনবল হইয়াও পশু জগতের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। কিন্তু এ বুদ্ধি বস্তুটি কি? ব্যতিরেকভাবে বিচার করিলে আমরা দেখি যে ক্রমবিকাশপথে মানুষ যখন জন্মান্তরের মধ্য দিয়া পশুত্ব হইতে মানবত্বে স্থাপিত হয়, তখন এই বুদ্ধিবৃত্তিটি তাহার আশ্রয়। কিন্তু ইহার বিকাশ হয় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটী সময় উপস্থিত হয়, যখন মানুষ পশ্বাদির মত পারিপার্শ্বিকের অন্ধ অনুচর না হইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে উদ্যোগী হয়। "কে আমি কেন এই ক্ষণবিধ্বংসী বাহ্যজগতের ক্রীড়নক হইয়া জীবনের ভার বহন করিব।" এই প্রশ্ন তাহার অন্তরে অন্তরে গূঢ়ভাবে জাগরিত হইতে থাকে। এবং এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহার বাহ্যজগতে উপর আধিপত্য করিবার প্রয়োজন এবং তাহার ফলেই যে সমাজ সভ্যতা ও পরিবারের সৃষ্টি এ কথা সামান্য অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন সুধীমাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু মানবজীবনে বহু জন্ম ধরিয়া মানুষের জড়াভিনিবেশ প্রবল থাকায়

আত্মার মূল স্বরূপবৃত্তি আচ্ছন্ন থাকে। এই অবস্থাতে সে সমাজ সভ্যতার উন্নতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিচার করে। অবস্থা বিশেষে এ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা যখন জীবনের মূল উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি আনয়ন করে তখন সত্য প্রতিহত হয়েন এবং ফলে অমঙ্গল অশান্তি ও অনাচার বা মূঢ়াচার হয় সে অবস্থার নিত্য সহচর। অর্থাৎআত্মধর্ম্মের পরিপন্থী সমাজ ও সভ্যতা পাপ ও তথাকথিত পুণ্যের প্রকটভূমি অশান্তির আশ্রয় বাইবেলে যীশুর একটী কথায় এই ভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—"আত্মাকে হারাইয়া সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভে কি ফল?" ভগবান্ তাহা প্রপন্ন শিষ্যকে উপদেশ দিলেন,—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মনমাত্মনা ॥
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

হে অর্জ্জুন! বুদ্ধির যে নিয়ামক সেই আত্মার স্বরূপবোধ হইলে তোমার আর কামনামূলক অবরধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকিবে না। তুমি কামজয়ী হইবে। কিন্তু এই আত্মেতর অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হওয়াই কি জীবনের উদ্দেশ্য। ভুল ভাঙ্গার পর যখন নিত্য সত্যের দর্শন করিলাম, তখনই কি আমার ছুটী? আত্মা ত' নিত্য শাশ্বত বস্তু। তাহার বৃত্তিও চিরন্তন মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তি যে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যঃ বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

তাহা হইলে আত্মার এই অমৃতলোকে অবস্থিত মানবের কর্ত্তব্য কি?

ইহাই সমস্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা গীতার চরম শ্লোকের মধ্যে পাইয়াছি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

হায়রে অন্ধমন এত বড় আশার বাণী শুনিয়া কেন সংসারের পাপপুণ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাও? কেন ক্ষণিক অবরধর্ম্মের কুহকে অন্ধ হইয়া নিত্য সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতেছ? ঐ শোন বজ্র-নির্ঘোষ শব্দে শ্রুতি কি বলিয়াছেন,—

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।

আত্মাকে যে নির্ব্বিশেষ পঙ্গুকায় অথবা তাহাকে হীন অবরধর্ম্মে নিযুক্ত করে তাহারা উভয়েই ভীষণ অন্ধকারময় মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর কেন, প্রতি মুহূর্ত্ত যে মরণের গভীর গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! যাও যিনি ভগবানের সেই চির আশার বাণী জগতে প্রচার করিতেছেন তাঁহার পদাশ্রয় কর তোমরা নিত্য আত্মধর্ম্ম অবগত হইবে। ভাইরে সাধু, সাধুসঙ্গ বিনা গতি নাহি আর। অহৈতুকী **সাধুসেবা** সর্ব্বধর্ম্ম সার।

—**শ্রীযদুনন্দন অধিকারী**

বৈষ্ণব কি হিন্দু?

একথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত' অবাক্ হইবেন, কারণ সাধারণের ধারণা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত অন্যান্য ধর্ম্মের অন্যতম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখাবিশেষ, সুতরাং বৈষ্ণব—হিন্দু। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপটী সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ হিন্দু-শব্দবাচ্য নহেন, বৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন বৈষ্ণব কখনও "পাষণ্ডী হিন্দু" নহেন। হিন্দুকুলোদ্ভূত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত ব্যক্তি সকলেরই বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা আছে, একথা সত্য। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, সমগ্র পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন দেশস্থ, গ্রামস্থ, নগরস্থ যে কোনও প্রাণীর আত্মবৃত্তি পরিস্ফুট হইলে তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু বৈষ্ণবকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নামে অভিহিত করিলে "বৈষ্ণব" বলিতে যে বস্তুটী সেইটী উদ্দিষ্ট হয় না। যাঁহারা বৈষ্ণবকে হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি বলিয়া জানেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আমরা বৈষ্ণবের স্বরূপ এবং "বৈষ্ণব" কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্তে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধে বিকৃত মনঃকল্পিত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে যাঁহারা তথাকথিত বৈষ্ণব, তাঁহারা এতদূর বিরূপধর্ম্মগ্রস্ত যে, তাঁহারাও এই ভুলটি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিচয় দিতে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করেন—"আমরা হিন্দু, আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি।" এইরূপ পরিচয় বৈষ্ণবের যোগ্য নহে। বৈষ্ণব নিজের পরিচয় বলিতে তাঁহার নিত্যস্বরূপের পরিচয়ই দিয়া থাকেন। তিনি নিজকে ভগবানের দাসানুদাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাস, তাঁহার দাসাভিলাষী দাস বলিয়া পরিচয় দিতেই নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কারণ ইহাই বৈষ্ণবের স্বরূপের পরিচয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় আমাদিগকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন। তিনি জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া "তুমি রাম, শ্যাম, যদু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, বিষয়ী অথবা পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, কিম্বা সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন এইরূপ কিছু উত্তর প্রদান করেন নাই। জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণের নিত্যদাস। প্রত্যেক জীবই স্বরূপে কৃষ্ণদাস। এমনকি মহাপ্রভু জীবকে নারায়ণ দাস বা বিষ্ণুদাস পর্য্যন্ত বলেন নাই। অতাত্ত্বিক বিরূপধর্ম্মগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মনে করিবেন, "এটী মহাপ্রভুর গোঁড়ামি মাত্র।" কিন্তু মূর্খ মায়িক ধর্ম্মাধীন ব্যক্তিগণ যদি কোনদিন ভগবৎকৃপালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেদিন জানিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক জীবই সেই পরম তত্ত্বের অংশ ; সর্ব্বাবতারী পরম ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যাঁহারা নিজদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রহ্মোপাসকরূপে অভিমান বা নারায়ণের দাসরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদেরও স্বরূপে সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতির মূলতত্ত্ব, নারায়ণের চিত্ত-বিত্ত-হরণকারী সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবকের যোগ্যতা নিত্য থাকিয়া প্রতীতি সুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু একমাত্র হ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত জীবের সেই চরমদাস্যে অধিকার লাভ হয় না। নারায়ণের উপাসকগণও কৃষ্ণেরই দাস, তাঁহাদিগেরও স্বরূপে কৃষ্ণদাসের যোগ্যতা রহিয়াছে। বিষ্ণুদাসগণ সকলেই মূলপুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। যে-সকল মহাসৌভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণাকর্ষিণী হ্লাদিনীর সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই একমাত্র সেই স্বরূপটী উপলব্ধি হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

যাঁহারা বিরূপগ্রস্ত তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যস্বরূপটী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাই স্বরূপবিস্মৃতি-ক্রমে বিরূপগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা নিজদিগকে কখনও হিন্দু, কখনও যবন-ম্লেচ্ছ, কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, কখনও সুখী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন, কখনও মহামায়ার সেবক, কখনও কামনাদাত্রী দেবতার পূজক প্রভৃতি অভিমান করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুদাস্যকে গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা মাত্র মনে করিয়া ক্রমশঃ আরও বিরূপতাকে লাভ করিয়া থাকেন। তাই সাধু শাস্ত্র বলিয়া থাকেন, জীব মাত্রই বৈষ্ণব—"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।" সুতরাং

বৈষ্ণব কখনও হিন্দু বা অহিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিও ইহাই—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

আমরা নিত্য ভগবদ্দাস। ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্য ধর্ম্ম। ভগবৎ-সেবকরূপে পরিচয়ই আমাদের নিত্য অভিমান। আমরা আমাদের স্বস্বরূপে নিত্য ভগবৎকিঙ্কর। ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যই আমাদের স্বধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম। আমরা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারি আমরা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ নানাবিধ পরিচয়ে পরিচিত বস্তু নহি। আমরা হিন্দু নহি, আমরা ম্লেচ্ছ নহি, যবন নহি, আমরা কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, খসাদি নহি, আমরা কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ নহি। আমরা "ভগবানের নিত্যদাস"।

আমাদের এই নিত্য-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা আজ নিজদিগকে তর্কী বা (তুরস্ক) টার্কস্ বলিবার জন্য, 'হিন্দু বা শ্রৌত' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অতব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হিন্দুর ধর্ম্ম বা দেহ ও মনের ধর্ম্ম রক্ষা করাকেই জীবনের ব্রত ও চরম প্রয়োজন মনে করিতেছি। অহিন্দু হইতে পৃথক্ হইবার বাসনায় হিন্দুর নামে পরিচয় দেওয়াকেই বড় একটা গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি, কত মণ্ডলী সভা-সমিতি রচনা করিতেছি, হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষার্থ কত ভাবেই না যত্ন করিতেছি। হায়! মহামায়া আমাদের চক্ষুকে এইরূপেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

গৌড়দেশে আজ বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকেই আমরা আমাদের বরণীয় মহাজন বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কারণ, তিনি আমাদের হিন্দুত্ব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণমালার এই অনিত্যাভিমান লইয়া ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই আমরা ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য হইয়া আত্মধর্ম্মযাজি ঐকান্তিক বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ করিতে শিখিয়াছি। তাঁহাদিগকে সদাচারভ্রষ্ট হিন্দুধর্ম্ম বিবর্জ্জিত মনে করিতেছি। তাই, অদ্বৈতাচার্য্য আমাদের বিচারে হিন্দুকুলোদ্ভূত হইয়াও হিন্দুসদাচার বর্জ্জিত। কারণ, তিনি ভগবদ্ভক্তকে আদর করিতেন। নিত্যানন্দ হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইয়াও আমাদের বিচারে অসদাচারী। কারণ, তিনি মহাপ্রসাদমাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের ন্যায় বঞ্চিত ব্যক্তির ধারণানুযায়ী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিরোধাচরণ (?) করিয়া মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ-বিচার বা জাতি-বিচার (?) দেখাইয়াছিলেন বলিয়া "আমার ন্যায় **'পাষণ্ডী হিন্দুর'** নিকট তিনি আমার ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রদাতা অর্থাৎ বঞ্চনাকারী একজন আমার বিরূপধারণার ছাঁচে গড়া একজন সদাচারী।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই "পাষণ্ডী হিন্দুর" একটী চিত্র তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।—

*　　*　　*

হেনকালে **'পাষণ্ডী হিন্দু'** পাঁচ সাত আইল ॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্যগীতবাদ্য যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥

কলিযুগপাবনাবতারী, একমাত্র যুগধর্ম্মপালক শ্রীগৌরসুন্দরের বিরুদ্ধে একদিন হিন্দুনামে পরিচিত স্মার্ত্তগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। কারণ, নিমাই

তাঁহাদের ধারণানুযায়ী মনোধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া জীবমাত্রের একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম কীর্ত্তনাখ্য ভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 'হিন্দু পাষণ্ডীগণ' তাহাদের পারম্পর্য্যপ্রাপ্ত 'মেয়েলী' ধর্ম্মকেই তাঁহাদের হিন্দুয়ানী বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেয়েলী হিন্দুয়ানী ধর্ম্মমতে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ এবং তদুপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য কোলাহলে কোন দোষ নাই, কারণ উহার দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও হরিবৈমুখ্য বা পাষণ্ডতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিমাই পণ্ডিত তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় বাহ্যপ্রতীতিতে তাঁহাদেরই মত উপনয়ন, বিবাহ, মাতৃপিতৃসেবা, গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে-সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণায়—"পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।" কিন্তু তিনি যখন ঐরূপ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল কর্ম্মীর ধারণাকে গদাধরের পাদপদ্মে চাপা দিয়া আসিবার অভিনয় দেখাইলেন এবং যখন গৌড়দেশে আগমনপূর্ব্বক নিজ আত্মধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্য-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন, তখন নিমাই তাঁহাদের ধারণায়—"গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।" কূপমণ্ডুক তাঁহারা যতটুকু ক্ষুদ্রতাকে বড় বলিয়া, শ্রেষ্ঠ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মনোধর্ম্ম যতটুকু ক্ষুদ্র ধারণাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছে সেই মনোধর্ম্মের ছেদনকারিণী কথাই তাঁহাদের নিকট 'বিপরীত কথা' বা নূতন কথা। তাই ভগবানের উৎকীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, করতাল শব্দ তাঁহাদের "কর্ণে লাগে তালি।" তাঁহারা এতদূর দেহৈকসর্ব্বস্ব, দেহারামী, গেহারামী, হরিবিমুখ যে তাঁহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না যে, বহুপূর্ব্বের তাঁহার যৌবনাবস্থায় যখন ভদ্রসমাজে চলাফেরা করিতেছেন, পুত্রাদির পিতা বা মাতা হইয়াছেন তখন আর তিনি নগ্ন বা নগ্না নহেন। মহামায়ার কপট কৃপায় তাঁহাদিগের ধারণা এতদূর বিপর্য্যস্ত। তাই, তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

"নিমাই নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥"

"আমরা যা'কে সেদিন তাহার বাল্যকালে খেলাধূলা করিতে দেখিলাম সেই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র আমাদেরই মত মানুষ, আমাদেরই ছেলেপিলের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি মাত্র। আজ একটু বয়সে ও বিদ্যায় বড় হইয়া 'নিমাই' নামের পরিবর্ত্তে নিজকে অপরের দ্বারা 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করাইতেছে! এই ব্যক্তি হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই পাষণ্ডতা প্রচার করিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম—বিষহরি মঙ্গলচণ্ডী পূজা, বারমাসে তের-পার্ব্বণ, মৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধকরণ, বিবাহাদি করিয়া উত্তম নিরীহ বাহক পশুর ন্যায় গৃহব্রতধর্ম্মযাজন, আহার নিদ্রা ভয়,

মৈথুনাদি করিয়া এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ, পরকালের ভয়ে দান-ধ্যানাদির দ্বারা ইহ জগতে বহির্ম্মুখ লোকদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহকরণ ও স্বর্গাদি লাভের জন্য যত্নকরণ। উদরভরণ ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গা ছায়াশক্তির জাগতিক অভিজ্ঞান রচিত নামের সহিত ভগবানের নিত্যস্বরূপ প্রকাশক নামের সমন্বয় বিধান করিয়া কখনও কখনও ভগবৎস্বরূপ নামের প্রতিবিম্বাভাস মাত্র গ্রহণ এবং ধর্ম্ম, হুত, ব্রতাদির সহিত ভগবন্নামের সাম্যজ্ঞান, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতিই হিন্দুর ধর্ম্ম। যেহেতু এই ব্যক্তি আমাদের এই সকল মনোধর্ম্মের বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন, সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম্মবিনাশকারী। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া অনেক নীচ জাতি লইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে নীচ জাতির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে, এই পাপে নিশ্চয়ই নবদ্বীপ 'উজাড়' হইবে! কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র ত' অন্যান্য জপমন্ত্রের ন্যায়ই! আমরা ত' জানি মন্ত্র কখনও অপরলোককে শুনাইতে নাই, অন্যলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আর নিমাই উহাকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে লোকের নিকট চীৎকার করিয়া জানাইতেছে। এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্যদ্বারা এ ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিমত প্রচার করিতেছে।"

ঐ সকল বহ্বীশ্বরবাদী চিজ্জড়সমন্বয়কারী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নামকে কর্ম্মাঙ্গ-বিবেচনাকারী 'পাষণ্ডী হিন্দু' শ্রীগৌরসুন্দরকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অবশেষে কাজীর চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন, কাজীকে গিয়া বলিলেন,—এই নিমাই মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে অনেক বাধা জন্মাইতেছে, সুতরাং তুমি গ্রামের ঠাকুর হইয়া এ ব্যক্তিকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।

গৌড়ীয় পাঠক-পাঠিকাগণ! জগতে এখনও এইরূপ উদাহরণের অসভাব নাই। শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধ করিবার জন্য 'পাষণ্ডী হিন্দু' মহামায়ার কৃপায় জগতে চিরকালই অবস্থান করিবেন। এখনও আমার ন্যায় ব্যক্তি 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া মনে করেন, আমার কৌলিক ও লৌকিকপারম্পর্য্যপ্রাপ্ত বিকৃতধারণাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত শুদ্ধ আম্নায়পারম্পর্য্যগত বাস্তব সত্য—(যেহেতু উহা আমার মনোধর্ম্মের নিকট বিপরীত ও নবীন বলিয়া প্রতিভাত, সেইহেতু) উহা ধর্ম্মবিরোধিমত! বাস্তব সত্য চিরকালই আমি বা আমার সমজাতীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তনগণের মনঃকল্পিত ধর্ম্মের বিপরীত—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি এতদূর 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্য আমার যাবতীয় প্রয়াস নিযুক্ত করিয়াছি। আমি অনেক সময় বৈষ্ণবের চেহারা লইয়া 'লোক-দেখান বৈষ্ণব' সাজিয়া পাষণ্ডী

হিন্দুয়ানী' করিবার সুযোগ করিয়া লই। আমি বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া, বিষ্ণু ও বৈষ্ণববংশ্য বলিয়া জগতে প্রচার করিয়া কার্য্যতঃ 'স্মার্ত্তপাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়ি। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিয়া আমার পাষণ্ডতা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিয়া থাকি—'এ ব্যক্তিকে সেদিন দেখিয়াছি, এ ব্যক্তি আবার এখন নিজের পিতামাতার দেওয়া নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজকে নূতন নামে "বোলাইতেছে", এ ব্যক্তি আমার মত গৃহব্রত ধর্ম্ম আচার-প্রচার না করিয়া, 'পাষণ্ডী হিন্দু' না হইয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের পদলেহনকারী না হইয়া শুদ্ধভগবদ্ভক্তি প্রচার করিতেছেন! বিষ্ণু ও বৈষ্ণবপূজাকে, শ্রীনামকীর্ত্তনকে, শ্রীভাগবতগ্রন্থকে কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান না করিয়া, মহাপ্রসাদ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া, আমার ধারণানুযায়ী 'নীচ ব্যক্তিগণের' আস্পর্দ্ধা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাস-জ্ঞানে সম্মান দিয়া আমার কৌলিক ও লৌকিকপরম্পরাপ্রাপ্ত মেয়েলী ধর্ম্মের বিরোধাচরণ করিতেছে! এইরূপ ভাবিয়া আমি অনেক সময় শুদ্ধ বৈষ্ণবকে নির্য্যাতন (?) করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ও সঙ্কল্প করিয়া থাকি। কিন্তু যখন বৈষ্ণবের ঐশ্বর্য্য আমার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা প্রতিপন্ন করিয়া দেয়, তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া বিধর্ম্মীর অর্থাৎ বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করি না। উহার নিকট তখন গিয়া বলি—এ বিপদে তুমি আমার ভাই ও বন্ধু। ঐ যে শুদ্ধ বৈষ্ণব দেখিতেছ—এ ব্যক্তি তোমার বিরোধ করিতেছে অর্থাৎ তোমার কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছে, ইহাকে তুমি তোমার অধীনস্থ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। তুমিই সমাজের একচ্ছত্র নেতা, দণ্ডমুণ্ডবিধাতা। আর আমি যে বৈষ্ণব সাজিয়াছিলাম—ওটা কিছু নয়, আমিও তোমারই অধীন, আমিও ব্রাহ্মণ, তুমিও ব্রাহ্মণ, সুতরাং এখন বৈষ্ণবের সঙ্গে বিরোধ করা যাক্। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে তাড়ান যাক্। আমি উদরভরণ, কনককামিনী সংগ্রহের জন্য যে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজনের অভিনয় করিব সেটা তোমারই শাসনের অধীনস্থ থাকিবে অর্থাৎ আমার অভিনীত বৈষ্ণবধর্ম্ম কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অধীন হইবে।

পাঠক-পাঠিকাগণ! আচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু এইরূপ চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 'পাষণ্ডী হিন্দু' বলিয়াছেন। এইরূপ 'পাষণ্ডী হিন্দুগণ' কর্ম্মজড়, মুখে—কৃষ্ণবিষ্ণুগৌর-নিত্যানন্দ মানিলেও সম্পূর্ণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পৌত্তলিক হইয়া বিধর্ম্মীর অনুগত হইতে স্বীকৃত, নাস্তিক কর্ম্মজড়ের পদলেহন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত হইলে পাছে তাঁহাদের গৃহব্রত ধর্ম্ম হইতে ছুটি হয়, পাছে অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের কোনও রূপে

আত্মমঙ্গলের পথটী পরিষ্কৃত হয়—এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সতর্ক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ন্যায় পরদুঃখদুঃখী গৌরজন ব্যতীত আমাদিগকে এরূপ পাষণ্ডতা হইতে আর কে উদ্ধার করিবেন, আর কেই বা শাস্ত্রযুক্তি ও বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিবেন? নিষ্কপটে গৌরজনের পদাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের এরূপ স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত অনিত্যাভিমান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। আমরা যেন আর "পাষণ্ডী হিন্দু" হইবার জন্য আগ্রহান্বিত না হই। আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস। আমরা যেন নিষ্কপটে গৌরজনের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
তদ্ ভৃত্য-ভৃত্য পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর]

'বিরহ'-শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একেবারে শেষপর্য্যন্ত রাধারাণীর কথা এনে ফেলেছেন। যেখানে বললেন,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

কথাটী মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলেছেন। আবার কৃষ্ণবিরহে তিনি এই শ্লোক উচ্চারণ করেছেন। এখন বক্তব্য এই,—যদি কারও সঙ্গে মিলন হয় তবে বিরহের কথাটা আসে। বিরহ-বাসর, বিরহ-সভা কথাগুলো অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। গৌড়ীয় সাহিত্যে বিরহ-শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, রাহিত্য ও সাহিত্য দুটোই আছে। রাহিত্য হল সেই জিনিষটা যার ভিতরে মূল তাৎপর্য্য নাই। প্রাকৃত জড়ীয় চিন্তা থেকে রাহিত্য ব্যাপারটা এসেছে। কিন্তু সাহিত্য হল সেইটা যার মধ্যে বাস্তবতার উপলব্ধি, ঠিক ঠিক ব্যাপারটা যেখানে প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন মানুষ একজন মানুষের অভাবে কান্নাকাটি করে, রোদন করে স্বভাবতঃ, কিন্তু বিরহ-শব্দ তেমনভাবে ব্যবহার হয় না। এ শব্দটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সাধারণ ক্ষেত্রে সংসারে মিলন এবং বিচ্ছেদ একরকমের; কিন্তু ভগবান্ এবং অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের যে অভাববোধ, সেটা অন্যপ্রকার। সে বিরহে জ্বালা আছে বটে

কিন্তু প্রাকৃত জড়ীয় কোন জ্বালা নাই। সে বিরহ মিলনেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। জড়জগতে অভাববোধে মানুষের যে কান্নাকাটি এতে মানুষের চিত্ত কলুষিত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত ভাববিভাবিত যে বিরহ সেটা সাধক-সাধিকাকে উন্নতস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। সেখানে জড়জগতের দুঃখ-কষ্টের কোন কথা নাই। আমরা অপ্রাকৃত বিরহীর মুখে একথা শুনতে পাই—মিলন এবং বিরহ দুটো একই তাৎপর্য্যপর। সাধারণ কবি বলেছেন,-- "দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" এটা এক ধরণের চিন্তা। কিন্তু অপ্রাকৃত সাহিত্যিক যাঁরা তাঁরা বলছেন, মিলন এবং বিরহ একই তাৎপর্য্যপর এবং উভয়ক্ষেত্রে পরস্পর মিলন এবং বিরহের কথা আলোচিত হতে পারে। বিরহবাসরে মিলনের কথা আলোচিত হতে পারে, আবার মিলনক্ষেত্রে বিরহের কথা আলোচিত হতে পারে। এটা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক—এই কথা বলছেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় সৎসঙ্গের, সাধুসঙ্গের মহিমা-মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। সাধুর মুখনিঃসৃত যে বাণী সেটা আমাদের অনর্থ দূরীভূত করে এবং সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

একটা প্রশ্ন এখানে,—সাধু এবং সাধুর কথা (বাণী) দুটো identical কি না? কিছু কিছু ব্যক্তি প্রশ্ন করেন আমাকে, প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তথাপি আজ এই আসরে আলোচনার অবসর এল।

ভগবান্ এবং ভগবানের মুখের বাণী দুই-ই এক—identical, equal in all respect। সাধু এবং সাধুর বাণী identical কিনা? ধরে নেওয়া হচ্ছে সাধুর কথা identical। কেন? কর্ম্ম, কর্ম্ম-বন্ধন ভগবানের নাই, তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন না, এ জগতে কর্ম্মফল ভোগ করার জন্য তিনি আসেন না। সাধুও আসেন না কর্ম্মফল ভোগ করার জন্য। শাস্ত্রে একথা লেখা আছে,—"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥"

তাহলে কর্ম্মবন্ধন যেখানে নাই ভগবানের মত, সেখানে ভক্তের ক্ষেত্রেও ভক্ত এবং তাঁর মুখের বাণী দুটো এক হওয়া উচিত। অবশ্য সাধারণ মানুষের কথা এখানে নয়। অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ যাঁরা, নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা যাঁরা, তাঁদের কথা বলা হচ্ছে এখানে। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।" সেই মহাত্মাদের কথা বলা হচ্ছে। সাধু কেবল নামে সাধু নয়, কার্য্যতঃ যিনি সাধু, realised soul, তাঁর কথাই বলা হয়েছে। আমাদের মত বোকা হতভাগাদের কথা বলা হয় নাই। সমর্পিতাত্ম সাধুর কথা যেখানে, সেখানে তিনি এবং তাঁর কথা দুইই এক।

মহাত্মা গান্ধীজী একসময় কোন সভায় বলেছিলেন,—আমি এবং আমার বাণী দুইই এক। প্রাকৃত ভূমিকা থেকে তিনি একথা বলেছেন। যদিও সবটা মেনে নেওয়া যাবে না সর্ব্বতোভাবে। কিন্তু নিত্যমুক্ত মহাত্মা ও তাঁর বাণী নিশ্চয় দুটো এক। কেন? সাধুর ত' নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই, তাঁর নিজস্ব কোন বক্তব্য আছে, কোন সাধু এটা স্বীকার করেন না। সাধু-গুরু-বৈষ্ণব যা বলছেন সেটা সব শাস্ত্রের কথা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের, গোস্বামিবর্গের কথা। সেই অনুসারে বিচারটা করব আমরা। সাধুর যখন নিজস্ব কোন কথাই নাই, সব কথাই **Universal Truth, Axiomatic Truth**, শাস্ত্রের কথা, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের কথা, ভগবানের আজ্ঞা, ভগবানের নির্দ্দেশ, উপদেশ। বেদ—পরোক্ষবাদ; কিন্তু গীতা, ভাগবত ত' পরোক্ষবাদ নয়, **direct speach**, বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাতে। এখন কথা হল,—কোন সাধু-মহাপুরুষ কিছু হরিকথা বলছেন, সেকথাটা পরবর্ত্তিকালে আমরা কি করে সংরক্ষণ করব? বর্ত্তমানে সংরক্ষণ করার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্র যখন আবিষ্কৃত হয় নাই তার পূর্ব্বে **short hand** ছিল। বর্ত্তমানে এখন বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি সব ভাষাতেই **short hand** বেরিয়েছে। আমি যদি সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গ করার সুযোগ না পাই, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কাছে সাক্ষাৎ-হরিকথা শ্রবণ করার সুযোগ-সুবিধা না ঘটে, তখন আমি কি করব? শাস্ত্রে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে,—আমাকে পরোক্ষ সাধু-সঙ্গের ব্যবস্থা করতে হবে। পরোক্ষ সাধুসঙ্গ কিভাবে সম্ভব হয়?—শাস্ত্রগ্রন্থ—ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করব, ব্যাখ্যাগুলো অনুশীলন করব—এই ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সাধুর সাক্ষাৎ কথা তার ফল কিছু কম হবে, না তার ফল বেশী হবে? আর তাঁর কথা যদি কোন স্বরযন্ত্রে ধরে রাখা হয় বা সেটাকে যদি কোন লেখ-প্রণালীতে নিয়ে যাওয়া হয় লিখিতভাবে, তাহলে তার শক্তি কমে যাবে কিনা? এ প্রশ্নও হয়েছে। আমার এখানে সুধী সজ্জনবৃন্দ বসে আছেন, আমার উপরওয়ালা গুরুবর্গ বসে আছেন, তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে **clear** করেছেন ব্যাপারটা কি?

আমি যখন আমার গুরুবর্গের কথা সাক্ষাৎ-শ্রবণের সুযোগ পাচ্ছি না, অথচ সেই কথা আমাকে শ্রুতিপথে রাখতে হবে, তাহলে কিরকম ভাবে করতে হবে? অভ্যাস করতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'অনুশৃণুয়াৎ' কথাটীর প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বহু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুশ্রবণ গুরূপদিষ্ট বাক্য, তত্ত্বদর্শন, তাঁর পিছন পিছন শ্রবণ এবং সেটার অনুশীলন—একথা রয়েছে। অধিকারটা আসবে কি করে? অধিকারটা পাব কি করে? প্রত্যক্ষ-সাধুসঙ্গ একরকম, এতে ফল বেশী পাওয়া যাবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ-সাধুসঙ্গের অভাব হয়

আমাদের তখন নিশ্চয়ই পরোক্ষ-সাধুসঙ্গ—শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করা দরকার। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ শব্দ যখন ব্যবহৃত হয়েছে, তখন কিছুটা তারতম্য হবে। কিন্তু কোন কাজে লাগবে না, একথা কিভাবে মেনে নেওয়া যাবে? সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের ভাষণ, হরিকথা যদি কোন যন্ত্রের ভিতরে চালিয়ে দেওয়া হয়, তার শ্রবণে কি কোন ফলই হবে না? গুরু এবং গুরুর বাণী সত্য। এখানে বৈষ্ণব-তত্ত্বদর্শনের কথা এসেছে। তত্ত্বদর্শন নিয়ে বিচার করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরুত্বে বা বৈষ্ণবত্বে স্থাপন করে দেখাবার কোন ব্যাপার নাই। তত্ত্বদর্শন যদি সত্য হয়, সেটা যদি **Axiomatic Truth** হয়, তাহলে তার বিপর্য্যয় কেন আসে? সাক্ষাৎ-হরিকথায় যে ফল হবে, পরোক্ষ-হরিকথাতেও সেই ফল হবে। পরোক্ষবাণী মানেই ত' শাস্ত্র। কেবলমাত্র চার বেদকে পরোক্ষবাণী বললে ত' হবে না। শাস্ত্র কাকে বলে, তার তালিকা দেওয়া আছে শাস্ত্রেই।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঞ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এগুলোকে শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া কি আর কিছু শাস্ত্র নাই? হ্যাঁ, আরও আছে।

যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

এই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবতের অনুগত হয়ে যারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই সব প্রকরণ-গ্রন্থ হল শাস্ত্র। একথাও ত' শাস্ত্রের তালিকার মধ্যে বলা আছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের বিরোধী ভাব যারা প্রকাশ করেছেন, সেগুলোকে শাস্ত্র বলে মানা যাবে না। ভাগবতের ভিতরে সুন্দরভাবে বলেছেন, সেই শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলে মানব না, যে শাস্ত্রে ভগবানের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

যে বর্ণনার মধ্যে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বর্ণিত হয় নাই, তাকে শাস্ত্র বলে মানা যাবে না। ব্রহ্মা যদি স্বয়ং এসে বলেন তথাপিও মানব না। কেন?—**Axiomatic Truth, Universal Truth** এর বিরোধী ব্যাখ্যাকে শাস্ত্র বলে মানব না। যদি বিচারের পক্ষে হয় তাহলে মানব, কথাটী ত' এই। তাহলে ভগবান্ এবং ভগবানের মুখের বাণী যেমন **identical, equal in all respect,**

নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত মহাত্মাগণের বাণীও তদ্রূপ **identical, equal in all respect**। যদি বক্তা সাধারণ কোন বদ্ধজীব হন, তিনি যদি কিছু উপদেশ-নির্দ্দেশ দেন, সেটা ত' আর বাণী হবে না, **Universal Truth, Axiomatic Truth** হবে না। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত মহাত্মা যদি হন, সমদর্শী সাধু যদি হন, তাহলে সেখানে ত' বিচার করতে হবে। সেখানে ত' বিচার ছাড়া চলবে না। ধামে আসি, ধাম দর্শন করি। ধাম দর্শন করতে গেলে সেখানে কিছু অধিকার লাগে। আমি ত' ধাম দর্শন করতে পারি না। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে যাচ্ছি, সেখানে ইট, কাঠ, পাথরের কথা আসছে—এটা মক্‌রাণা পাথর কিনা, অষ্টধাতুর ঠাকুর কিনা—এসব প্রশ্ন আসছে। এগুলো বিগ্রহ দর্শন নয়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কাছেও ব্যাখ্যা শুনেছি, তিনি বলেছেন,—দেখ, বিগ্রহ দর্শন করা যায় না। বলি, তাহলে আমরা বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াচ্ছি কেন? শ্রীবিগ্রহ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন, শুভদৃষ্টিপাত করুন—এইজন্য বিগ্রহের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হই। আমার ক্ষমতা নাই আমি বিগ্রহ দর্শন করব। বিগ্রহ চিন্ময় মূর্ত্তি, তাঁকে আমি কি করে দর্শন করব? আমার চোখটা ত' সাধারণ চোখ, বিশেষ চোখ নয়। আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়াচ্ছি তিনি কৃপা করে আমার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করুন। কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে কথাটী এসেছে,—　প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্যকরণ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন তাঁকে। সাধারণ দর্শন কি সেটা? ইট, কাঠ, পাথর দর্শন কি? না সাধারণ পুতুল? পুতুল পূজা কি শ্রীবিগ্রহপূজা? পুতুলের আবাহন-বিসর্জ্জন আছে, কিন্তু নিত্য প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আবাহন-বিসর্জ্জন নাই। সেকথাও শাস্ত্রে বলা আছে। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ এক জায়গায় বক্তৃতা করেছেন আমরা মূর্ত্তির গঠনকারীও নই, বিসর্জ্জন-কারীও নই। **"We are neither econographer, nor econoclast. We are the permanent servitor of the Eternal Ever-Existing Absolute Supreme Lord."**

যদি এই কথাই হয় তাহলে আমরা কি করে বিগ্রহ দর্শন করব? বিগ্রহ যদি আমাকে দর্শন দেন, তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহলে কিছু হতে পারে। যে বিগ্রহ একজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, কই তিনি আমার সঙ্গে ত' কথা বলছেন না। "মৌনমুদ্রাঢ্য" চুপ করে আছেন। যে কৃষ্ণ একবার চেয়ে খেয়েছেন কারও কাছে, কই সে বিগ্রহ আমার কাছে খেতে চাইছেন না ত'! যে বিগ্রহ সাক্ষী দিয়ে গেছেন হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে, সে বিগ্রহ ত' কথা বলছেন না!

ব্যাপারটা কি? এখানে আমাদের যে প্রাকৃত চেষ্টা সেটা বিপর্য্যস্ত, সে চেষ্টা ফলবতী হচ্ছে না। কেন-না আমাদের মধ্যে বাহাদুরি আছে—আমি সব জেনে গেছি, বুঝে গেছি, শিখে গেছি—এমন সব অহঙ্কার। সেইজন্য তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ত' কথা বলেছেন। মাধবেন্দ্রপুরী বহু আয়োজন করেছেন—লুচির পাহাড়, রুটির পাহাড়, অন্নের পাহাড় সব হয়েছে। ভোগ দিয়েছেন তিনি। তিনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন গোপাল সব খেয়ে ফেলল। "বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।

একেলা মাধবপুরী করে নিরীক্ষণ॥"

বহু বহু লোক ত' সেখানে ছিলেন, একেলা মাধবেন্দ্রপুরী কেন নিরীক্ষণ করছেন? কোন বিশেষ অধিকারী ব্যক্তি দর্শন করলেন ওটা। শ্রীগোপাল সব খেয়ে ফেলেছেন। এর জন্য মাধবেন্দ্রপুরীর চিন্তা হচ্ছে—এত হাজার হাজার লোক এসেছে, এদের কি প্রসাদ দেওয়া হবে! সব ঠাকুর খেয়ে ফেলেছেন। আবার পুনঃ হস্তস্পর্শে সব পূর্ণ হয়ে গেল। এ ঘটনা ত' সত্য। তাহলে শ্রীবিগ্রহ কি সকলের কাছে প্রকাশ করবেন তাঁর মর্য্যাদা?—নিজের লোকের কাছে প্রকাশ করবেন তাঁর মহিমা-মাহাত্ম্য। আমার প্রশ্ন ওখানে যে, ভগবান্ যেমন এ জগতে কর্ম্মফল ভোগ করতে আসেন না, জীবের অশেষ কর্ম্মফল খণ্ডন করতে আসেন, প্রেমভক্তি দান করতে আসেন, নিত্যসিদ্ধ মহাত্মারাও ঠিক এইরকম এ জগতে আসেন। তাঁদেরও প্রাকৃত জন্মকর্ম্মবন্ধন নাই। তাঁদের যে উপদেশ-নির্দ্দেশ সেটা সাক্ষাদ্‌ভাবে শুনলে ফল অধিক হবে। কিন্তু যখন আমরা তাঁদের সাক্ষাৎ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ হারাব তখন কিছু ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক্ষ সাধুসঙ্গের যখন অভাব হবে, তখন গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের কথাই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এটা আমরা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কাছে শুনছি। সেখানে যদি কোনরকম হরিকথা স্বরযন্ত্রে ধরা হয় বা সেই হরিকথা যদি লেখপ্রণালীতে লেখা হয়, তাহলে তার শক্তিটা কম হবে কি না? প্রাকৃত চিন্তা নিয়ে আমরা অনেক সময় বহু কথা আলোচনা করি; কিন্তু মাথায় ঢোকে না সব। সবটাই জড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা সেই **Mould** এ ঢালাই করে থাকি। যেখানে অপ্রাকৃত বিষয় সেখানে অপ্রাকৃত বিষয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার হোক; আর যেখানে জড় সেখানে জড় নিয়েই বিচার হোক। জড় কখনও চেতন হয় না—বিচারটা সেইভাবে দেখা হোক। আর চেতন ত' চিরদিনই চেতন, সেটাকে জড় বলতে চাই কেন? সব জিনিষগুলো পাশাপাশি চিন্তা করার দরকার আছে আমাদের। সাধুসঙ্গ নিত্য। (ক্রমশঃ)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ১০ কেশব, গর্ভোদশায়ী, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৪০২, ইং ১৭/১১/৯৫ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তা-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহাম্।
সখী-প্রণয়-সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাম্॥ ১॥

মহাভাব-স্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তারত্নদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অতি পবিত্র হইয়াছে এবং সখীগণের প্রণয়-রূপ কুঙ্কুমাদিদ্বারা যিনি সুন্দর কান্তিবিশিষ্টা হইয়াছেন॥ ১॥

কারুণ্যামৃত-বীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতা-রূপ অমৃত-তরঙ্গ, মধ্যাহ্নে-তারুণ্য অর্থাৎ যৌবন-রূপ অমৃত-ধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তি-রূপ অমৃতের বন্যাদ্বারা যে রাধিকা স্নান করত ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত করিতেছেন ॥ ২ ॥

হ্রী-পট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥ ৩ ॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রদ্বারাই যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম-দ্বারা সুশোভিত এবং শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল শৃঙ্গার-রস-রূপ কস্তূরীদ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদগদ-রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যৈতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥
কৃত্বালঙ্কৃতি-সংশ্লিষ্টাং গুণালী-পুষ্প-মালিনীম্।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥ ৫ ॥

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদগদ-ভাব রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা—এই নয়টী উত্তম রত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কার রচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণসমূহই যাঁহার পুষ্পমালা-স্বরূপ এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ সদ্গন্ধকেই যিনি কর্পূরাদিরূপে ব্যবহার করিতেছেন ॥ ৪-৫ ॥

প্রচ্ছন্ন-মান-ধম্মিল্লাং সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণনাম-যশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকাম্ ॥ ৬ ॥

প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার সম্বদ্ধ কেশপাশ, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥

রাগ-তাম্বূল-রক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাম্।
নর্ম্ম-ভাষিত নিঃস্যন্দ-স্মিত-কর্পূর-বাসিতাম্ ॥ ৭ ॥

অনুরাগ-রূপ তাম্বূল-রক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল, উপহাস-বাক্য বলাই যাঁহার হেতু, তাদৃশ মধুর-হাস্য-রূপ কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥ ৮ ॥

সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তি-স্বরূপ অন্তঃপুর-মধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান

হইয়া বিপ্রলম্ভরূপ চঞ্চল তরল অর্থাৎ হার-মধ্যস্থিত মণিদ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলী-বন্ধ-গুপ্তকৃত-স্তনাম্।
সপত্নী-বক্ত্র-হৃচ্ছোষি-যশঃ-শ্রীকচ্ছপী-রবাম্ ॥ ৯ ॥

সপ্রণয় ক্রোধ-সম্ভূত রক্তিমা-রূপ কাঁচুলীদ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম বদন ও হৃদয়ের শোষণকারিণী যশঃশ্রী যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী অর্থাৎ বীণা-রব হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মধ্যতাত্ম-সখী-স্কন্ধ-লীলা-ন্যস্ত-করাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যাম-স্মরামোদ-মধুলী পরিবেশিকাম্ ॥ ১০ ॥

মধ্যতা অর্থাৎ যৌবন-রূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলারূপ কর-পদ্ম অর্পণ করিয়াছেন ও যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্তা এবং যিনি শৃঙ্গাররসদ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্ব-দাস্যামৃত-সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১ ॥

আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতি-পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক এই সুদুঃখিত ব্যক্তিকে স্বকীয়-দাস্য-রূপ অমৃত দান করিয়া জীবিত করুন ॥ ১১ ॥

ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে! হা হা মুঞ্চেনং নৈব তাদৃশম্ ॥ ১২ ॥

হে গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন আপনি এই আশ্রিত দুষ্টজনকে ত্যাগ করিবেন না ॥ ১২ ॥

প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকা-কৃপা-হেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

যিনি শ্রীরাধার কৃপার হেতুস্বরূপ এই "প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ" নামক স্তবরাজ পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধিকার দাস্য লাভে সমর্থ হন ॥ ১৩ ॥

———

প্রশ্নোত্তর

অভিধেয়-তত্ত্ব

১। সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় কি ?

"আমি কে ? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্ব-শাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।" —অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৭।১৪৬

২। 'অভিধেয়-তত্ত্ব' কাহাকে বলে ?

"সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয়-তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেন।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। বদ্ধজীবের সাধন ব্যতীত কি সিদ্ধি-লাভ সম্ভব ?

"সাধন-কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্ন-সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদরপূর্ব্বক যে-পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।" —'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৪। কিরূপভাবে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য-সম্বন্ধটী প্রকাশিত হয় ?

"জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলে সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ-জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। *** দেশলাই ঘসিলে অথবা চক্‌মকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৫। 'সেবা' কাহাকে বলে ?

"কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় 'সেবা' বলা যায়।"

—তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

৬। ভক্তিযোগ কয় প্রকার ?

"ভক্তিযোগ দুই প্রকার—(১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ।" —রঃ রঃ ভাঃ ২।৪১

৭। কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ কি ?

"বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৮। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি ?

"কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলন-রূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে-সমুদায় বাহ্য ; কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধ-ভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। ইহাই সাধ্যবস্তু ; কেন না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়।"　　—অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৮।৬৮

৯। মহাজনের পথ কি ?

"ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতি-ভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই।"　　—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

১০। পরমার্থের পথ কি নিত্য-নূতন সৃষ্ট হইতে পারে ?

"পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা সনাতন আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক ও যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বপন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

১১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা কি ?

"সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা।"　　—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

১২। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ভজন-পদ্ধতির স্বরূপ কি ?

"সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার ; কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও

স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি ?

"অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নামসঙ্কীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।" —'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৪। 'জ্ঞান' কোন্ সময় 'সাধনভক্তি' হইতে পারে ?

"কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি', জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরমফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধনভক্তি' বলা যায়।"

—'অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

১৫। কোন্ ভক্তি জীবের নিত্যধর্ম্ম ?

"যে-ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে-ভক্তি একটী পৃথক্, নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

১৬। কোন্ জ্ঞান আরাধ্য, আর কোন্ জ্ঞান হেয় ?

"যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তি-লাভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য ; কিন্তু যে জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল-জগতের বোধ-মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৭। শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাকাবস্থাটী কি ?

"বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাক-অবস্থা।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৮। কোন্ সময় উত্তমা ভক্তি লাভ হইতে পারে ?

"আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা ; কষায় দূর হইলে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে।"

—রঃ ভাঃ ৭।১৬

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানিতে দিই না—গোপনে যে-সকল কথা রাখিয়া দিই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া তাহার উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হইতেছে—তিনি একটী খড়্গ হাতে লইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—মানুষের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তাহা হইলে তিনি মন্দকারী, আমার শত্রু।

ভাগবত-জীবন যাঁহার নয়, তাঁহার কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। "কৃষ্ণে মতি হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

জাগতিক দ্রব্যগুলির অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়, ইহা না বুঝিলে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখসমৃদ্ধির জন্য—জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে জীব জাগতিক ভোগে ব্যস্ত থাকিয়া সেবাবিমুখ হইয়া যায়। ভগবৎসেবা-বিচার উপস্থিত হইলে কেবলমাত্র স্বর্গ-সুখভোগ বা পার্থিব সুখাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না, যাহাতে ভগবানের সুখ-বিধান হয়, সেই কার্য্য করিবার চেষ্টা হয়। বিষ্ণু কামদেব, তাঁহারই সব। তাঁহার কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাহাতেই প্রয়াস। শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হইতে লক্ষ্মীহরণ পিপাসা আসে। 'শ্রীকূর্ম্মের' শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না করিলে, জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেবাবিমুখ হইয়া যাই। সেটী অমঙ্গলের কথা।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মায়ামৃগ হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া সঙ্ঘর্ষই এই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য এখানে সংঘর্ষের মধ্যে একটী মিলন বা ঐক্যতানের জন্য মানবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অনেকে তাহাকে মিলনের বা ঐক্যতানের সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে সংঘর্ষের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া

পড়ে। আমরা কেবল বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিয়াছি, এই অভিজ্ঞতা লইয়াই অন্তিমকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

প্রত্যক্ষের পথ এই প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃই যে সকলের একমাত্র মঙ্গলোৎপাদক, তাহা শ্রবণের পথে অর্থাৎ শ্রুতির মধ্য হইতে জানিতে পাওয়া যায়। যে পর্য্যন্ত না আমর শ্রুতির পথ বরণ করি, সে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞান প্রেয়ঃকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ্য মিত্র বলিয়া বরণ করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষের পথ হইতে বহুধর্ম্মের দোকান জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকলকে মনোধর্ম্মের পণ্যবীথিকা বলা যায়। তাহাতে অনেক আপাত চাকচিক্যযুক্ত মনোহারী জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা অতি সহজেই বিশ্বমানবের স্বাভাবিকী বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জগতে এইরূপ মনোধর্ম্মের শত-শত প্রকার দোকান এবং উহাদের বিভিন্ন প্রলোভনের বাগ্-বৈখরী, উহাদের মানবজগতের প্রতি প্রস্তাবিত শান্তি-প্রদানের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না—স্থির করিতে পারি না, কোন্ দোকানের কোন্ জিনিষটী গ্রহণ করিব?

যে কথাটী স্বয়ং হরি, তাহাই হরিকথা; যাঁহার কথাই হরি, তিনিই হরিকথা-কীর্ত্তনকারী। হরিকীর্ত্তন ও হরিবিতরণ একই জিনিষ। হরিজন উপদেশাকারেই কথারূপী হরিকে দান করেন এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রণত সজ্জনগণ শুশ্রূষু হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কৃষ্ণ-বিতরণই ভক্তের দান এবং সেবার জন্য সেই শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে গ্রহণই শিষ্যের কৃত্য। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী অধোক্ষজবস্তু, আমাদের জানার অতীত তত্ত্ব। তাঁহাদিগকে কেহ জানিয়া বা মাপিয়া লইতে পারে না। তাঁহারা অন্তর্দেবতা। অন্তর্দ্দর্শন না হইলে অন্তর্দেবতার সাক্ষাৎ মিলে না। বহির্দ্দর্শনই কুদর্শন বা মায়া। তাহার অপর নাম ভোগ্যদর্শন, আর অন্তর্দ্দর্শন—সেব্যদর্শন, তাহাই সুদর্শন বা ভক্তি।

হরিকথা শুনিতে হয় হরিজন গুরুদেব ও গুরুর সহিত এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবের নিকট। গুরু-বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অনুগত জনগণও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবের কথাই বলেন, নিজেদের কোন কথাই বলেন না, সেইজন্যই তাঁহাদের কথাও হরিকথা। মণিঅর্ডার, পত্রাদি পোষ্টমাষ্টারের নিকটই আসে এবং পোষ্টমাষ্টারের আদেশে পিয়ন তাহা অবিকল বিলি করে।

আস্তিকতা ও নাস্তিকতা

—এই পদ দুইটী যদিও পৃথক্ তথাপি মূলতঃ ইহারা একেরই অভিব্যক্তি। যেরূপ, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-বাক্যে 'সর্ব্ব' এবং 'ব্রহ্ম'—এই দুই পদের মূলতঃ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যেরই প্রকাশ মাত্র। বস্তুর সম্যক্-জ্ঞানের অভাবে আপাতঃ বা কোণজ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বদ্ধদশায় জীবের নানারূপ বিতর্ক। মহাজনগণের অনুগ্রহ লাভ করিলেই এই দ্বন্দ্ব হইতে অব্যাহতি বা নিষ্কৃতি সম্ভবপর।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

"স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে"—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য ইহাই জ্ঞাপন করে।

কয়েকদিন যাবৎ দৈনিক সংবাদপত্রগুলি এইরূপ একটী বিষয় লইয়া মুখর। **গণেশ, শিব প্রভৃতি দেবগণ কাঁচা দুগ্ধ পান করিতেছেন**—ইহাই বিতর্ক। ক্রমশঃ এই বিতর্ক বিশ্বব্যাপী-রূপ ধারণ করিয়াছে। ভাবুকতা ও আধ্যক্ষিকতায় উন্মত্ত মনুষ্যগণ নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণাদি স্বপক্ষে প্রকাশ করিয়াও সত্যে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করিতে অক্ষম বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিচার্য্য-বিষয়ে মাদৃশ অধমও বিজড়িত হইলেও শাস্ত্রীয় ও মহাজানিক বিচার প্রকাশ করাই ইহার কারণ, নিজস্ব কোন মহত্ত্ব-প্রকাশ উদ্দেশ্য নহে।

বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও সত্যতা বিচার করিলে আমরা অতীব গৌরবান্বিত হইলেও আস্তিক বলিয়া কেন পরিগণিত হই না? তদ্রূপ আস্তিকাভিমানী ব্যক্তিগণও ভাবুক বলিয়া কেন আখ্যাত হইয়া থাকেন?—ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

বৈজ্ঞানিকগণের কৃতিত্ব-স্বরূপে আজ পুরুষদেহ স্ত্রীদেহে রূপান্তরিত, নলজাত-সন্তানের সৃষ্টি, Heart, Kidney, Brain প্রভৃতির পরিবর্ত্তন, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, Computer, বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি কখনই উপেক্ষণীয় নহে। এতাদৃশ অত্যাশ্চর্য্যজনক উন্নতিও শান্তিবহ নহে কেন? এতাদৃশ বহুপ্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতা মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণাদি লাভ করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের এবম্বিধ যোগ্যতা সত্যের নিকট অতি তুচ্ছ ও পরাভূত হইয়াছে। বিজ্ঞান-বলে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিলেও প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে সক্ষম নহি—ইহা মিথ্যা নহে। আমরা প্রকৃতির অবদান না লইয়া কোনরূপ

বাহাদুরি করিতে পারি কি? গবেষণাগারে আমরা H^2O পদ্ধতিতে জল-সৃষ্টি করিলেও Hydrogen এবং Oxygen—এই দুই মৌলিক বস্তু প্রকৃতির অবদান। এই প্রকৃতি বা Natureকে স্বীকার করিলেও আমরা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারি না। তাহার কারণ, এই প্রকৃতির উৎস উপেক্ষিত থাকেন। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—এই সত্যবাণীকে অস্বীকার-হেতু আমাদের এতাদৃশ বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং প্রকৃতিবাদও মিথ্যা এবং অমঙ্গলপ্রসূ। রাবণাদি প্রকৃতি-বিশ্বাসী বা প্রকৃতি-পূজক হইয়াও অসুর বলিয়া পরিগণিত। তাহারা পুরুষ-বিরোধী।

প্রতিপক্ষে ভাবোচ্ছ্বাসও সত্যতা নহে। যদিও সত্যের প্রতি সত্যবুদ্ধি ও বিশ্বাস মঙ্গলজনক ও আদরণীয়, তথাপি তাহাও প্রকৃত সত্যের পরিচায়ক নহে।

ভগবান্ এবং দেবগণ মনুষ্যের শক্তি হইতে অসীম ও প্রভূত শক্তির অধিকারী—ইহা মিথ্যা নহে। তাঁহারা দুগ্ধপান করিতে পারেন না—তাহা নহে। মনুষ্য বা মনুষ্যেতর প্রাণীর যাহা সম্ভব, তাহা তাঁহাদের কখনই অসম্ভব নহে।

অতএব বিরোধ কোথায়? ইহা বিচার করিলে দেখা যায়—জড়কে চেতন এবং চেতনকে জড় বলিয়া বিচারই ইহার মূল। প্রস্তর—অচেতন বা জড়, তাহার দুগ্ধপান-শক্তি অসম্ভব। পরন্তু বিগ্রহ অচেতন বা জড় নহে, তাহা চেতন বস্তু বলিয়াই দুগ্ধাদি পানীয় গ্রহণ করিতে সক্ষম। এমন কি, তিনি ভক্তের জন্য পদব্রজে সুদূরপথ অতিক্রম, চৌরকার্য্য, অস্ত্রাদিধারণপূর্ব্বক যুদ্ধাদি করিয়া থাকেন। তিনি কথা বলিতে পারেন, তিনি চলিতেও সক্ষম। ইহার প্রকৃষ্ট ঐতিহ্য ভারতে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান। পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ, তন্নিকটবর্ত্তী সাক্ষিগোপাল, রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, বিষ্ণুপুরে মদনমোহন, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী প্রভৃতি। এই-সমস্ত ঐতিহ্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে সত্যের অপলাপ ও আসুরিকতা প্রকাশ পায়।

পরন্তু এই অলৌকিক কার্য্য সর্ব্বক্ষেত্রেই সম্ভব বা সত্য নহে। ভগবান্ এবং দেবগণ তাঁহাদের এই অলৌকিকতা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করেন না। তাঁহাদের এই ক্ষমতা বা লীলা কেবলমাত্র তাঁহাদের ভক্তের সঙ্গে বিহিত হয়। তাঁহারা ভক্তের সহিতই কথা বলিয়াছেন, ভক্তের জন্যই চুরি করিয়াছেন, ভক্তের জন্যই বৃন্দাবন হইতে দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগর হাঁটিয়াছেন এবং ভক্তের জন্যই দল-মাদল-কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহা কখনই অবিশ্বাস্য হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। ভক্তের জন্য তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব। উপনিষদ্ বাণী—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী ॥"

উপসংহারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গীতাবাক্য উদ্ধার করত আলোচনা হইতে বিরত হইতেছি।—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে **ভক্ত্যা** প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম**শ্নামি প্রযতাত্মনঃ** ॥

সুতরাং ভগবান্ ও দেবগণের দুগ্ধপান—সংযত ভক্তপ্রদত্ত হইলেই সম্ভব, তাহা অজিতেন্দ্রিয় অভক্তের কৌতূহলজনক ব্যাপার নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেবের অপ্রকট-তিথিতে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীকেশবচরণ।
সতত বন্দনা করি মঙ্গল-কারণ ॥
যাঁহার বন্দনা হ'তে অবিদ্যা-হরণ।
সাধুগণে সর্ব্বশাস্ত্রে করে নিরূপণ ॥
একমাত্র সাধু-গুরু পতিতপাবন।
তাঁহার মহিমা-গুণ করেন কীর্ত্তন ॥
সর্ব্বগুণে গুণী নিত্য হরিপ্রিয়জন।
নিত্যানন্দ-রূপ হন ভক্তিতে ভূষণ ॥
জগতে প্রকট যিনি জীবের কারণ।
এমন দয়াল প্রভু কে আছে এমন ॥
জীব উদ্ধারিয়া করে ভক্তি-পরায়ণ।
নাম-মন্ত্র দিয়া সবে পিশাচী-তাড়ন ॥
সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরি' গোবিন্দ-চরণ।
দর্শনে করেন সদা পাপ-বিমোচন ॥

সাধু-গুরু ছাড়া বিশ্বে আর কেহ নন।
দয়াল করুণানিধি পরশ-রতন॥
হৃদয়ে ধরিয়া নিত্য করহ পূজন।
সকল অনর্থ যাবে পাবে ভক্তিধন॥
জনম সার্থক তবে মানব-জীবন।
আশ্রয় ছাড়িলে মরে সব অকারণ॥
আশ্রয় ল'য়েছেন যিনি হেন মহাজন।
উদ্ধার হইয়া যাবেন গোলোক-ভুবন॥
তাঁ'র শিক্ষা উপদেশ করেন পালন।
সাধনভক্তি বিঘ্নশূন্য সেবা-পরায়ণ॥
ভক্তি-সুসিদ্ধান্ত-শিক্ষা শাস্ত্র-নির্দ্ধারণ।
সর্ব্বতত্ত্ববিৎ হন বেদান্ত-দর্শন॥
অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' ছাড়ি' কর্ম্মজ্ঞান।
আনুকূল্যে ভক্তিযোগ করেন সাধন॥
'আরোহ' নিজচেষ্টা করেন বর্জ্জন।
'অবরোহ' শ্রৌতপন্থা করেন গ্রহণ॥
গুরুদেবের অভয়পদ করিলে বরণ।
অশোক-অভয়পদ লভে জ্ঞানাঞ্জন॥
দেহে আত্মবোধ হয় বিবর্ত্ত-বিভ্রম।
স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-নেত্র খুলেন তখন॥
কৃপা-বারিদ মেঘ হৃদয়ে বর্ষণে।
শীতল করেন যিনি দগ্ধ জীবগণে॥
সকল উপাধি যায়, কর্ম্মের বন্ধন।
সর্ব্বময় হরি-গুরু করেন দর্শন॥
পরমহংস-পদে তবে করে আরোহণ।
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে ভাসেন তখন॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন অভিন্ন দর্শন।
ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-ধারায় মগ্ন ভক্তগণ॥

পঞ্চরস সেবাশ্রয়ে সিদ্ধ দেহ পা'ন।
লীলা-পরিকর সঙ্গে সিদ্ধ-পীঠস্থান॥
নিত্যকাল সিদ্ধসেবা তোমার চরণ।
ভক্তির সাধন করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
তোমার আশ্রয় বিনা না করে কখন।
প্রাপ্তকুঞ্জে রাধা-বিনোদ করেন সেবন॥
প্রেষ্ঠজন শিষ্যগণ-আজ্ঞার পালন।
করেন সতত চেষ্টা নাম-প্রচারণ॥
তোমার স্থাপিত মঠ-মন্দিরাদি স্থান।
রক্ষা করেন সদা অভীষ্ট-পূরণ॥
ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থাদি করিয়া মুদ্রণ।
তব ইচ্ছা পূরণ সে করিছে তখন॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামাত্রে তিথি করে আকর্ষণ।
মর্ত্ত্যলীলা হ'তে তোমা লইল তখন॥
নয়ন-মঞ্জরী-পাশে তোমার গমন।
বিরহ-সাগরে ভাসে তব দাসগণ॥
কৃপাভিক্ষা মাগে সদা তব দাসগণে।
প্রণত হইয়া নিত্য তব শ্রীচরণে॥
শ্রদ্ধার্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়া করিছে পূজন।
সিদ্ধসেবা, নামে প্রেম জাগে অনুক্ষণ॥
তুয়া পদে করে সবে আত্মনিবেদন।
তব অভয়পদ রক্ষা করুন সর্ব্বক্ষণ॥
সকলের পিতা তুমি, মাতা সর্ব্বক্ষণ।
নিত্যলীলা হ'তে কৃপা কর বরিষণ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন

"হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার"

কথায় বলে,—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" "অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাকে যতই ধৌত করা হউক না কেন, তাহার কৃষ্ণবর্ণত্ব ঘুচিবে না।" "কয়লা ধুলেও যায় না ময়লার" ন্যায় অসাধু ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকসকল সাধুগণের শত শত উপদেশেও সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। সত্ত্বগুণ বিবর্জ্জিত সেই খলস্বভাব জনগণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যা-বৈরাগ্য-বিভূতি-বল ও কর্ম্মপ্রারম্ভমদে মত্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট-পূর্ব্বক সাধুগণ ও তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দা করিয়া থাকে। এইরূপ খলস্বভাব জনগণের পতন অবশ্যম্ভাবী, কেননা তাহারা নির্ব্বোধ। নির্বুদ্ধিতার জন্যই তাহারা পার্থিব সৌন্দর্য্যাদি নশ্বর গুণের বহুমানন করিতে করিতে যে ঘৃণিত স্বভাব লাভ করে, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কুকুরের লেজে পুনঃ পুনঃ ঘি মালিশ করিলেও যেরূপ সোজা না হইয়া বাঁকাই থাকে, তদ্রূপ যাহার যে স্বভাব তাহা শত সদুপদেশেও কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। "স্বভাব যায় না মলে, আর ইজ্জৎ যায় না ধুলে" অর্থাৎ "The leopard cannot change its spots." চোরা অর্থাৎ অসৎব্যক্তি কখনও ভাল অর্থাৎ মঙ্গলের কথা শুনিতে চায় না। তাই প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" অর্থাৎ "The scapegrace will never listen to a moral lecture." সাধুগণের নিন্দা, তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব-পোষণ ও তাঁহাদিগের ছিদ্র অনুসন্ধান, তাঁহাদের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ মরণশীল জীববুদ্ধি—এই সকল খল ও অসৎপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম। এই অসৎ স্বভাবের জন্যই তাঁহারা অন্তিমে অসহ্য যাতনাময়-স্থানে গমন করিতে বাধ্য হয়।

যাহারা আকাশের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করিয়া আকাশকে থুথু-সিক্ত করিতে চাহে, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ। "লাফিয়ে চাঁদ ধরিতে" গেলে যেমনই চাঁদ ধরিবার পরিবর্ত্তে আছাড় খাইয়া নিজের হাড়গোড় চূর্ণ হইবার পূর্ণমাত্রায় সম্ভাবনা; তেমনই আকাশে থুথু নিক্ষেপ করিলে তাহা নিক্ষেপকারীর গাত্রেই পতিত হয়, আকাশের কিছু হয় না। সর্ব্বোত্তম সাধু-গুরুগণের প্রতি কুবাক্য-বাণ বর্ষণ বা তাঁহাদের নিন্দাদি করিয়া থাকিলে নিন্দাকারীর উপরই সেইসকল কুবাক্য ও নিন্দাদি পতিত হইয়া তাহার চরম সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, উহাতে সাধু-গুরুগণের কিছুই হয় না। কথায় বলে,—"গুটি পোকা গুটি করে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে" অর্থাৎ "The engineer hoisted with his own petard." গুটিপোকা গুটি পাকাইতে

পাকাইতে যেরূপ নিজের ফাঁদে নিজে বদ্ধ হয়, তদ্রূপ সাধু-গুরুগণের নিন্দা করা যাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় তাহাদের মায়ার সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কেহ যদি ঈর্ষায় ক্রোধাভাবাপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের একটী মানচিত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিন্তা করে যে, সে সমস্ত ভারতবর্ষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে উহা যেমন তাহার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ যাহারা নিজেদের নিন্দিত স্বভাবের দ্বারা অপ্রাকৃত সাধুগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টাও মূর্খতার চরমসীমা। রাজার হস্তী যখন বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন কুকুরের দল তাহাদের জায়গায় একজন ভাগীদার আসিয়া উপস্থিত হইল মনে করিয়া হিংসাপূর্ব্বক হস্তীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ঘেউ' 'ঘেউ' করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু রাজার হস্তী কুকুরের চীৎকারে একটুকুও বিচলিত না হইয়া আপন কাজে চলিয়া যায়। হস্তী কুকুরের সহিত বাক্যালাপ বা উহাদের কোন অনিষ্ট না করিলেও হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চীৎকার করাই কুকুরের স্বভাব। "অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার" অর্থাৎ "A barking dog seldom on bits" এর ন্যায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ করাই সার। যাহারা নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল চাহে না, তাহারা সাধুগণের সম্মান ও বিশেষত্ব দর্শন করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া দলবদ্ধভাবে সাধুদিগকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সাধুদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কুৎসা ও নিন্দা রটনা করিতে গিয়া বলিয়া থাকে, "সাধুগণ ত' হিমালয়ের গুহায় বা নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের ধ্যান-ধারণা করিবেন, তাঁহারা কেন সমাজে আসিয়া ভগবানের কথা প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবেন?" বস্তুতঃপক্ষে সাধুগণ জীবের মঙ্গলের জন্য জগতে সত্যকথা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুষ্টলোকের কুৎসা ও নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভগবানের কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন। কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া রাজার হস্তীর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করিলে যেরূপ রাজ-কর্ম্মচারী "যেমনই কুকুর তেমনই মুগুরের" ন্যায় লাঠির আঘাতে কুকুরের 'ঘেউ' 'ঘেউ' করা বন্ধ করে, তদ্রূপ যাহারা সাধুগণের অহর্নিশ নিন্দা করিয়া থাকে যমদূতগণ তাহাদিগকে নিরয়ে নিক্ষেপপূর্ব্বক অশেষ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে।

জীবকল্যাণের জন্যই সাধুগণের জগতে বিচরণ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার পার্ষদগণ তথা সাধুগণও নিত্য চিদানন্দ-বিশিষ্ট ও দয়ালু। তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য মানবমাত্র নহেন। লোকহিতের জন্য তাঁহারা সকল জীবকে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইতে নানা স্থানে বিচরণ করেন। অনভিজ্ঞসমাজ বিষ্ণুজনের আহ্বান না করিলেও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য-অভাব

মোচন করেন। মহৎ ব্যক্তিগণ "অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্ত্রীব্রমুষ্ণং, শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্" অর্থাৎ "বৃক্ষ স্বীয় মস্তকে তীব্র উত্তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিত পথিকের আতপক্লেশ নিবারণ করিবার" ন্যায় নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও জীবের ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন। সাধুগণের জীবের নিত্য-মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪)

"দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্য-মঙ্গলের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণের গমনাগমন হয়, অন্য কোন কারণে নয়।" শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তাঁ'র ঘর॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩৯)

শ্রীভাগবতে বিদুরও মৈত্রেয় ঋষিকে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
(ভাঃ ৩।৫।৩)

"দৈবাৎ কৃষ্ণবিমুখ অধর্ম্মশীল ও সুদুঃখিত ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃষ্ণভক্তগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।"

ধর্ম্ম, মন্ত্র, ভাগবত ও বিগ্রহ ব্যবসায়িগণ অপস্বার্থহীন হরিনাম প্রচারকারী প্রকৃত সাধুগণের হরিনাম প্রচারের আনুকূল্য-স্বরূপ মাধুকরী ভিক্ষাকেও ভোগীকুলের অবৈধ অর্থ-পিপাসার সহিত সমান বলিয়া লোকের নিকট প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নিজেদের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সাধু-সন্ন্যাসিগণের যদি হরিনাম প্রচারই মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাদের অর্থ সংগ্রহের কি আবশ্যকতা আছে? যেখানে সাধু-সন্ন্যাসিগণের অর্থের প্রয়োজন হয়, সেখানে সংসারী লোকের অর্থ সংগ্রহে দোষ কোথায়?" বস্তুতঃ অসৎ চিত্তবৃত্তি-বিশেষ ব্যক্তিগণেরই এইরূপ চিন্তা হইয়া থাকে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ হরিনাম প্রচারের আনুকূল্যের নিমিত্ত সাধুগণকর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থাদি ভোগীর স্ত্রী-পুত্র-ভরণ-পোষণের অথবা অবৈধ লাম্পট্যের প্রশ্রয়দানের অথবা নিজের কোন সুখ-সুবিধার বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় না। প্রকৃত সাধুগণ সংগৃহীত অর্থাদির যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য কল্যাণ করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা অর্থের মূল মালিক লক্ষ্মীপতির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন করিবার

উদ্দেশ্যেই অর্থাদি ব্যয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনের মাধ্যমেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, বদ্ধ, তপ্ত জীবজগতের বা জীবসমাজের নিত্য মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

কপটতাপূর্ণ জগতে কপটেরই আদর, প্রকৃত সাধুর নহে

কপটতাপূর্ণ জগতে এক কপট-কর্ত্তৃক অন্য কপট আদৃত হইবে—এ বিষয়ে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। শূকর যেমন কচু ছাড়া অন্য কোন উপাদেয় বস্তুকে চেনে না, তেমনিই এক কপট ব্যক্তি অন্য কপট ব্যক্তি ব্যতীত সরলহৃদয় সাধুগণকে কি করিয়া চিনিবে বা আদর করিবে? এই প্রসঙ্গে এক ভক্তের "এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের উত্তর, —"কপটতা-পূর্ণ জগতে কপটেরই আদর। যে-সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী করেন না, সেই সকল খাঁটী সাধুর আদর এ জগতে নাই। হরিকথার নামে যাঁরা লোককে বিপথগামী করছেন, তাঁদের দ্বারা বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালে একটা যুগধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ-কপটগণ-চোরগণ তাঁদিগকে উল্টে 'ঐ চোর', 'ঐ অসাধু', 'ঐ ভণ্ড' বলে লোককে ধোকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই জীবকে নিষ্কপট হতে দেবে না, তাই কতরকম করে খাঁটী সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল করছে।" বর্ত্তমান কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগ। বিবর্ত্তের কবলে পতিত হইয়া দুষ্ট ও অসৎ প্রকৃতির লোকসকল সমাজের মাঝে যথার্থ সাধুকে চোর এবং চোরকে প্রকৃত সাধু প্রতিপন্ন করিতে গিয়া কম সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের গোলোকধাঁধার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কলি কত তামাসাই না দেখাইতে পারেন। তাই কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

চোরকো ছোড়ে,　　সাধ্‌কো বাঁধে,
পথিক্‌কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ,　　তেরি তামাসা,
দুঃখ্‌ লাগে আওর হাসি॥

দুষ্ট ও অসৎপ্রবৃত্তির লোকসকল শুধুমাত্র নিজেদের অমঙ্গল করিয়া থাকে না, অধিকন্তু অপরের মঙ্গলের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া নিজেদের মন্দ স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে। যাঁহারা নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা দুষ্টলোকের নিন্দায় বা প্রশংসায় বিচলিত না হইয়া ভগবানের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলে সর্ব্বপ্রকার বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

দেহী জীব—আত্মা চিদ্বস্তু ;- জীবের জড়দেহ হ'তে সৃষ্ট নহে। আমরা এ জগতে বহু প্রকারের জীব দেখতে পাই, যেমন –মানুষ, পশু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি। অণুবীক্ষণ (Microscope) যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে আরও বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব দেখা যায়। শাস্ত্র হ'তে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ৮৪ লক্ষ প্রকারের জীব আছে। বিভিন্ন প্রকারের জীবের মোট সংখ্যা গণনা করা দুরূহ ও অসম্ভব। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীব অসংখ্য বা অনন্ত। যে জীবগুলি আমরা জড়চক্ষে দেখতে পাই, সেগুলি প্রত্যেকেই জড়দেহ-বিশিষ্ট জড়চক্ষে জড়বস্তুই দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু জীব কি জড়বস্তু ? মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির দেহগুলিতে জীবনের লক্ষণ বা চেতনাশক্তি প্রকাশিত দেখে সেগুলিকে আমরা জীব বলি। জীবের দেহ জড় বা অচেতন পদার্থ ; তার মধ্যে যতক্ষণ চেতন বস্তুর সংযোগ থাকে, ততক্ষণই চেতনের ন্যায় কার্য্য করে, ঐ চেতন বস্তুটি দেহ হ'তে অন্তর্হিত হলে বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দেহটা অচেতনবৎ পড়ে থাকে। সুতরাং আমরা যা'কে জীব বল্‌ছি, তাহা চেতন ও জড়বস্তুর সংমিশ্রণে গঠিত। 'জীব'-শব্দের সাধারণ অর্থ—'জীবতি ইতি জীবঃ' অর্থাৎ জীব জীবন্ত থাকে। 'জীবতি'-পদটি বর্ত্তমান কাল। তাই জীবকে সর্ব্বদাই জীবিত বলা যায়। জীব যেহেতু জীবন্তই থাকে, তাই তার মৃত্যু হয় না বা হ'তে পারে না। কিন্তু মানুষ, পশু প্রভৃতিকে আমরা যে জীব বলি—এগুলি ত' চিরকাল জীবন্ত থাকে না ;—এদের যেমন জন্ম আছে, তেমন মৃত্যুও আছে।

তাই আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে-গুলিকে জীব বলে জানি, সেগুলি জীবের স্পষ্ট পরিচয় নয়,—সেগুলি জাতি,—যেমন মনুষ্য-জাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি, বৃক্ষজাতি প্রভৃতি। জীব-দেহের অভ্যন্তরস্থিত চেতনাশক্তি বা আত্মাকেই জীব বলা সঙ্গত। আত্ম-অর্থে নিজ বা স্বকীয়। নিজের বোধ সত্তাকেই আত্মা বলা হয়। আত্মা নিত্য-চেতন, আদৌ জড় নহে। আত্মাকেই আবার জীবন বলা হয়। জীব-দেহে যতক্ষণ জীবন বা আত্মা থাকে, ততক্ষণই জীবের জীবতা বা জীবত্ব। রাজার যতদিন রাজ্য বা রাজত্ব থাকে, ততদিনই তাঁকে রাজা বলা যায়। রাজত্বটা রাজা নয়, রাজত্বটা রাজার সম্পত্তি। তদ্রূপ জীবের দেহটা জীব নয়, জীবের দেহটা জীবের সম্পত্তি। জীবের দেহটা আত্মার আবরণী পোষাক মাত্র। আত্মা স্থূল-জড় নহে এবং সূক্ষ্ম-জড়ও নহে। আত্মা যদি স্থূল-জড় হ'ত, তা'হলে আত্মাকে আমরা স্থূলচক্ষে দেখতে পেতাম। কিন্তু আত্মাকে

দেখা যায় না। মন, বুদ্ধি—এগুলি সূক্ষ্ম-জড়। এই সূক্ষ্ম-জড় বস্তুগুলিকে দেখা যায় না ও ঠিক ধরাও যায় না, তবে নির্দ্ধারণ করা যায়। মন সঙ্কল্প-বিকল্প করে, বুদ্ধি সৎ-অসৎ বিচার করে। আত্মা ঐ সূক্ষ্ম-জড় বস্তুগুলিও নয়। আত্মা এমন একটা বস্তু, যার বিদ্যমানতায় হাত-পা নড়ে, নাসিকায় শ্বাসকার্য্য হয়, জিহ্বায় শব্দ উচ্চারিত হয়, মুখ কথা বলে, চোখ দেখতে পায়, কান শুনতে পায়, মন মনন-কার্য্য করে, বুদ্ধি বিচারশক্তি পায়; কিন্তু এই আত্মাকে প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না বা জানা যায় না। জীবের দেহটা জড় পদার্থ, দেহের মধ্যে আত্মা বা চেতন শক্তি থাকলে জড় দেহটাই যে চেতনতা প্রাপ্ত হয়,—এটা আমরা সকলেই বুঝতে পারি। ধরা যাউক, যদু নামে কোন ব্যক্তি মারা গেছে। সেই মৃতদেহটা ঘিরে তার আত্মীয়-স্বজনগণ কাঁদছে ও হা-হুতাশ করছে। এমন সময় কেউ যদি সেই শায়িত যদুর মৃত-দেহটাকে লক্ষ্য করে বলে—ঐ ত' যদু শয্যাশায়ী অবস্থায় রয়েছে ও তাকে দেখা যাচ্ছে, সুতরাং আপনারা কাঁদছেন কেন? তখন তাঁরা নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন,—যদু আর নেই, সে চলে গেছে। তা'হলেই আমরা জানতে পারছি যে, পড়ে থাকা যদুর দেহটা আসল যদু নয়; ওটা যদুর ত্যক্ত খোলস দেহ—যাকে সাধারণ ভাষায় মৃতদেহ বলা হয়। এইভাবে আমরা জীব-দেহের সাথে জীবাত্মার পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি। নাস্তিক জড়বাদিগণ বলেন,—বিভিন্ন জড় পদার্থের সমন্বয়ে বিশেষরূপে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় দেহে চৈতন্য উৎপত্তি লাভ করে। ঐ চৈতন্য বা আত্মা দেহের সঙ্গে উৎপত্তি হয় ও দেহের সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপ ধারণা মোটেই সত্য নয়,—বরং কাল্পনিক। জড়দেহ হতে চেতন জীবাত্মার উদ্ভব হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তা'র কারণ-স্বরূপে কিছু যুক্তির অবতারণা করছি;—

প্রথমতঃ জীবাত্মা চিদ্বস্তু। চিদ্বস্তুর উপাদান জড়বস্তু হতে পারে না। চিদ্‌বস্তুর উপাদান চিদ্‌বস্তুই হবে। জীবাত্মা বা জীবন যদি জড়দেহ হতে উদ্ভব হয় আবার মৃত্যুতে জড়দেহেই বিলীন হয়, তা'হলে জীবাত্মা জীবদ্দশায় চেতন ও মৃত্যুতে জড়পদার্থে পরিণত হয়—এই যুক্তি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় না। আগুনের ধর্ম্ম তাপ প্রদান করা। আগুন কখনও উত্তপ্ত, কখনও শীতল—এরূপ হয় কি? বস্তুর গঠনে তার নিত্যসহচররূপে ধর্ম্ম থাকে। ধর্ম্ম কখনও তার ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে না। জড়ের বিপরীত চেতন। জড়বস্তু কখনও তার বিপরীত ধর্ম্ম চেতন হতে পারে না। জীবাত্মার চেতনার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি (**free will**), জ্ঞান শক্তি (**knowing**) ও অনুভব শক্তি (**feeling**)

আছে, যা' জড়দেহের অভ্যন্তরের স্থূল-সূক্ষ্ম জড় পদার্থগুলির মধ্যে থাকা সম্ভব নয় ও উদ্ভব হওয়াও সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও অনুভবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এভাবেই বুঝা যায়, জড়দেহ হ'তে জীবাত্মার উদ্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ জীবের দেহের গঠনে যে পদার্থগুলি আছে, সেগুলি নিশ্চয়ই জড় পদার্থ, আদৌ কোন অংশে চেতন নহে। যদি দেহ-যন্ত্রের পদার্থগুলি থেকে চেতন জীবনের উদ্ভব হ'ত, তা'হলে জীব চিরজীবী হত। পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই, যা' চিরকাল বেঁচে আছে বা থাকবে। জীবের দেহটা জড়, ইন্দ্রিয়গুলিও জড়। জড়দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি হ'তে যদি জীবনীশক্তি আসে, তা'হলে জড়দেহ জীবনীশক্তি হারিয়ে মৃত হয় কিভাবে? ধরা যাক্, কোন সুস্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি তার দেহটা ডাক্তারীমতে পরীক্ষা করিয়ে নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে জেনে ট্যাক্সিতে চেপে গন্তব্যস্থানে যাবার পথে হঠাৎ মারা গেল; অথবা কোন সুস্থ লোক চেয়ারে বসে কথা বলতে বলতে মারা গেল—এমনটা কেন হয়? মৃত্যুর সময় সেই ব্যক্তির দেহে কোন অসুখ নিশ্চয়ই হয়েছিল, তাই সে মারা গেল—ইহাই উত্তর হ'তে পারে। জীবদ্দশায় দেহের অভ্যন্তরস্থিত যাবতীয় রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থসমূহ থাকা সত্ত্বেও লোকে হঠাৎ জীবনীশক্তি হারায় কেন? জড়পদার্থগুলি যদি জীবনীশক্তি তৈরী করতে পারে, তা'হলে জীবনীশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারতো! কিন্তু বহু চেষ্টাদ্বারা জড় উপাদান তথা রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি দেহের মধ্যে সংযোগ করেও কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচানো যায় কি? জড়দেহ হ'তে যদি জীবনের উৎপত্তি হয়, তবে জড়দেহ থাকাতেই জীবন চলে যায় কেন? খরস্রোতা নদী, জলপ্রপাত, কৃত্রিম জলপ্রপাত প্রভৃতি থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, সেই জলপ্রবাহের গতি যদি বরাবর ঠিকমত রাখা যায়, অথবা তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ঠিকমত তাপশক্তি বহাল রাখা যায়, তা'হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভাটা পড়বে কেন ব বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হবে কেন? জলপ্রবাহ কিংবা তাপশক্তি জড়বস্তু, বিদ্যুৎও জড়বস্তু—তাই দুই জড়বস্তুকে ইচ্ছা করলে উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে বরাবর চালু রাখা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জীবের দেহ জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট আর জীব আসলে চিৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মা—পরস্পর বিজাতীয় ও বিপরীত বস্তু এবং চিদ্বস্তু আত্মা জড়দেহের মালিক (**proprietor**) হওয়ায় জীবাত্মার অস্তিত্বেই দেহের জীবন্ত অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। দেহের মধ্যে আত্মার অবস্থান ও অনবস্থানের উপর দেহের চেতনতা-প্রযুক্ত স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই ইচ্ছা করলেও কোন

ব্যক্তিকে চিরকাল বাঁচানো যাবে না। জড়দেহের মধ্যে জীবাত্মার চিদ্ধর্ম্মের পরিচয় আমরা জীবের জন্ম, অবস্থান, বর্দ্ধন, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্‌বিকারদ্বারা পেয়ে থাকি। দেহের ঐ ছয়টি বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হলেও আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না। যথা—"জন্মাদ্যা ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ" (ভাঃ ৭।৭।১৮)। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ২।২০ শ্লোকে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা"—বাণী-অনুসারে আত্মা ষড়্‌বিকারশূন্য, নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী বলে জানা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ২।১১ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "গতাসূন্" ও "অগতাসূন্"—এই শব্দদ্বয়দ্বারা জানিয়েছেন যে, "গতাসূন্" অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি-রহিত নশ্বর স্থূলদেহ এবং "অগতাসূন্" অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি-সহিত নশ্বর সূক্ষ্মদেহ (মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক জীবোপাধি)—উভয়ের পরিচয় জেনে পণ্ডিতগণ শোক করেন না। স্থূলদেহ নাশের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহ নাশ না হলেও, জীবের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি হলেই বা মুক্তিতে সূক্ষ্মদেহের নাশ হয়। সূক্ষ্মদেহ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাশ হয় না। সূক্ষ্মদেহ অনাদি হলেও উহা বিনাশশীল বা নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। দেহ জড়জাতীয় বস্তু, আর দেহী আত্মা চিজ্জাতীয় বস্তু হওয়ায় দেহের উপর দেহীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য্য। জড় স্থূলদেহের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই,—দেহীর ইচ্ছাতেই স্থূলদেহ কার্য্য করে। ইচ্ছাশক্তিবিহীন জ্ঞানহীন স্থূল-দেহ জড় পদার্থমাত্র—তা'হতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিযুক্ত জীবাত্মার সৃষ্টি কি সম্ভব হতে পারে?

তৃতীয়তঃ যদি জীব-দেহের জড় পদার্থগুলির সমন্বয়ে জীবন বা জীবাত্মার সৃষ্টি সম্ভব হত, তা'হলে আধুনিক জড় বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় জড় পদার্থগুলি নিয়ে নর-দেহ ও নারী-দেহের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'ত। কিন্তু তথাকথিত বিজ্ঞানীরা তদ্‌বিষয়ে অক্ষম। আবার পুরুষ ও নারী উভয়ে দৈহিক মিলনে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময়ে পুত্র বা কন্যা সন্তান পেতে পারে না। পুরুষদেহ বা নারীদেহের কোনপ্রকার সাহায্য না নিয়ে কোন মানব শিশুর তথা পুত্র বা কন্যার জন্ম সম্ভব হয় না। পুরুষদেহ ও নারীদেহের মিলনে কোন শিশুর জন্ম হলে সেই শিশুর দেহে আত্মার অবস্থানে শিশুকে জীবন্ত বলা হয়, আর আত্মার অনবস্থানে শিশুটিকে মৃত বলা হয়। মৃত শিশুর দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাংশগুলি ও অন্যান্য পদার্থগুলি যতই সুবিন্যস্ত থাকুক, তথাপি তা' হ'তে জীবিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জড় বা অচেতন পদার্থসমূহদ্বারা গঠিত দেহে অচেতন পদার্থগুলি হ'তে চেতনতা বা জীবতা আসে না। অন্ধকার হ'তে আলোক উৎপত্তি হয় না, পরন্তু আলোক

হতেই আলোক আসে,—আবার আলোক অন্তর্হিত হলে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়। চেতন আত্মার উপস্থিতিতে জড়দেহ চেতনতা লাভ করে, আবার চেতন আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থতঃ ভূমি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চভূতের তৈরী মানুষের দেহ মৃত্যুর পরই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায় না,—দেহ পড়ে থাকে, কিন্তু সেই দেহে চেতনা থাকে না। মৃত মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই বিদ্যমান সত্ত্বেও মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতির কর্ম্মশক্তি থাকে না, সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়ে থাকে। জীবিত অবস্থায় যে চেতনা দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ কার্য্য করতে পারত, মৃত্যুর পর সেই চেতনা দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ায় বা দেহ থেকে লুপ্ত হওয়ায় দেহ অচেতন বা জড় অবস্থায় পরিণত হয়। মানব-দেহ যে যে জড়বস্তুর সংযোগে গঠিত সেই সেই জড়বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে গুণগুলি বিদ্যমান ছিল,জড় বস্তুগুলির সংযোগের ফলে সেই গুণগুলিই পরিস্ফুট হয়ে থাকে। কিন্তু চেতনা আদৌ জড়বস্তুর গুণ নয়,—তাই দেহস্থিত জড়বস্তুগুলি হ'তে চেতনা বা আত্মার উদ্ভব হয় না বা হ'তে পারে না।

পঞ্চমতঃ জীবাত্মা জীবের কোনও একস্থানে অবস্থান করে সমগ্র দেহের সর্ব্বত্র তার শক্তি বিস্তার করে থাকে ; যেমন উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায়,—একটা ছাগলের লেজ কেটে ফেলে দিলে সে বেঁচে থাকে, তার পা কেটে ফেলে দিলে সে বেঁচে থাকে, কিন্তু তার গল কেটে দেহ হতে বচ্ছিন্ন করে দিলে সে বাঁচে না অথবা তার মাথায় বা ঘাড়ে জোরে আঘাত করলে সে বাঁচে না—তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এমতাবস্থায় বুঝতে পারা যায়,—তার মাথায় বা ঘাড়ে এমন কিছু বস্তু আছে যা'র শক্তি তার সমস্ত শরীরে ব্যপ্ত থাকে। তার দেহের কোন অংশে সামান্য আঘাত লাগলে সে জানতে পারে। সেই ছাগলের দেহের সর্ব্বত্র চেতনা থাকলেও সমস্ত চেতনার উৎস তার মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে,—ইহা বুঝা যায়। Power house হ'তে Electricity আমাদের ঘরে ঘরে সরবরাহ (Supply) হয়ে থাকে। যদি Power house হতে Electricity সরবরাহ না হয়, তা'হলে আমরা ঘরে-দুয়ারে Electricity পাব না। তেমনি জীবন্ত ছাগলের সমগ্র দেহে যে চেতনাশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই চেতনার Power housetি ছাগলটির মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে। কোন কারণে ঐ চেতনার Power house মস্তিষ্ক থেকে অপসারিত হ'লে ছাগলটির চেতনা লুপ্ত হবে অর্থাৎ সে মারা যাবে। যদি ছাগলটির জড়দেহের সমস্ত কোষ হ'তে চেতনার অভ্যুদয় হ'তো, তা'হলে ঐ চেতনাশক্তি মস্তিষ্কের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে কেন ? যদি বলা যায়—মস্তিষ্কের কোষগুলি এবং তথাকার

পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্ট যে, তা' হতে চেতনাশক্তির উদ্ভব হয়েছে, তখন প্রশ্ন জাগে,—মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঐরূপ পরিবেশ কে সৃষ্টি করল বা কোথা থেকে সৃষ্টি হল? জড়দেহ হ'তে চেতনার উদ্ভব হয়—বল্‌লেই তা' হবে না। জড়দেহের অভ্যন্তরস্থ Partsগুলি কে সৃষ্টি করল?—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগ্রত হয়। একটা ইঞ্জিনের অভ্যন্তরের যাবতীয় machinery parts ঠিকমত সজ্জিত করে অর্থাৎ ডিজেল বা পেট্রোলদ্বারা চালিত করার মত পরিবেশ রচনা করে তা'তে পেট্রোল বা ডিজেল দিলে ইঞ্জিন চালু হয়। কিন্তু সমুদয় parts অকেজো হয়ে গেলে অর্থাৎ পরিবেশ নষ্ট হলে তা'তে ডিজেল বা পেট্রোল দিলেও ইঞ্জিন চালু হবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনি ছাগলটির মাথার অভ্যন্তরের কোষগুলি তথা উপাদানগুলি ঠিকমত সংগঠিত থাক্‌লে জীবাত্মার উপস্থিতিতে তার দেহ জীবন্ত হয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু কোষগুলি অকেজো হয়ে গেলে অর্থাৎ জীবাত্মা থাকার মত মাথার মধ্যে পরিবেশ রচিত না থাক্‌লে আত্মা থাকে না—তখনই দেহকে মৃত বলা হয়। পেট্রোল বা ডিজেল যেমন ইঞ্জিনের parts নয় বা ইঞ্জিনের ভিতরের কোন উপাদান নয়,—উহা পৃথক্ বস্তু; ঐ পেট্রোল বা ডিজেলের অভাবে ইঞ্জিন চলে না, তেমনি জীবাত্মা ছাগলটির মাথার অভ্যন্তরের পরিবেশের কোনও উপাদান নয়, উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু; জীবাত্মার অভাবে ঐ ছাগলটির বা কোন জীবেরই জীবতা থাকে না। পেট্রোল বা ডিজেল জড় পদার্থ, আর ইঞ্জিনের partsও জড় পদার্থ—তাই এগুলি আমরা স্থূল জড়চক্ষে দেখতে পাই। মাথার কোষগুলি জড় পদার্থ,—তাই সেগুলি স্থূল জড়চক্ষে দেখা যায়; কিন্তু জীবাত্মা চিদ্বস্তু হওয়ায় আমরা স্থূল জড়চক্ষে তা' দেখতে পাই না। যদি ছাগলটির মাথার কোষগুলির মধ্যে প্রাণ তৈরীর উপাদান থাকে, তবে সেই উপাদানগুলি যেরূপ আছে, সেইরূপভাবে থাকলে তার মৃত্যু হবে না। নূতন উপাদান তৈরী করা অপেক্ষা সেই উপাদানগুলিই যথাযথ রেখে ছাগলটিকে চিরকাল বাঁচানো যায় কি? প্রাণ বা চেতনাশক্তি তথা জীবাত্মা জড়-বস্তু নয়,—তা'র উপাদানগুলিও জড় হ'তে পারে না। ছাগটিলকে বাঁচানোর জন্য যেভাবেই চেষ্টা করা হোক্ না কেন, তার একদিন মৃত্যু হবেই। মৃত্যুর হাত হ'তে কোন জীবই রেহাই পাবে না। জীবাত্মাই জীবের চেতনাশক্তির উৎস বা মূল। জীবের জড়দেহ হ'তে জীবাত্মার উদ্ভব হয় না বা হ'তে পারে না।

বস্তুতঃ জীবের দেহের অভ্যন্তরের গঠনতন্ত্রসমূহের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধেই আমরা বিশেষ কিছু জানি না, ঐ জড়সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কেই যখন অজানা, তখন চিদ্বস্তু আত্মাকে জানা দুরূহ। জীবের জড়দেহ হ'তে যদি জীবাত্মা বা প্রাণের সৃষ্টি হয়, তা'হলে একই পিতামাতার সন্তানগণ বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন বুদ্ধির, বিভিন্ন

গুণের, বিভিন্ন মনের হয় কেন? নিরক্ষর মূর্খ পিতামাতার সন্তান মেধাবী প্রতিভাবান্ উচ্চশিক্ষিত হয় কি করে? আবার অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান উচ্চশিক্ষিত হয় না—এমনও অনেক দেখা যায়। দেশে-বিদেশে এমন অনেক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবি দার্শনিক, রাজনৈতিক নেতা, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক প্রভৃতি আছেন, যাঁদের পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ের কোন খ্যাতি নেই। অসুরের সন্তান মহাভাগবত হয়েছেন, মুসলমান-বংশের সন্তানও পরম-বৈষ্ণব হয়েছেন —এমন দৃষ্টান্তও আছে। সচ্চরিত্র সৎ ব্যক্তির কোন কোন সন্তান দুশ্চরিত্র ও অসৎ পথাবলম্বী হয়ে থাকে, আবার দুশ্চরিত্র অসৎব্যক্তির কোন সন্তান সচ্চরিত্র ও সাধু হয়। সাধারণের ধারণায় সন্তানের জড় দেহটা পিতামাতার দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং সন্তানের দেহের অভ্যন্তরের যাবতীয় **parts** মাতৃজঠরেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন কোষ প্রভৃতির সমন্বয়ে যদি জীবাত্মার সৃষ্টি হ'ত, তা'হলে সেই জীবাত্মার মন, স্বভাব, গুণ, ব্যবহার, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদি বংশানুক্রমিক ধারায় পিতামাতার মতই হ'ত। কিন্তু বাস্তবে তা' হয় না। একই পিতামাতার সন্তান বিভিন্ন স্বভাবের হওয়ায় তাদের বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় এবং তাদের আনন্দ-চর্চ্চাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার পরিবর্ত্তে অনেকক্ষেত্রে শত্রুতাও প্রকাশ পায়। কেন এমন হয়? এতে কি প্রতীয়মান হয় না যে, জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত বস্তু? পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মার পৃথক্ পৃথক্ মন, স্বভাব, বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আছে। যে জীবাত্মা যে দেহকে আশ্রয় করে থাকে, সেই জীবাত্মার স্বভাবাদি সেই দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

সপ্তমতঃ জীবাত্মা জড়দেহ হ তে পৃথক্ দেহাতিরিক্ত চিদ্বস্তু—ইহা বুঝাবার জন্য শ্রীমদ্ বাদিরাজতীর্থ স্বামিপাদ-কৃত "যুক্তিমল্লিকা" গ্রন্থের কিছু যুক্তির অবতারণা করছি ;—

"অপি চাব্যঙ্গকুণপে মরণং নাম কিং তব।
পূর্ব্বদৃষ্টাঙ্গনেত্রাদেঃ পশ্চাদপি চ দর্শনাৎ ॥ ৮৮ ॥
তস্মাদ্দেহান্যজীবাত্মা তত্র নাস্তীতি সা মৃতিঃ।
ইত্যেব সর্ব্বথা বাচ্যং ন চেৎ মৃত্যা মৃতিস্তব ॥ ৮৯ ॥
অতীন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং নাস্তি গোলকং তুভয়ত্র চ।
আত্মাদৃষ্টে ন কুত্রাপি কিং ন্যূনং কুণপস্য তৎ ॥ ৯০ ॥
পূর্ণো জীবার্হযোগোস্মিন্নানাক্রিম্যাত্মকে ক্রমাৎ।
তস্মাদ্দেহস্বামি-জীবস্যাভাবোত্র ধ্রুবো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

মনুষ্য-সৃষ্ট ঈশ্বর, না—ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্য

বলিতেছিলাম, এখন গণ-পিটুনীর যুগ চলিতেছে। একক-হত্যা বা দুই-তিনজন মিলিয়া হত্যা একটী অপরাধ বলিয়া গণিত হইলেও বহুজনের সংঘটনে হত্যা বর্ত্তমানে নির্দ্দোষত্ব লাভ করিতেছে। সেই অবসরে গণ-নাস্তিকতাও অবগুণ্ঠনের অবসান ঘটাইয়া বেহায়া হইয়া পড়িতেছে। দৈবীমায়ার দেদার মার খাইয়াও বলিতেছে,—"কোথায় মার খাইলাম? আমার দাঁতগুলি ত' এখনও সব ভাঙ্গে নাই। সুতরাং মারিল কই?"

'রাজা'-সৃষ্টির দৃষ্টান্তে ঈশ্বর-সৃষ্টি (!)

রাজা-সম্রাটের সূর্য্য অস্তাচলে গিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ করিয়া "আমরা সবাই রাজা" হইবার স্বপ্নসুখে বিভোর। ফলতঃ রাজদ্রোহিতা এখন আমাদের স্বভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু "লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়"—ইহাকে উড়াইয়া দিতে না পারায় প্রজা-সৃষ্ট "রাজ-তন্ত্রের" সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির উন্মাদনা ইহাদের এতই পাইয়া বসিয়াছে যে অবশেষে ঈশ্বরেরও স্রষ্টার (!) আসন আর বাকি থাকিল না। তাই এখন "আমরা সবাই ঈশ্বর" হইয়া করুণা করিয়া ভগবান্‌কে ঈশ্বর বানাইয়াছি।

গণ-নাস্তিক্যের ইতিহাস

বস্তুতঃ নাস্তিক্যেরও সুদূর ইতিহাস আছে। সেই সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যবলে নাস্তিক-শ্রেষ্ঠের (অসুরবর্য্যের) স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিষ্ণু-ভক্তি ও ভক্তের চরম-অবমাননা শুরু করিলে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব শিশ্নোদর-সম্বল নাস্তিক্যবাদের উদর চিরিয়া আস্তিক্যের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা প্রমাণ করেন। উক্ত 'হিরণ্য'দ্বয়ের হীনতা কালপ্রবাহে চতুষ্পদ-ধর্ম্মের এক এক পদের পতন হইতে থাকিলে তাহা গণ-নাস্তিক্যের বিশাল-মহীরুহে পরিণত হয়। ইহার নানান্ শাখায় নাস্তিক্যের নানান্ নীতি। কোন শাখায় বেদ-বিরোধী নিরীশ্বরবাদ (বৌদ্ধধর্ম্ম) (কু) ফলিত। আবার কোনটীতে বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদের (শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত মায়াবাদের) (অনা) সৃষ্টি। প্রথমটীতে ঈশ্বরকে শূন্যায়িত করিয়া বহু কৃচ্ছ-সাধনযোগে মানুষের শূন্যমুখী ন্যূন-মতবাদ। আর দ্বিতীয়টীতে "অনবগত"-গুরু-উপদিষ্ট অশ্রৌত-পথ অনুসরণ করিয়া মানুষেরও নির্ব্বিকার ঈশ্বরে বিকৃতি লাভ। ইহারা উভয়ই ভগবচ্চরণে অপরাধী—

সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে নরক-দ্বারে উপনীত হয়।

জড়বাদের ইতিকথা

তবে আমাদের আলোচনীয় জড়বস্তুনিষ্ঠ-নাস্তিক্যবাদ উক্ত মহীরুহের অপর এক শাখায় উৎসৃষ্ট। উপরিউক্ত নারকীদ্বয় বর্ত্তমান বিচারাধীন পাষণ্ডীর পূর্ব্বসূরী। এই জড়বাদের ইতিকথা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান জড়বৈজ্ঞানিকগণের নিকটও অজ্ঞাত অথবা অস্বীকৃত। একসময়ে আত্মজ্ঞান-লাভোদ্দেশ্যে অসুরগণের পক্ষ হইতে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল। ব্রহ্মাজীর নির্দ্দেশক্রমে বহু-ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে আত্মশিক্ষা ব্যাখ্যাত হইলেও তাহার গূঢ়ার্থ অসুরপতির স্থূল-বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু "সব জানিয়া ফেলিয়াছি"—মনে করিয়া নিজ-সমাজে আসিয়া প্রচার করিতে লাগিল,—"আত্মা বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই। এই দেহই আত্মা, সুতরাং ইহার পুষ্টি-সাধন হইলেই আত্মোন্নতি ঘটিবে।" পরবর্ত্তীতে ভোগোদ্দীপনকারী চারু-বাক্‌ময় চার্ব্বাক্ তাঁহার বিখ্যাত—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" ইত্যাদি কথা ঘোষণা করিলে জড়বাদ দেহসর্ব্বস্বগণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে।

অপদার্থ—সুব্রহ্মণ্য

সম্প্রতি এক পদার্থ-বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখরের এক উক্তি তাঁহার অনুরাগী-বৃন্দের মধ্যে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। "ঈশ্বর মানুষের শ্রেষ্ঠ-আবিষ্কার (!)"—ইহাতে গণ-নাস্তিক্যবাদের পালে শ্রেষ্ঠ-হাওয়া লাগিয়াছে। সুব্রহ্মণ্যবাবুকে ধন্যবাদ। কারণ, তিনি অন্ততঃ মানুষের অন্যান্য "টেষ্ট-টিউব-শিশু"-আবিষ্কার ইত্যাদির সহিত একাকার না করিয়া "ঈশ্বর-আবিষ্কারকে" শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়াছেন। তবে সুব্রহ্মণ্যজী পদার্থ ছাড়িয়া অপদার্থতাকে লালন করিতে গিয়া নিজকে এবং অন্যান্যকে মুশ্‌কিলে ফেলিয়াছেন। কারণ, যে-সকল পদার্থ লইয়া তাঁহাদের ঘাঁটাঘাঁটি, তাহারা পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন না কোনটীর অধীন। এবং সেইসকল পদার্থ হইতে আবিষ্কৃত-পদার্থটীরও তদ্রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের অধীনতা থাকে। তাই, একটী বড় অভিলাষ—বহু সাধন-ভজন করিয়াও শুধু কপটতা-দোষে, পর্ব্বত-প্রমাণ অনর্থের কারণে অশরণাগত-আমার যখন ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব হইতেছে না, তখন অন্ততঃ ব্রহ্মণ্যজীর সৃষ্ট-ঈশ্বর (!) দেখিয়া চক্ষু-সার্থক করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য,—তিনি মহাকপট এবং সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের অনর্থ-রাশিকে অর্থ-ভ্রমে জমা করিয়াছেন। তাই, তাঁহার আবিষ্কৃত-ঈশ্বরের দর্শন-স্পর্শনাদি কোন-

প্রকার যোগ্যতার্জ্জন সম্ভব হয় নাই। অর্থাৎ পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটী অপদার্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। এমতাবস্থায় সুব্রহ্মণ্য-বাবুকে বর্ত্তমানে এক অপদার্থ-বিজ্ঞানী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? সুধীবৃন্দ! আপনারাই বিচার করুন।

পশূনাং লগুড়ো যথা

এই সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বে পরা-বিজ্ঞানী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটী অন্যতম মহাবাক্যের উদ্ধৃতি আবশ্যক,—

জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥

জড়বিদ্যাগ্রাহিগণ সম্ভবত হঠাৎ তাঁহাদের এইরূপ গর্দ্দভত্ব সর্ব্ব-সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায় বিচলিত হইয়া পড়িবেন। কেহবা ক্রোধ-প্রকাশমুখে শাকদ্বারা গাধাকে ঢাকিবার অপচেষ্টা করিবেন। আমরা নানান সুযুক্তিদ্বারা তাঁহাদের এইরূপ অপচেষ্টা রোধ করিব। গাধার সহিত আমাদের কোন বাধা নাই—জীবনের মূল উদ্দেশ্য বুঝাইলেও যদি না বুঝেন তবে সংসারে ইঁহারা উদর-শিশ্ন লইয়া বোঝা টানিয়াই সমগ্র-জীবন অতিবাহিত করুন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহারা যদি নিজেদেরকে মণিবের পালক-পোষক ভাবিয়া তাঁহার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লইতে চাহেন, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের "পশূনাং লগুড়ো যথা"—নির্দ্দেশটী স্মরণ-যোগ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে—"দেখ, তোমরা গাধা-ই, মণিব নহ। তাঁহার অধীন লাল্য-পাল্য জীববিশেষ।"

যত মত তত পথ—অনুসরণে মানুষের শ্রেষ্ঠ আজগুবি আবিষ্কার

পশ্চিম-দিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া গমন করিলে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বস্তু হইতে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতে হয়। কামরূপ-কামাখ্যা নামক ট্রেনে (৫৬৫৯ আপে) উঠিয়া 'মথুরা পৌছাইব"—ভাবিলেও উহার সার্থকতা নাই। কামাখ্যায় পৌছাইয়া মথুরার কোন বিবরণ মিলিতেছে না দেখিয়া, "মথুরা বলিয়া কিছুই নাই"—বলিয়া ঘোষণা করিলে মথুরাবাসিগণ নিশ্চয়ই হাসাহাসি করিবেন। আসলে ঘটনা কি হইয়াছে, শুনুন। বর্ত্তমানে "যত মত তত পথ" বলিয়া বাজারে খুব একটী চটকদার-কথা চলিতেছে। উহাতে জড়েন্দ্রিয়-সর্ব্বস্বগণের সকলপ্রকার খোরাক যোগানো হইতেছে দেখিয়া সবাই গোগ্রাসে তাহা গিলিতেছে। সুব্রহ্মণ্যজী প্রমুখ বিজ্ঞানীগণও কোন প্রমাণের ধার না ধারিয়াই তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে,—আর ইহাতেই যত বদ্‌হজম হইতেছে। তাই, ভাবিলেন—পদার্থ-অপদার্থ, রসায়ন-অরসায়ন সবই যখন ঠিক, তখন ইলেকট্রন্-প্রোটন্-নিউট্রনের তপস্যা করিতে করিতেও

তাঁহার গবেষণাগাররূপ তপোভূমিতে ঈশ্বরকে আবিষ্কার (Discover) করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তাহাতে 'ঈ' তে—ঈগল নামক বস্তুটীরও দেখা না পাইয়া শেষে তাঁহার অজ্ঞতারূপ গাধাকে ঢাকিতে বিজ্ঞের ঢঙে ঘোষণা করিলেন—"ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই, উহা মানুষেরই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার (Invention)।" অর্থাৎ মানুষ ইহার পূর্ব্বেও বহু আজগুবি-পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে, তবে বর্ত্তমানে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাই সুব্রহ্মণ্য-নামক মানুষটীর শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক আজগুবি আবিষ্কার।

শ্রদ্ধাহীনদের প্রতি অনধিকার-চর্চ্চা না করিবার উপদেশ

যে-কোন বিদ্যার্জ্জনের পূর্ব্বে সেই সেই বিদ্যার প্রতি বিদ্যার্থীর শ্রদ্ধার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—"আদৌ শ্রদ্ধা", "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" ইত্যাদি। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া ঈশ্বরানুসন্ধান সত্যই হাস্যাস্পদ। চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইলে শুধু তৎপ্রতি শ্রদ্ধাই যথেষ্ট নহে, একজন প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয়। বাজার হইতে চিকিৎসা-বিদ্যার সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না। বরং "অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী" হইয়া রোগ-নাশ করিতে গিয়া রোগী-নাশ হইয়া যাইবে। আবার তজ্জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারস্থ হইলেও উক্ত বিদ্যার্থীর অভীপ্সিত বিদ্যার্জ্জন "ধান ভান্‌তে শিবের গীতের" ন্যায় অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ পারমার্থিক-বিজ্ঞান তথা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি শ্রদ্ধার যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে একজন অন্তরে-বাহিরে ঐশ্বরিক এবং ঈশ্বর-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-প্রদাতার প্রতি প্রপত্তি স্বীকৃত না হইলে সকল শ্রদ্ধা একেবারে মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং জড়বিজ্ঞানী এবং জড়-বিজ্ঞান-পিপাসুগণের নিকট অনুরোধ,—তাঁহারা যদি সেই পরা-বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ন.-ই হইতে পারিলেন অথবা কোমল-শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা-গুরুর নিকট শরণাগত না হইবার দাম্ভিকতা পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেন, তবে যেন তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন। তাহাতে সবারই মঙ্গল।

রমণ—দমন

এই সম্পর্কে ১৯৩০ সালে, প্রয়াত সুব্রহ্মণ্য চন্দ্রশেখরজীরই পিতৃব্য তদানীন্তন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি. ভি. রমণ এবং তাঁহার নিকট জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রেরিত একজন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গৌড়ীয়—শ্রীহয়গ্রীবদাস ব্রহ্মচারীর (পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের) সহিত যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার কিছু দিগ্‌দর্শন করা যাউক্। শ্রীভগবান্

বিজ্ঞানীজীর **Sense experience**-এর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত সে-বিষয়ে ধ্যান দিবার পরাঙ্মুখতা তিনি জানাইলে সদ্‌যুক্তিবিদ্ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রশ্ন করিলেন,—তাঁহার ছাত্রগণ শিক্ষা-লাভের পূর্ব্বেই যদি তাঁহার নিকট হইতে তদনুভূত বৈজ্ঞানিক সত্য অনুভব করিতে চাহেন, তবে তাহাতে তিনি সমর্থ কিনা? উত্তরে নোবেল-বিজয়ী ডক্টর বলিলেন,—**"No, they are to come to my process through which I have realised the truth.** (না, আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য অনুভব করিয়াছি, তাহাদিগকেও সেই পদ্ধতিতে আসিতে হইবে)।" তদ্রূপ আর্য্য-মুনি-ঋষিগণ যে পদ্ধতিতে আত্মা-পরমাত্মা-ভগবান্ অনুভব করিয়াছেন এবং তদ্দর্শনহেতু পরাশান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজন-পন্থাকে পূর্ব্বেই অস্বীকার করিয়া বসিলে সেই **Absolute Truth** আমাদের নিকট চির-রহস্যাবৃতই থাকিবেন। বলাবাহুল্য, রমণবাবুকে দমন করিতে উহাই যথেষ্ট ছিল। তিনি পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজের অনাগ্রহ সুতরাং অজ্ঞতা অত্যন্ত দীনতার সহিত তাঁহার নিকট স্বীকার করিলেন।

জড়বিজ্ঞানীগণ প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকগুণে অনুমান-প্রিয়

Sense experience—লইয়া কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ইহা জড়-বিজ্ঞান-নিষ্ঠ নাস্তিক্যবাদের মূলমন্ত্র। প্রত্যক্ষবাদী বলিয়া ইহাদের বড় অভিমান, কিন্তু ইহার মূলে প্রচুর কপটতা বর্ত্তমান। কারণ, ইহারা অত্যন্ত অনুমান-নির্ভর—তখন আর প্রত্যক্ষ-বিচারের কোন অপেক্ষা করেন না। যেমন,—বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে ইহাদের বক্তব্য,—"পূর্ব্বে জীবন বলিয়া কিছু ছিল না, সূর্য্য হইতে হঠাৎ এক জ্বলন্ত-পিণ্ড ছিট্‌কাইয়া পড়িলে তাহা সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এইরূপে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে ইহার উপরে এক শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয়। পরে দৈবাৎ ভূ-পৃষ্ঠে এক ছত্রাকের উদ্ভব হয়—ইহাতেই জীবনের প্রথম সত্তা লক্ষিত হয়, ইত্যাদি।" বিশ্ব-সৃষ্টির এইরূপ ব্যাখ্যা মানিতে হইলে এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে স্বীকার করিতে হয়, যিনি সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা বর্ণনা দিতেছেন। তাহা হইলে, পূর্ব্বে জীবন বলিয়া কিছু ছিল না, ইহা কিরূপে সম্ভব? জড়বিজ্ঞানীগণ এইরূপ তথ্য বিবৃত করিতে এবং সে-তথ্যলিপ্সুগণ তাহা গ্রহণ করিতে কোনরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। কিন্তু ভগবৎতত্ত্ব আলোচিত হইতে গেলেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইবার অবৈধ এবং নির্লজ্জ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবাক্ হইতে হয়, এই তথাকথিত মুক্তমনা, যুক্তিবাদী ও কুসংস্কার-বিরোধিগণ কোন্

যুক্তি ও সংস্কারবশতঃ এইরূপ সম্পূর্ণ-অনুমানভিত্তিক তথ্যগুলি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া ফেলেন? এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী কি আছেন (অথবা স্বয়ং ডারউইনজীও) যিনি কোন বানর অথবা গরিলাকে মনুষ্যে রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াছেন? আর কত বলিব! শুধু বলি—হে জড়বিজ্ঞানীগণ ও তদনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা যে পরিমাণে প্রত্যক্ষবাদী তাহা অপেক্ষাও অধিক অধিক গুণে কল্পনাবিলাসী ও অনুমান-প্রিয়। ইহা কি অস্বীকার করিতে পারিবেন? আর ইহাও বলি,—অনুমান কদাপি প্রমাণ নহে।

কার্য্য-কারণ-সূত্রে ঈশ্বর

ন্যায়-শাস্ত্র কার্য্য-কারণ সূত্র (**Cause & Effect Theory**) অনুসরণ করিতে যাইয়া এই বিরাট্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্যের কারণরূপে নশ্বর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ্, মনীষী, কর্ম্মবীর, কবি, যাদুকর অথবা দৈবাৎ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া একজন নিত্য, অনন্ত-শক্তিমান্‌কে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাই যুক্তিবাদিগণের যথার্থ যুক্তি-প্রয়োগ। তাহা না করিয়া এই সমগ্র সৃষ্টিকে কেবল একটী **Accident** বলিয়া ব্যাখ্যা করার মধ্যে কোন বিশেষ জ্ঞানের (বিজ্ঞানের) প্রয়োজন হয় না। ইহা এক অর্ব্বাচীনও বলিতে পারে। তাহা না হইলে কিছু নিরেট্-বিজ্ঞানী এবং তদপেক্ষাও নিরেট্-মানের, হুজুগ-প্রিয়, স্বীয়-যুক্তি-চিন্তাহীন গোষ্ঠী ছাড়া সুযুক্তিসম্পন্ন সকল দার্শনিক, মনীষী, বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে এক অচিন্ত্য-চালিকা-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে মহাবিজ্ঞানী আইন্‌ষ্টাইনের উক্তিও আলোচ্য,—"বিশ্ব-চরাচরে প্রাণ-অপ্রাণ সকলের কাছে যিনি প্রকাশ, আমি সেই ঈশ্বরকে মানি।** আমি বেশ অনুভব করিতে পারি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির মূলে আছে অজ্ঞেয়, অলৌকিক ও চিরভাস্বর এক বিস্ময়কর প্রতিভার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ।"

জড় বিজ্ঞানীগণ ঈশ্বরকে অপ্রমাণে অসমর্থ, কিন্তু পরাবিজ্ঞানী —শরণাগতের নিকটই তিনি প্রমাণিত

বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বিচিত্র সমস্ত ব্যাখ্যা ঈশ্বর সম্বন্ধে দিয়াছেন। অথচ তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে কোনও বিজ্ঞানীরই পৌঁছানো সম্ভব হইতেছে না। তাঁহারা একদিকে যেমন তাঁহাকে সরাসরি প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না, অপরদিকে তাঁহার সেই নিয়ন্ত্রণাতীত, অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী প্রভাবকে অস্বীকারে অসমর্থ। দিবান্ধ-পেচককুলের নিকট সূর্য্য দৃষ্ট না হইলেও তাহার প্রচণ্ড-উত্তাপ কিন্তু অবশ্য অনুভূত। কারণটী কি, বলি। শাস্ত্রে মুহুর্মুহুঃ ঈশ্বরকে প্রাকৃত (পাঞ্চভৌতিক)-

রূপহীন ও অপ্রাকৃত-রূপবিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং কেবল তাঁহার অসীম, অলৌকিক-প্রভুত্ব অনুভব ব্যতীত তাঁহাকে যে প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা সাক্ষাদ্রূপে চিহ্নিত করা যাইবে না—ইহাই স্বাভাবিক। ইহা জড়বিজ্ঞানীগণ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, ইহা দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইলে জড়-বিজ্ঞানীকে জড়-বিজ্ঞান, জড়-দার্শনিককে জড়-দর্শন, জড়-চিন্তাবিদ্‌কে জড়-চিন্তা, মনস্তাত্ত্বিককে তাঁহার মনস্তত্ত্ব, অহংকারীকে অহংকার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিত্য-সেবা ভাবনায়, তাঁহার নিত্য-কিঙ্করূপে নিযুক্তেচ্ছায় তাঁহার এবং তদনুগতজনের নিকট শরণাগতির বিশেষ প্রয়োজন। শরণাগত, নিষ্কপট, পরাবিজ্ঞানীগণ তাঁহাকে দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বদা দর্শনে সমর্থ। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ (১।২২।২০ ঋক্)।"

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপিবিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রঃ সং ৫।৩৮)

চক্ষুতে অঞ্জন প্রযুক্ত হইলে দৃষ্টিক্ষমতার যদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিত হইতে পারিলে ভক্তিচক্ষুদ্বারা জড়দর্শন অতিক্রম করিয়া অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ-বিশিষ্ট শ্রীশ্যামসুন্দর কৃষ্ণের অপ্রাকৃত দর্শন সম্ভব। 'মধু'র মিষ্ট-স্বাদ আস্বাদনে আগ্রহান্বিত না হইতে পারিলে উহা হইতে বঞ্চিতই হইতে হয় এবং তৎকর্ত্তৃক 'মধু' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যথাযথ হইবে না।

সত্য-সংশয়ে বিনাশ, সত্য-স্বীকারে বিশ্বাস এবং সত্য-দর্শনে সাক্ষাৎ-লাভ বুঝায়

এইরূপ দর্শনকে যাহারা শুধুমাত্র বিশ্বাস বলিতে চাহেন, তাহারা নিতান্তই হতভাগা। 'ধর্ম্ম একটী বিশ্বাস'-বিশেষ বলিলে কিন্তু উহা মানিলেও হয়, আবার না মানিলেও হয়—এরূপ বুঝায় না। যাহা সত্য, বর্ত্তমান অথচ কোন নিমিত্তে তাৎকালিকভাবে ইন্দ্রিয়-অগম্য, তাহাতেই বিশ্বাস-শব্দ প্রযুক্ত হয়। কল্পনাকে বিশ্বাস বলা যাইবে না। জন্ম হইতেই পিতৃহীন অথবা প্রবাস-রত পিতার কোন সন্তানের পিতৃ-সম্বন্ধে বিশ্বাসকে কিছু অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। আবার পিতাকে যাহারা দর্শন করিয়াছে বা করিতেছে, তাহাদের পিতৃ-দর্শনকে 'বিশ্বাস' মাত্র বলিলে সত্যের আংশিক প্রকাশও ঘটে না। যে-স্থলে সত্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস, সংশয়—সে-স্থলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। সত্য

যে-ক্ষেত্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসু-কর্ত্তৃক স্বীকৃত কিন্তু তাঁহার নিকট অপ্রতিষ্ঠিত, সে-ক্ষেত্রে "বিশ্বাস"-সংজ্ঞা। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলে তাহা 'দর্শন'-শব্দবাচ্য হইল। সুতরাং 'দর্শন'-অর্থে সংশয়, বিশ্বাসকেও অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ-লাভ বুঝায়।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩)

শ্রীকৃষ্ণ চেতন-অচেতন সমগ্র বস্তুর একচ্ছত্র অধিপতি। জীব মাত্রই তাঁহার দাস—ইহাই জীবের নিত্য-পরিচয়। ইহাকে মানিলেও হয়, আবার না মানিলেও হয়—তাহা নহে। জড় ভোগের আকর্ষণে ভগবৎ-সেবা অস্বীকারে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে, সেইহেতু সে অশেষ অমঙ্গল বরণ করিয়া লয়। দেবীমায়া-প্রদত্ত ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। রাজাকে না মানিলে রাজদ্রোহিতার অপরাধহেতু যেরূপ সশ্রম-কারাবাস লাভ ঘটে, তদ্রূপ। জীবের চৈতন্যোদয় হইলে তিনি কৃষ্ণকে প্রভু-রূপে সাক্ষাৎ লাভের জন্য কার্ষ্ণের শরণাপন্ন হন—জীব-হিংসা এবং জীব-সেবা (!) উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন-উপদেশরূপ "জীবে দয়া" প্রদর্শনে সচেষ্ট হন—ভগবত ও ভাগবৎ-সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হন। কৃষ্ণ-দর্শন ঘটিয়া গেলে এই জড়-ব্রহ্মাণ্ডের চৌহদ্দি চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ধামে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবায় নিযুক্ত হন ও পরম-সেবানন্দে আপ্লুত হইতে থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম কুসংস্কার হইতে স্বতন্ত্র, হরিভজনোপদেশই সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোনরূপ কুসংস্কার নাই—তাহা অবশ্যই বলা যায় না। যে-কোন শ্রেষ্ঠ-বস্তু সম্বন্ধেই নকলের অপপ্রসার ঘটিয়া থাকে দেখিয়া 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া কোন বস্তুই নাই—বিচারে আসিলে ঠকিতে হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-সকল কুসংস্কার প্রচলিত, তাহা রীতিমত অশাস্ত্রীয়-বিধায় তাহা হইতে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, মানসিক, দৈহিক কোনরূপ উপকৃতি সম্ভব হয় না। শাস্ত্রের সহিত বর্ত্তমান জন-জীবনের সাধারণ সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহারা শাস্ত্রের বিশালতা, গভীরতা, উদারতা, পরম-বিচক্ষণতা, সহানুভূতিশীলতা সম্পর্কে অবহিত নহেন। কিছু জড়-স্বার্থান্ধ ব্যক্তি স্বার্থপরতা-মূলে শাস্ত্রের বিকৃতার্থ করিল বলিয়া শাস্ত্র বলিতেই কিছু কুসংস্কারময় পুঁথি, বুঝিতে হইবে না। ইহাতে একাধারে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থ-নীতি, কামনীতি, চিকিৎসানীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। তন্ত্র-মন্ত্রের যে কিরূপ প্রভাব, তাহার সাক্ষাৎ-দর্শন ঘটিলে কোন বিজ্ঞানী ইহাদিগকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন না। কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য কপটতামূলে ইহার যথার্থ বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা প্রদানের অক্ষমতাকে লুকাইতে

ইহাকে কেবল প্রতারণামূলক হিসাবে অথবা কোন বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। ইহারা তামসিক-শাস্ত্রের সাধারণ পরিণতি মাত্র। শাস্ত্রে জীবের নানান (সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক) প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক নিত্য-কল্যাণের পথে চালিত করিতে জীবের ধারণ-ক্ষমতানুযায়ী তাহাদের প্রতি সেই সেই উপদেশ প্রদত্ত হয়। ইহা শাস্ত্রের পরম বিচক্ষণতা ও সহানুভূতিশীলতা। সর্ব্বশেষে একমাত্র হরিভজনের উপদেশই শাস্ত্র-সার বলিয়া নির্ণীত হয়।

ধর্ম্মের সহিত কাহারও বিরোধ নাই, তবে ইহার যথার্থ ব্যাখ্যার অভাব

বিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগেই কিছু সরল বিজ্ঞানীদিগের নিষ্কপট স্বীকারোক্তিতে বিজ্ঞানের যাথার্থ্য প্রকাশিত হয়। "না, বিজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নয়। মানুষ সব কিছুর ব্যাখ্যা জানে না। বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা খোঁজে মাত্র। তবে এই রহস্য এতই গভীর, এতই বিশাল, সারা জীবন ধরে খুঁজেও এর তল পাওয়া যায় না। (আনন্দবাজার, রবিবাসরীয় তাং ২৯।১০।৯৫)।" বলাবাহুল্য এরূপ নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি খুব কম বিজ্ঞানীই করিতে পারেন। অধিকাংশই বিজ্ঞানের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ভাবমূর্ত্তি (Image)কে নষ্ট করিতে চাহেন না। তাহাতে সমাজে আধিপত্য হারাইবার ভয় থাকে। তাই একদিকে যেমন তাঁহারা তাঁহাদের নানান গবেষণার হতাশাময় ফলাফল, অক্ষমতা লোক-সমক্ষে প্রকাশ করেন না, অপরদিকে বিশ্ব-রহস্য, জন্মান্তর-বাদ-রহস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদীর প্রচণ্ড-অভিমান লইয়াও সম্পূর্ণ কল্পনা-ভিত্তিক এরূপ অপ্রমাণিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন যাহাতে সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা (!) বজায় থাকে। ইহা অত্যন্ত অসৎ-বুদ্ধির পরিচয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কিংবা সমাজের কোনরূপ বিরোধিতা নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অশেষ অজ্ঞতার কারণে না বৈজ্ঞানিক, না সমাজপতি, না চিন্তাবিদ্ কেহই ইহাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিতেছেন না। বরং ইহার সম্বন্ধে নানারূপ অপপ্রচারদ্বারা জনসমাজে অহেতুক ভীতি, ঘৃণা, অনীহা ও বিরক্তি সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ এই সনাতন-শাস্ত্রসমূহে সকল রহস্য-উন্মোচনের এরূপ সূত্রসমূহ আছে—যাহা লইয়া গবেষণা চলিলে সমগ্র বিশ্ববাসী অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। স্বয়ং আইন্‌ষ্টাইন্‌জীও তাহা উদাত্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,—"সেই অপার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বিজ্ঞানীরা সঙ্কোচ বোধ করেন, পাছে লোকে ভাবে ইহা তাহার মোহ। অথচ এই অজ্ঞেয় সত্যের সন্ধানই শত সহস্র রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ রচনা করিতে পারে।" তজ্জন্যই

পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"**What India thinks today, whole world thinks tomorrow.**" সুতরাং ধর্ম্মের সহিত বিরোধিতা করিয়া কি লাভ, যেখানে আদৌ বিজ্ঞান, দর্শন বা কাহারও কোন বিরোধিতা নাই? ইহা সম্পূর্ণ কৃত্রিমরূপে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কিছু সহজ-সরল বৈজ্ঞানিককে, দার্শনিককে, সমাজপতিকে স্বাভাবিকভাবে ধার্ম্মিক হইতে দেখা যায়। ইহা কদাপি পরস্পর-বিরোধী কোন দৃশ্য নহে। কারণ, **Science ends in Philosophy**—বিজ্ঞানের পরিণতি দর্শনে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, আমাদের আরও কিছু বলিবার আছে। **Philosophy ends in Religion**—দর্শনের পরিপূর্ণতা সনাতন আত্ম-ধর্ম্মে।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর]

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

এর সবটাই বাস্তব সত্য—**It is in reality**। আমি বুঝি না, আমার মাথায় ঢোকে না, সুতরাং ওটা বাজে কথা, একথা বললে হবে না। বাস্তব চিরদিনই বাস্তব, আর অবাস্তব যেটা সেটা চিরদিনই অবাস্তব। সৎ-চিৎ-আনন্দময় বস্তু তিনি জড় নন; আর জড় সচ্চিদানন্দ বস্তু নন। এ সব বিচার ত' শাস্ত্রে দেখান আছে।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি অপরাধ। আবার প্রাকৃতে অপ্রাকৃত বুদ্ধিও অপরাধ। এ দুটো বিচার আছে পাশাপাশি। ভাগবতের শ্লোকে আছে,—

যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

আমি যদি সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জড়বস্তু বলি, তাহলে অপরাধ হয়; আবার জড়বস্তুকে যদি সচ্চিদানন্দ বলি, তাহলেও অপরাধ হয়। এ অপরাধের হাত থেকে রেহাই কোথায়? আমাকে তত্ত্বদর্শন শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাহলে আমি মোটামুটি বুঝতে পারব। আর সবথেকে বড় বুঝা যেটা সেটা হল গুরুকৃপা, ভগবৎকৃপা। তাছাড়া কিছু হবে না। ভগবান্ নিজেই বলেছেন গীতাতে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অর্জ্জুন তুমি আমাকে বুঝবে as it is। যদি বুঝতে হয় তাহলে আমার দেওয়া বুদ্ধি নাও। সেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার কর। নিজে বাহাদুরি করবে না কিছু।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত শিক্ষা ও জীবনী আলোচনা প্রতিবারই হয়। প্রতি বৎসরই তাঁর আবির্ভাব-তিথি এবং তিরোভাব-তিথি দুই-ই আমাদের কাছে উপস্থিত হন। গুরু-বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি আমাদের আত্ম-কল্যাণজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। তাঁদের অপ্রাকৃত পূত জীবনী ও শিক্ষা আমাদিগকে সাধন-ভজনে অতি উন্নতস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিদিনই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন হওয়া প্রয়োজন। গুরু-বৈষ্ণবগণের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করলে আমাদের পারমার্থিক কল্যাণ লাভ হয়।—

হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥

সুতরাং সাধন-ভজনে প্রয়াসী ব্যক্তিগণের নিত্য প্রাত্যহিক কৃত্য হিসাবে এগুলো মেনে নিতে হবে।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হয়েছে। এটী হল চতুর্থ মাস—কার্ত্তিক। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন তিনটে মাস আমাদের কেটে গেছে। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক-ব্রত আলোচনা করছি। কার্ত্তিক-ব্রতের অপর নাম দামোদর-ব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা। এই মাসে ভগবানের প্রীতিবিধান করলে—ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করলে ভগবান্ বিশেষ খুশী হন। এই মাস দামোদর-কৃষ্ণের ভীষণ প্রিয় মাস এবং শ্রীজী—রাধাদেবীরও বিশেষ প্রিয় মাস। শাস্ত্রে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের মধ্যে 'উর্জ্জাদর'

একটী কথা লেখা আছে। চৌষট্টী প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। ভগবানকে চৌষট্টী রকমে ভালবাসা যায়—যার নাম ভক্ত্যঙ্গ। তার মধ্যে একটা আছে 'উর্জ্জাদর'। যেহেতু 'উর্জ্জাদর' লেখা আছে, সেইজন্য অনেক সুবিধাবাদী ভক্ত তাঁরা উর্জ্জাদরের 'পরে জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের যে বিধান আছে শাস্ত্রে, সেটাকে প্রায় একরকম উপেক্ষা করা হয়।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ, গোস্বামিগণ এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেছেন বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ। বর্ত্তমানে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত প্রায় একরকম উঠে গেছে। সকলেই কার্ত্তিক-ব্রত পালন করে থাকেন। তাতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ফললাভ করার চেষ্টা করে থাকেন। দেখা যায়, আমাদের পূর্ব্ব মহাজন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—যিনি রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে এ জগতে প্রকটিত হয়েছিলেন, ত্রিলোক-গুরু, অখিল লোকশিক্ষকরূপে জগতে যিনি সাধন-ভজন নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন। স্বয়ং ভগবান্ নিজে হাতে শিক্ষা না দিলে আমরা শিক্ষাটা মানতে পারি না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন,—"উৎসীদেয়ুরীমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।" অর্জ্জুন! আমি নিজে স্বয়ং মালিক হয়েও কষ্টকর পরিশ্রম কেন করছি জান?—যদি আমি এই কষ্টকর পরিশ্রম না করি, তাহলে লোকে কেউ কিছু করবে না। সেজন্য আমি মূল-মালিক হয়েও আমাকে এ কষ্ট স্বীকার করেও জগৎকে শিক্ষা দিতে হচ্ছে। আবার একথাও তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলেছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা আচরণ করেন, অনুশীলন করেন, যা শিক্ষা দেন, পরবর্ত্তী যাঁরা সাধক আছেন তাঁরা সেটার সবটাই মেনে নেন, সেটারই অনুবর্ত্তন করেন। সেজন্যও আমাকে এ কষ্টকর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ত' অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন। "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।"—সেই মূর্ত্তিতে তিনি এসেছেন। তাঁর আগমন-বার্ত্তা শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় সুন্দরভাবে বুঝানো আছে। তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা আছে। শ্রীল নরহরি ঠাকুর একটা শ্লোক রচনা করে তাঁর আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন।—

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তান্ সমজনি কৃপাসিন্ধুশ্চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ধিগিতি ব্যহরৎ কিং মৃদঙ্গঃ॥

মৃদঙ্গে যে খোলের বোল আছে সেই বোলের মধ্যে এই কথাটা বলা হচ্ছে।

কি ?—তার জীবনে ধিক্, তার জীবনে ধিক্ ; ধিক্ তান্ 'ধিক্ তান্' বোলের মধ্যে। সেই পরম করুণাময় ভগবান্ যে কৃষ্ণচন্দ্র তিনিই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে শচীগর্ভ-সিন্ধু-মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন কলিজীবের অশেষ দুর্দ্দশা দেখে। 'পাপাসক্তান্ সমজনি কৃষ্ণশ্চৈতন্যমূর্ত্তিঃ ' তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের কল্যাণের জন্য। এহেন যে ভগবান্ তাঁতে যদি কারও ভগবৎ-বুদ্ধি না হয়, কৃষ্ণবুদ্ধি না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি শোচ্য, শোচ্যতর, শোচ্যতম। তাঁকে যদি কেউ সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করেন, তাহলে জগতের অকল্যাণ—কথাটা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই জগদ্‌গুরু লীলাভিনয়কারী ভগবান্ জগৎকে কিভাবে সাধন-ভজন করতে হবে, কিভাবে ভগবানকে পেতে হবে, কেমন আকুলতা-ব্যাকুলতার প্রয়োজন তা শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেছেন দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গমে গিয়ে। পরবর্ত্তিকালে তাঁর পার্ষদগণ সেই নীতি-আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। সকলের শেষের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায়, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী —এঁরা সবাই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করেছেন, ঊর্জ্জব্রতও পালন করেছেন সুন্দরভাবে। কিন্তু এখন আমরা কিছুটা ফাঁকিবাজীর মধ্যে পড়ে গেছি। বাজারটা কিছু সস্তা করে নিচ্ছি। কষ্ট স্বীকার করার প্রবণতা, ধৈর্য্য, উৎসাহ আমাদের নাই। সেইজন্য চাতুর্ম্মাস্যকে প্রায় বাদ দিয়ে এসে পড়েছি সীমিত কার্ত্তিক-ব্রতের মধ্যে। কিন্তু আমাদের পূর্ণাঙ্গ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের সবটাই করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন প্রথম মঠ-মিশন গঠন করেন, সেই সময় আইনের কিছুটা শিথিলতা ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে পুরো আইনটা চালু হয়েছে। ব্রতোৎসবাদি বিধি-নিষেধের যে-সব স্মৃতিগ্রন্থ রয়েছে—নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—এগুলো ত' তখনও চালু ছিল। তাতে উপবাসের তালিকা দেওয়া আছে, উপবাস হত। এখন অনেকে বলছেন,—প্রভুপাদের সময় যখন এরূপ কড়াকড়ি কিছু ছিল না, সুতরাং এটা আমরা করব না, বা না করলেও চলে। এমন কথাগুলো বর্ত্তমানে এসেছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমরা ত' সবসময় ফাঁক খুঁজছি, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় আছি। আর ভিতরে যদি কোন ফাঁকি দেওয়ার যুক্তি বা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে গেলাম, তাহলে আর আমাদের রাখে কে বা ধরে কে ? বর্ত্তমান পরিবেশ এমন হয়েছে।

আমাদের গৌড়ীয় মঠেরই বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন শাখায়—যাঁরা পৃথক্ পৃথক্ মঠ-মিশন করে বসেছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখা যাবে, তাঁরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

করছেন না। কোনরকমে উর্জ্জব্রত—কার্ত্তিক মাসটা পালন করেন। কিন্তু গুরুবর্গ যা করেছেন তাতে আপত্তি কি হচ্ছে? তার ত' নজির রয়েছে, প্রমাণ রয়েছে। সেখানে ফাঁকি দিলে লাভ কি হবে? সব সস্তার বাজার করে নেওয়া হচ্ছে কেন? আজ এমন অবস্থা হয়েছে এই গৌড়ীয় মঠেরই বিভিন্ন শাখায় বহু প্রয়োজনীয় উপবাসাদি বর্জ্জন করা হয়েছে। আপনারা শুনলে অবাক্ হবেন না, আমার কাছে খবর আছে, অনেকে আজকাল রামনবমী, নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-তিথি মাকরী-সপ্তমী, বলদেব-পূর্ণিমা প্রভৃতি উপবাসমুখে পালন করেন না। এরকম আরও অনেক কিছু আছে। একদিকে উপবাস কমিয়ে দেওয়া হল, আর একদিকে বহর বেড়েছে। যেখানে উপবাসের দরকার নাই সেখানে উপবাসের ব্যবস্থা। শিবঠাকুরের আবির্ভাবের দিনে—শিবচতুর্দ্দশীর দিনে উপবাস না করলেও হয়। তবে যদি কেউ করেন সেজন্য হয়ত' সেখানে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া হল, আর তৎপরদিবস পারণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে উপবাস বেড়ে যাচ্ছে। কোন শক্তিজাতীয় তত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাসের ব্যবস্থা নাই। কেউ কেউ ব্যবস্থা দিচ্ছেন, করছেন। তাহলে যেগুলো প্রয়োজনীয় ব্যাপার সেগুলোকে বাদ দিয়ে অল্প প্রয়োজনীয়, না করলেও চলে, সেগুলো করার অর্থ কি? এগুলো বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। রামনবমীকে বাদ দিচ্ছেন কেউ কেউ, তার পিছনে যুক্তি কি?—রামচন্দ্র পূর্ণ অবতার নন। সেইজন্য রামনবমী-তিথি পালন না করলে চলবে। কয়েক বৎসর এক মঠে রামনবমী-তিথিতে উপবাস করা হল না, এইরকম ধরণের খামখেয়ালিপনা চলছে আজকাল। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'—এইটাই যদি আইন হয়, তাহলে ওটা আমরা ছাড়ছি কেন? ছাড়তে যাচ্ছি কেন? আবার নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করছি বা কেন? এগুলো আমাদের হিসাব-নিকাশ করা দরকার। পুরানোটাকে যদি ধরে রাখার প্রয়োজন আছে, তার পিছনে যদি যুক্তি—তত্ত্বসিদ্ধান্ত আছে, তাহলে তা করতে হবে। কিন্তু যে জিনিষ বিশেষ প্রয়োজন যে ব্রত-উপবাসের ব্যবস্থা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দিলেন, সেই জিনিষটা আমরা ছাড়তে যাচ্ছি কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনার জন্য সূত্র দিলেন শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে,—"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-দ্বাদশী। রাম-নবমী আর নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী॥" প্রভৃতিতে বিদ্ধাত্যাগ, অবিদ্ধাকরণ এসব ব্যবস্থা দেবে তুমি বলেছেন। List এর মধ্যে enlisted এটা। সেগুলো কি করে বাদ দিচ্ছি আমরা? তাহলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশ-নির্দ্দেশ কতটুকু মানছি আমরা উপরওয়ালা গোস্বামী গুরুবর্গের কথা কতটুকু শুনছি, পালন করছি

আমরা। এগুলো চিন্তা করার অবসর নাই কি? এ বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা দরকার। শুধু উর্জ্জাদর করলে হবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ীয়-গুরুবর্গ, মহাজনগণ, গোস্বামিগণ ত' পথ দেখিয়ে গেছেন।—

মহাজ্ঞানী, মহাজন,　　যে পথে করেছেন গমন,
সেই পথ প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে,　　স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়॥

—যদি একথা ঠিক, তাহলে মহাজন-স্বীকৃত পথ ছাড়ছি কেন? আবার নূতন নূতন জিনিষ **Take up** করছি কেন, যেটা অপ্রয়োজনীয়? দরকার কি? এসব জিনিষগুলো বিচার করা দরকার।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের চতুর্থমাস পড়ছে আজ। আজ থেকে উর্জ্জব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হচ্ছে। দামোদর-ব্রতে বিশেষভাবে কিছু বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হয়েছে, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের থেকে আরও কিছু কঠোরতা রয়েছে। সেটুকু আমরা আলোচনা করব। আর এই ব্রতকালে শ্রীসত্যব্রত-মুনি-রচিত যে "শ্রীদামোদরাষ্টকম্" এটা প্রত্যহ কীর্ত্তন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে, আলোচনা করতে হবে—এটা বিশেষ বিধি। কিছু জিনিষ বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, আর কিছু জিনিষ বেশী অনুশীলন করতে হবে। অন্যদিনে যতটা হরিনাম করি, তার থেকে বেশী করে নাম করতে হবে। অন্যদিনে যতটুকু গ্রন্থ আলোচনা করার সুযোগ হয়, তার থেকে বেশী করে গ্রন্থ আলোচনা করতে হবে। অন্য সময়ে যতটা সেবাকাজ করি—শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, অর্চ্চনাদি ইত্যাদি করি, আরও বেশী ভাল করে করতে হবে। অন্যসময়ে হরিকথা শ্রবণের যতটা সুযোগ পাই, তার থেকে বেশী সুযোগ নিতে হবে হরিকথা শ্রবণের। এসব কথাগুলো লেখা আছে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত করি আর উর্জ্জব্রত করি বাড়ীতে থেকে করা দায়ঠেকা গোছের। কোন তীর্থে বা কোন ধামে গিয়ে এই ব্রত করতে হবে —শাস্ত্রে এই নির্দ্দেশ আছে।

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥

শিবঠাকুর শিবানীকে বলছেন,—তীর্থে গিয়ে, ধামে গিয়ে কার্ত্তিক-ব্রত পালন কর। তাহলে অধিক বৈশিষ্ট্য আছে কথাটার। তীর্থে গিয়ে, ধামে গিয়ে ব্রত-উদ্‌যাপন করা কথাটা বুঝতে হবে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ষোড়শ বিলাসে বলছেন,—

অথ কার্ত্তিককৃত্যম্—

দামোদরং প্রপদ্যেঽহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্।
প্রভাবাদ্‌যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ সেবিতো ভবেৎ॥

কার্ত্তিককৃত্য সম্বন্ধে বলছেন,—আমি রাধারমণ প্রভু দামোদরের শরণাপন্ন হই, তাঁর প্রভাবহেতু তদীয় প্রিয়তম কার্ত্তিকমাস পরিসেবিত হবেন। স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে কার্ত্তিককৃত্যাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি আমি একত্র সার সংগ্রহ করে এস্থানে লিখছি। বৈষ্ণবব্যক্তি বিশেষ করে এই কার্ত্তিকমাসে নিত্য দামোদরের অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান, ব্রত প্রভৃতি কার্য্যসমুদয় অনুষ্ঠান করবেন। দিন-বিশেষে যে ভগবৎপূজনাদি করতে হবে, অগ্রে লেখ্য বিশেষ বিধিদ্বারা তা বিবেচনা করবে। কার্ত্তিকব্রতের নিত্যতা—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বলছেন,—হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়ে কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্মাচরণ না করে, সে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ হত্যার নিমিত্ত পাপে পাতকী হয়। কোন নিয়মধারণ না করে, যে ব্যক্তি দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক মাস ক্ষেপণ করে সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হয়ে তির্য্যক্ যোনি লাভ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে নর কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করে তাকে ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানিবে। হে মুনিশার্দূল! বিশেষ করে বিধবা যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তবে সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হবে। গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহলে তার ইষ্টাপূর্ত্ত সমস্ত ক্রিয়া বিফল হবে এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করতে হবে। কার্ত্তিক-মাস উপস্থিত হলে যদি কোন ব্রাহ্মণ ব্রতপরাঙ্মুখ হন, তাহলে ইন্দ্রাদি দেবতাসকল তার প্রতি বিমুখ হন। হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে বহু বহু যাগ, শত শত শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তিনি উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন না! যতি, বিধবা, বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমী যদি কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবব্রত না করেন, তাহলে তারা নরকে পতিত হন। হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবব্রত না করল, তবে তার বেদপাঠ, পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে কি হবে? যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাবিধি যে পুণ্য উপার্জ্জন করেছে, সে যদি কার্ত্তিকব্রত না করে, তাহলে তার সেই সকল পুণ্য ভস্মীভূত হয়। যাহা দান করেছে, যাহা জপ করেছে, যে কিছু সমূহ তপস্যা করেছে, কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করলে তৎসমুদায়ই বিফলতা প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! কার্ত্তিক মাসে উত্তম বৈষ্ণবব্রত না করলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয়। হে মহামুনে! যাহারা কার্ত্তিক মাসে পবিত্র বৈষ্ণব নামক এই ব্রত করেন নাই, এই সংসারের মধ্যে সেইসকল মানুষকে পাপস্বরূপ বলে জানবে। এগুলো পরপর আলোচনা করা যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ১০ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ | ২৯ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৪০২, ইং ১৬/১২/৯৫ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডায় নমঃ

স্ব-দয়িত-গিরিকচ্ছে গব্য-দানার্থমুচ্চৈঃ
কপট-কলহ-কেলিং কুর্ব্বতোর্নব্যযূনোঃ।
নিজজন-কৃতদর্পৈঃ ফুল্লতো রীক্ষকেঽস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ॥ ১॥

নিজ-প্রিয় গোবর্দ্ধন-গিরির নিকটস্থ প্রদেশে গব্য-দানের নিমিত্ত যাঁহারা প্রচুর কপট-কেলিতে কলহ করিতেছেন এবং নিজজনের দর্পহেতু যাঁহারা আনন্দিত,

এতাদৃশ ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাহার দর্শনীয় হইতেছেন, সেই দান-নির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ১ ॥

নিভৃতমজনি-যস্মাদ্দান-নির্ব্বৃত্তিরস্মিন্
তত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াম্।
রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥ ২ ॥

নির্জ্জন-স্থানে দান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া দানসভাতে যে কুণ্ড "দান-নির্বর্ত্তন"—এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অরসিক ব্যক্তির নিকট অপ্রকাশিত ও বৃন্দাবনবাসী রসিকজনের একমাত্র বেদ্য, সেই দাননির্বর্ত্তন সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ২ ॥

অভিনব-মধুগন্ধোন্মত্ত-রোলম্বসংঘ-
ধ্বনি-ললিত-সরোজব্রাত-সৌরভ্য-শীতে।
নব-মধুর-খগালী-ক্ষ্বেলি-সঞ্চার-কম্রে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৩ ॥

অভিনব মধু-গন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-সমূহের গুঞ্জন-ধ্বনিদ্বারা যাহাতে মনোহর পদ্মসমূহ সৌরভ্য ও শীতল এবং যাহা নূতন মনোজ্ঞ পক্ষিশ্রেণীর কূজন-ক্রীড়াদ্বারা মনোহর, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ৩ ॥

হিম-কুসুম-সুবাস-স্ফার-পানীয়পূরে
রস-পরিলসদালী-শালিনোর্নব্যযূনোঃ।
অতুল-সলিল-খেলা-লব্ধ-সৌভাগ্য-ফুল্লে
সরসি ভবতি বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৪ ॥

যাহার জলসমূহ হিমবৎ শীতল ও পুষ্প-গন্ধযুক্ত এবং শৃঙ্গার-রসদ্বারা শোভমান সখীযুক্ত নব্য-যুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল সলিল-ক্রীড়া-লব্ধ সৌভাগ্যে যে অতিশয় প্রফুল্ল, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ৪ ॥

দর-বিকসিত-পুষ্পৈর্বাসিতান্তর্দিগন্তা
খগ-মধুপ-নিনাদৈর্মোদিত-প্রাণিজাতঃ।
পরিত উপরি যস্য স্ফারুহা ভান্তি তস্মিন্
সরসি ভবতি বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৫ ॥

ঈষৎ বিকসিত পুষ্পসমূহে যে বৃক্ষরাজি দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, এবং যাহাদিগের শাখাস্থিত খগ ও মধুপের নিনাদে প্রাণীসকল হৃষ্ট হইতেছে, তাদৃশ

তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণী যে সরোবরের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, সেই দাননির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৫ ॥

নিজ-নিজ-নবকুঞ্জে গুঞ্জি-রোলম্ব-পুঞ্জে
প্রণয়ি-নব-সখীভিঃ সংপ্রবেশ্য প্রিয়ৌ তৌ।
নিরুপম-নবরঙ্গস্তন্যতে যত্র তস্মিন্
সরসি ভবতি বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৬ ॥

যে কুণ্ডে প্রণয়ি-নব-সখিগণ নিজ নিজ ভ্রমর-গুঞ্জিত নবকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়া নিরুপম নবরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৬ ॥

স্ফটিক-সমমতুচ্ছং যস্য পানীয়মচ্ছং
খগ-নর-পশু-গোভিঃ সংপিবন্তীভিরুচ্চৈঃ।
নিজ-নিজ-গুণবৃদ্ধির্লভ্যতে দ্রাপমুষ্মিন্
সরসি ভবতি বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৭ ॥

খগ, নর, পশু ও গো-সকল যাহার স্ফটিক-তুল্য নির্ম্মল ও মনোজ্ঞ জল সমধিক পান করিয়া শীঘ্র নিজ নিজ গুণে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৭ ॥

সুরভি-মধুর-শীতং যৎ পয়ঃ প্রত্যহ তাঃ
সখিগণ-পরিবীতো ব্যাহরন্ পায়য়ন্ গাঃ।
স্বয়মথ পিবতি শ্রীগোপচন্দ্রোঽপি তস্মিন্
সরসি ভবতি বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৮ ॥

গোপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কথোপকথন করিতে করিতে যাহার সুগন্ধ, সুমধুর ও শীতল জল প্রত্যহ প্রসিদ্ধ গো-সকলকে পান করাইয়া আপনিও পান করেন, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৮ ॥

পঠতি সুমতিরেতদ্দান-নির্বর্ত্তনাখ্যং
প্রথিত-মহিম-কুণ্ডস্যাষ্টকং যো যতাত্মা।
স চ নিয়ত-নিবাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে
কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দান-লীলাম্ ॥ ৯ ॥

যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুবিখ্যাত মাহাত্ম্যশালী কুণ্ডের এই "দান-নির্বর্ত্তন"-নামক অষ্টক পাঠ করেন, তিনি উক্ত কুণ্ড-তীরে সুষ্ঠুভাবে নিয়ত বাস লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা দর্শনের অধিকারী হন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর]

১৯। 'বৈরাগ্য' কি ভক্তির অঙ্গবিশেষ ?

"যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে ; কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহার সহগামিনী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না।"

—তঃ সূঃ, ৩৩ সূ

২০। হরিসেবা ও কর্ম্মে পার্থক্য কি ?

"বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক-কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই কর্ম্ম ; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়।"

—'অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

২১। হরিনামের সেবা অপেক্ষা কি কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ নহে ?

"নামরসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ—অন্ধকূপ-সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অণুক্ষণ নাম-ভজন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

২২। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ কি ?

"ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তি হয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতীত পরব্যোমনাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ-জ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবলা প্রেমই দেখা যায়।"

—তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

২৩। কিরূপে 'বৈষ্ণব' হওয়া যায় ?

"বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

২৪। কোন্ স্বরূপ-লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ?

"ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

২৫। নাম-সাধন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গগুলি কিরূপভাবে স্বীকৃত হইবে ?

"হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবল-মাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

২৬। সাধনাঙ্গ-সমূহ একমাত্র মূল কোন্ সাধনের সহায় ?

"হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়স্বরূপে গৃহীত হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। ঐকান্তিকী হরিভক্তির দ্বারা কি অন্যান্য দেবতার প্রতি অনাদর হয় ?

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল,　　শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র,　　সর্ব্বদেব বন্ধু তা'র,
ভক্তে সবে করেন আদর॥"

—'উপদেশ' ৪, কঃ কঃ

২৮। একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম অনিত্য কেন ?

"হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পরমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি-অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধিসুখ-বাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্ম ভক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম-ধর্ম্মও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে

তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে ; বিকৃতি-স্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩০। সর্ব্ব-কৈতব-নির্ম্মুক্ত একমাত্র ধর্ম্ম কি ?

"জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বলপূর্ব্বক বিচার করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতবপূর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতবশূন্য। **কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না।**"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

৩১। 'দৈন্য' ও 'দয়া'—এই দুইটী কি ভক্তি হইতে পৃথক্ ?

"দৈন্য' ও 'দয়া—এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়,—ভক্তিরই অন্তর্গত।"

— জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩২। ভক্তি কি অপেক্ষাযুক্তা ?

"ভক্তি নিরপেক্ষা—ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্‌গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩৩। ভক্তি-সাধন কি খুব কঠিন বা কৃচ্ছ্রসাধ্য ?

"সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ-তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, উভয়ই দৃষ্ট হইল।"

—তঃ সূঃ, ৫০ সূঃ

৩৪। কৃষ্ণভজনে কি কোন অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে ?

কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহারদ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়।"

—তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

৩৫। ভক্তির ফল কি মুক্তি নহে ?

"মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই

ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না।"　　—চৈঃ শিঃ ৫।১

৩৬। ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্য কি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে না?

"জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া, তৎপ্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা।"

—শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৪

৩৭। হরিভক্তি কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত রাখেন?

"হরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না।"

—জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবান্‌ও পূজা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়। গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না, আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর হইতে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হইবে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষ বিশেষে গুরুতত্ত্বদর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্ত-গুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তাহা হইলে আমি বহুদিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ আচার-প্রচার ধরিতে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরুবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে

গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হইতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমরবস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ বলিয়া কোন জিনিষই নাই আমাদের। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়; মুহূর্ত্তের জন্যও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া লবমাত্রও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া না দিই—অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনিয়া যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত না হই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচারপ্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—এটী শরণাগতের লক্ষণ। আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। সকল মঙ্গলের আলয়স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁহার করিয়া অর্পণ করিয়াছেন, আমি যদি তাঁহার নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে অন্য কাহারও কথা শুনিবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কাহারও কাছে যাইতে হয় না, তিনি সদ্‌গুরু। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক করিয়া আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করাইয়া দেন এবং আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার শক্তিসঞ্চার করেন; এমন যে পরমা শক্তি, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

———

আচার্য্য শঙ্কর এবং রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যের পার্থক্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

কলিযুগে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ভবিষ্য-বাণী পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অথ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবকাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

মন্ত্রাদি ও সিদ্ধান্ত বা বিচারধারা সম্প্রদায়ানুগত না হইলে, তদ্দ্বারা সফলতা-লাভ হয় না। সম্প্রদায়-পারম্পর্য্যে বর্ত্তমান না থাকিয়া সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্তের বহির্ভূত বা আনুগত্যবিহীন মতবাদ-প্রচারকের মন্ত্রাদি বিফল অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বকে লাভ করাইতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্য কলিকালে জগৎকে পবিত্র করিতে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক-নামক চারিটী সম্পদায় উৎপত্তিলাভ করিবে। শ্রী-সম্প্রদায়ের 'রামানুজ', ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের 'মধ্বাচার্য্য', রুদ্র-সম্প্রদায়ের 'বিষ্ণুস্বামী' এবং সনক-সম্প্রদায়ের 'নিম্বাদিত্য' মূল-আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইবেন। শাস্ত্রের এবম্প্রকার বাণী হইতে কোনও ভুঁইফোড় ব্যক্তির মন্ত্রাদিকে স্বীকার করিতে নিষেধ প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রদায়-শব্দের তাৎপর্য্য—যাহা সম্যক্ ও প্রকৃষ্টরূপে তত্ত্ব-বস্তুকে প্রদান করে বুঝায়; মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গোঁড়ামি করা বুঝায় না, সত্য-বিচারকেই সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার করা বুঝায়। সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই ফলদায়ক এবং মিথ্যার প্রতি নিষ্ঠা বা গোঁড়ামি বিফল ও গর্হণীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে উদারতা-জ্ঞানে আদর করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্ত তাহা বর্জ্জনীয়।

উল্লিখিত রামানুজাদি আচার্য্যগণ সনাতন বেদকে সত্য এবং ভক্তিই তাহার একমাত্র বা সম্যক্ উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা আচার্য শঙ্কর-কথিত বিবর্ত্ত-চিন্তা বেদের উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া তাঁহারা সকলেই আচার্য্য-শঙ্করের মতবাদকে বিখণ্ডিত করত স্ব-স্ব অনুভূত ভক্তিতত্ত্বকে উপদেশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের বিচারধারাই বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও পুরাণাদি-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। আচার্য্য-শঙ্কর 'লক্ষণা'-বৃত্তি অবলম্বন ও 'অভিধা'-বৃত্তি বর্জ্জন করত সমস্ত শাস্ত্রের আনুগত্যের ছলনায় বিরোধিতা করত নির্ব্বিশেষবাদ ও বিবর্ত্তবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের সকলেরই অভিমত। এই চারি বৈষ্ণব-আচার্য্য নিজ নিজ বিচারধারায় আপাতঃ কিছু ভিন্নতা ব্যক্ত করিলেও মূলতঃ সকলেই ভক্তি-নিষ্ঠ হওয়ায় শাস্ত্রসফলতা প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বেদের জ্ঞাতব্য বস্তু ব্রহ্মকে তাঁহারা যথার্থভাবে প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্যশঙ্করের ন্যায় কল্পিত ও অসত্যভাবে প্রচার করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের মত সার্থকতা প্রদান করে; আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় বিফলতা প্রদান করে না। ব্রহ্ম এক হইয়াও আনন্ত্যধর্ম্মযুক্ত, এবং আনন্ত্যধর্ম্মে যোগ্যতা বা সক্ষমতার বিচিত্রতা বর্ত্তমান থাকায় অনুশীলনকারীর অনুভবের বিচিত্রতা বা পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। এই বিচিত্রতা সত্য, মিথ্যা নহে। ইহাতে তরতমতা অপরিহার্য্য। এই কারণেই রামানুজাদি আচার্য্য গণের মতবাদে পরস্পর কিছু ভিন্নতা বর্ত্তমান। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তজ্জন্য আচার্য্যশঙ্কর-মতবাদের ন্যায় রামানুজাদি আচার্য্যচতুষ্টয়ের মতবাদকে খণ্ডন বা গর্হণ করেন নাই; পরন্তু তাঁহাদের প্রতি যথাযথ সম্মান করত পূর্ণতমভাবে বেদাদি শাস্ত্রের অভিমত প্রকাশদ্বারা পরম কল্যাণবিধান করিয়াছেন। তিনি শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় বা মতবাদকে স্বীকার করিয়াও তন্মতে যে অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান ছিল তাহা বিদূরিত করিয়াছেন মাত্র। ইহা কখনই গুর্ব্বজ্ঞা বা অন্যায় নহে; পরন্তু ইহা গুরুসেবা বলিয়াই আদরণীয়। তাঁহার এই বিচারধারাই "অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব"-নামে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত :—"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ"। অর্থাৎ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই বাক্যই সত্য; ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্বের সত্যতা নাই। পরন্তু সেই এক ব্রহ্ম বিশেষ-ধর্ম্মযুক্ত। অর্থাৎ তিনিই চিৎ, অচিৎ, সর্ব্ববিধ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বৈকুণ্ঠ, জীব ও মায়িক জগৎ—যাহা কিছু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত—সমস্তই ব্রহ্ম। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ইত্যাদি বেদবাক্যে যাহা প্রকাশিত, তাহা এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পরন্তু তাহা একত্বের হানিকর বা বিরোধাত্মক হয় না। তিনি মায়িক জগৎকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। শরীরী ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। জগৎকে ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি বলিয়া শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রকাশ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীমুখে গীতাতেও ইহা বলিয়াছেন।—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (১০।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অনুভব-বিচারেও ইহাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। —

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্॥ (ভাঃ ১১।২।২২)

শ্রীরামানুজাচার্য্য যদিও বস্তুপরিণামবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাহা শক্তি-পরিণামবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাঁহার এই অপ্রকাশিত ভাবকেই মধ্বাদি আচার্য্যগণ অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদাদি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত আচার্য্য শঙ্করের পরিণামাতঙ্করূপ মিথ্যা বিবর্ত্তবাদ নহে।

রুদ্র-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত—'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'-নামে বিখ্যাত। তিনিও অদ্বৈততত্ত্বের পক্ষপাতী। তবে তাঁহার অদ্বৈতবাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে ভিন্ন করিবার জন্য তাঁহার অদ্বৈতের সহিত 'শুদ্ধ' পদটীর যোজনা করিয়াছেন। এই 'শুদ্ধ' পদের যোজনদ্বারা তিনি নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করত সবিশেষ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম, জীব ও মায়া প্রভৃতি তত্ত্বের নিত্যত্ব ও সত্যত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মের আশ্রিততত্ত্ব বলিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে চিৎ ও অচিৎ সকল তত্ত্বের আশ্রয়-তত্ত্বকে বুঝিতে হইবে এবং সেই আশ্রয়তত্ত্ব এক এবং দ্বিতীয়হীন। তিনিই সচ্চিদানন্দ পূর্ণ বস্তু। জীব ব্রহ্মের আশ্রিত তত্ত্ব হইলেও অন্য আশ্রিত তত্ত্ব মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যাও বহু। মায়া ঈশ্বরবিমুখ ও ভোক্তাভিমানী জীবকে নিপীড়ন করত শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য "দ্বৈতবাদের" প্রবর্ত্তক। তাঁহার সম্প্রদায় তত্ত্ববাদী নামেও খ্যাত। তাঁহার দর্শনে দ্বিত্ব ও নানাত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উপনিষদ্বাক্যেও বহু নিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।" গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণবাক্যে জীবকে জন্মরহিত ও নিত্য বলা হইয়াছে। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরানো ন হন্যতে।" সুতরাং জীব ও ঈশ্বর এবং ঈশশক্তির নিত্যত্ব শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে অন্য মত হইতে অধিকতরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কারণেই কি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতকে অঙ্গীকার করিলেন?

উপনিষদের "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন যাতানি জীবন্তি…"বাক্যটী জীবাত্মার জন্মকে না বুঝাইয়া আবির্ভাব অর্থেই বুঝিতে হইবে। নতুবা গীতাবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। গীতায় উক্ত হইয়াছে—'জাতস্য হি ধ্রুবোর্মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' এতদ্দ্বারা জীবাত্মা জাত হইলে তাদের মৃত্যুও অনিবার্য্য হইতে বাধ্য।

একত্বের অভেদত্ব বিচারেও শ্রীল মধ্বাচার্য্য বিশেষ সচেতন। সে কারণে তিনি পঞ্চভেদের অবতারণাদ্বারা তাঁহার মতবাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চভেদ যথা ঃ—১। ঈশ্বরে-জীবে, ২। জীবে-জীবে, ৩। জীবে-জড়ে, ৪। ঈশ্বরে-জড়ে, ৫। জড়ে-জড়ে। জীবাত্মা ও মায়াশক্তি নিত্য হইলেও তাহারা স্বতন্ত্র নহে, ঈশতন্ত্রাধীন। মধ্বাচার্য্য "তত্ত্বমসি" বাক্যটিও স্বীকার করেন নাই। ইহাতে ভেদত্বের হানি হয়। তিনি ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কুম্ভকার ও মৃত্তিকা উভয়েই ঘটের উপাদান হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মকে জীবাত্মার উৎপত্তির কারণ বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাতে জীবাত্মার নিত্যত্বের হানি হইবে। এ বিষয়ে চিন্তামণির দৃষ্টান্তের সার্থকতা শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অচিন্ত্য' পদযোজনাদ্বারা সঙ্গতি বিধান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বাৎসল্য পর্য্যন্ত উপদেশ করায় স্বীয়মতের পূর্ণতা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার মতের এই অপূর্ণতা বিদূরিত করিয়া "মহাভাব" আস্বাদনমুখে প্রকাশ করত মধ্বমতের সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। ইহাকে আনুগত্যহীনতা বিবেচনা করা অন্যায়, ইহাই প্রকৃত উর্দ্ধতনের সেবা।

সনক-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত—"ভেদাভেদবাদ"। শ্রীরামানুজের অদ্বৈতনিষ্ঠা ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতনিষ্ঠা যুগপৎভাবে নিত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া ব্রহ্ম 'বাস্তব ভেদাভেদধর্ম্মযুক্ত।' শ্রীনিম্বাদিত্য রমাকান্ত শ্রীপুরুষোত্তমকেই ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীরাধাতত্ত্বের মাহাত্ম্য ও বিলাস ব্যক্ত করেন নাই। এজন্য তাহার মতও অসম্পূর্ণ। জীব—পরমাত্মার অংশ এবং জীব ও পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ বর্ত্তমান। জীব চিদ্বস্তু হইলেও অণু ও অনন্ত এবং মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত ভেদে দুই প্রকার। জগৎ ব্রহ্মের শক্তির পরিণাম এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শক্তিরূপে নিত্যত্বে বর্ত্তমান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত—"অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীনিম্বাদিত্যের ভেদাভেদে যাহা পরিব্যক্ত নাই তাহারও প্রকাশ ও বর্ণনাদ্বারা তত্ত্বদর্শনের পরিপূর্ণত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পরন্তু বদ্ধজীবের এই যুগপৎ ভেদাভেদ চিন্তাতীত বিধায় তাঁহার দর্শনের নাম—"অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্যের দর্শন পূর্ণতা প্রকাশ করে নাই। তাঁহারা কেহই শ্রীরাধাতত্ত্বের মহিমা প্রকাশ না করায় তাঁহাদের মতবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত। শ্রীমন্নিম্বাদিত্যাচার্য্য যদিও স্বকীয় পুষ্টিমার্গে দ্বারকালীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি শ্রীরাধার মহিমা বা মাহাত্ম্য প্রকাশে পরাঙ্মুখতা হেতু তাঁহার তত্ত্ববাদ অসম্পূর্ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীরাধাশক্তির পরিপূর্ণ বিলাস সম্যক্ ও সুষ্ঠুরূপে আস্বাদন ও প্রচারণদ্বারা তাঁহার

সিদ্ধান্তকে "অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব" নামে আখ্যায়িত করিয়া সিদ্ধান্ত-জগতের শীর্ষস্থানে দেদীপ্যমান। ব্রজের প্রেমবিলাসই পারকীয় মধুর রসাত্মক বিপ্রলম্ভ মহাভাব—যাবতীয় তত্ত্বদর্শনের পরাকাষ্ঠা।—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ

শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্য-যুগীয় মূলপুরুষ, তাঁহার সদ্‌বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'মাধ্ব' বলিয়া বিচার করেন। শ্রীমাধ্বগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধ্ব-আচার্য্যকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ সকলেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর কুলজাত পরিচয়ে যাঁহাদের শরীর লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দৈন্য-পরিচয়ে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। মূঢ় অর্ব্বাচীন জনগণ কোন কোন পরমহংস গৌড়ীয়াচার্য্যকে সংস্কার-গ্রহণে বিরত দেখিলেও, অপরাধ পরিত্যাগ করিলে তাহারা জানিতে পারিবে যে, গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ ব্রাহ্মণোত্তম। অদৈব-বর্ণাশ্রমবিচারে মূর্খ, অজ্ঞ, অশাস্ত্রীয়গণের ধারণা তাঁহাদের চরণে অপরাধ করায় বলিয়া হরিহোড়, ঠাকুর রঘুনন্দনের অধস্তনগণ ও শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দ-বংশে তাৎকালিকভাবে সংস্কারের পদ্ধতি চিরদিন প্রচলিত আছে এবং পাঞ্চরাত্রিকী সাত্বতদীক্ষায় ইহ-প্রাকট্যেই সংস্কার-বিধি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় অসংস্কৃত থাকিবার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত হওয়া দৈন্যের পরিচয় মাত্র। সমাবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবার পর ভগবান্ বিষ্ণুর মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের বারাহী দীক্ষা, নারসিংহী দীক্ষা ও রামানন্দী দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার-পদ্ধতি-অনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে বিচক্ষণ কোবিদ্‌গণ-কর্ত্তৃক বিপ্রাখ্যায় কথিত হন। ব্রাহ্মণাখ্যা সাধারণ লৌকিক-

বিচারে ও বর্ণবিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে,—এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি উত্থাপিত হওয়া উচিত নহে।

অনচ্যুত-গোত্রিয় ঋষিকুল বা বৈষ্ণব-গৃহস্থ-সমাজ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিচারমতে চিরদিনই জগতের অক্ষিতে ও ভাষায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত আছেন। কাল-প্রভাবে কুশিক্ষার তাড়নায় কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবনিন্দকগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রাগ্‌বর্ণের পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবনিন্দকগণকে বৈষ্ণবাপরাধী করা হয়। উহাদিগকে অপরাধ-পঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য গৃহীত-সংস্কার ঋষিকুল দৈন্যসূচক সংস্কারাদি গ্রহণ করেন। মূর্খ ও অর্ব্বাচীনের মধ্যে গৃহস্থ-জীবনের সংস্কার ত্যাগ করাও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উহারা বৈষ্ণব-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার স্বভাব লাভ করিয়াছেন; তাহা দৈন্য নহে, শাস্ত্র ও গুরুদ্রোহ মাত্র। পরমহংসাধিকারে সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া পরমহংসেতর অবস্থায় উহার প্রয়োজনীয়তা নাই—এরূপ বিচার মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার অন্তর্গত। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুব বলিয়া অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়াই জানিতে হইবে।

অদৈব বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধসমূহ দৈব-বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের সহিত সমতা-প্রয়াসী জনগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে অশিক্ষিত-পর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্য। দৈব বর্ণাশ্রম-বিচারটী পার্থিব রাজ্য হইতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে অথবা অমর-পুরীতে দেশান্তর লাভ করাইলে জগতে রজস্তমোগুণের প্রাধান্যই সাত্বত বিচারকে বিপন্ন করাইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা গুরুদ্রোহ করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কখনও বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে। এজন্যই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

বিষ্ণুভক্তিরহিত পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদী সেবক-সম্প্রদায় আপনাদিগকে বিপ্রকুলজাত বলিয়া বিচার করিতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য; কিন্তু যামল-পঞ্চরাত্র বলেন,—কলিকালে ব্রাহ্মণব্রুবগণের সর্ব্ববাদিসম্মত ব্রাহ্মণতা নাই, উহাতে বিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিধানমতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবিচারিত বিধান অভক্তকুলে যে-প্রকার স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে সংরক্ষণ করা পরম প্রয়োজনীয়। এইহেতু 'হরিভক্তিবিলাস' ৫ম বিলাসের প্রারম্ভে যামলবচন উদ্ধার করিয়া কর্ণাট-বিপ্রকুলেন্দ্র শ্রীমধ্বান্বয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও আন্ধ্র-বিপ্রকুলতিলক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সঙ্কলন-কালে এই বিচারের আবাহন করিয়াছেন,

উহা বৈষ্ণবস্মৃতি-পাঠকগণের বা পঞ্চরাত্রাচার্য্যগণের প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত। নারদপঞ্চরাত্রে যে-প্রকার বিধান কথিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বা মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ চিরদিনই পালন করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে আক্রীড়-ভূমিকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর ন্যূনাধিক লোপ পাওয়ায় কেবল বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী ও শাস্ত্রের একদেশদর্শী সমাজ বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া মুষ্টিমেয় শুদ্ধমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রপঞ্চে স্বধর্ম্ম-পালনবিধির আদর শিক্ষা দিতেছেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান-নাশের জন্য বিষ্ণুভক্তির প্রসার-কামনা তাঁহাদের আচার্য্য ও শাস্ত্র-সেবার অন্যতমতা লাভ করিতেছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণের বিচারে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতে পৃথক্ হইবার জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিদ্ধ গৌড়ীয় ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের নিজ পবিত্রতাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিতেছেন।

অদৈব-বর্ণধর্ম্মাশ্রিত বিচারাবলম্বনে যে-সকল চিন্তাস্রোত বৈষ্ণব-স্মৃতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, সেই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ শাঙ্কর-মতান্তর্গত পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুভক্তির চিরদিনই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদীয় কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রাদি সংস্কারের কথা বলিয়া পাঞ্চরাত্রিক পঞ্চসংস্কারের যোগে পঞ্চদশ সংস্কারে সুষ্ঠু ব্রাহ্মণতার স্থাপন করিয়াছে, আর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে 'তত্ত্বসাগর' প্রভৃতি স্মৃতি-নিবন্ধ, যাহা অভক্ত স্মার্ত্তাগ্রণীগণের দ্বারা পরমাদৃত হইয়াছে, উহার বিধান ও বৈষ্ণব-স্মৃতি হরি-ভক্তিবিলাসে স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজগণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু-শিলাবতারের – যাঁহাকে গণ্ডকী ও গোমতী শিলা বলে, তাঁহার সেবা করিবার অধিকার একমাত্র বিষ্ণুমন্ত্রে-দীক্ষিত সাত্বত-সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তি-মাত্রেরই আছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণ ইঁহাদের সহিত মতভেদ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্কলিত ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস তত্ত্বসাগরোদ্ধৃত বচনানুসারে যে-কালে বৈধসংস্কার-সমূহ গৌড়ীয়গণের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার অব্যবহিত ৫০ বৎসর পরে গৌড়ীয়-গগনে প্রবল ঝটিকায় অনেকস্থলে ভক্তিবিচার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কমলাকর-লিখিত 'নির্ণয়সিন্ধু' যদিও হরিভক্তি-বিলাসের সম-সাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়া পাশ্চাত্ত্যদেশে অভক্তির কথা সংরক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাশ্চাত্ত্য দেশ-প্রচলিত কমলাকর-সঙ্কলিত পদ্ধতিকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা প্রাকৃতস্মৃতি বলিয়া অনাচার শিক্ষাদান ও মূঢ়বিমোহনের পদ্ধতি বলায় দৈব ও অদৈব বিচারে পার্থক্য তৎকালাবধি চলিয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশেও শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তদনুগত শান্তিপুরের রাধামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রচুর পরিমাণে ব্যাঘাত করিয়াছেন। ইহারা ব্যাঘাত করিয়াও ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতা একেবারে নষ্ট করিতে পারেন নাই। তবে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা বিষয়ে মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন। ঐ মতভেদের ফলে ভগবদ্ভক্তির প্রচার ভাগ্যহীন জনগণের মধ্যে যথাযথ কার্য্যকরী হয় নাই। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণতায় সংস্কার-গ্রহণে বিমুখতাবশতঃ গৃহীতমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাধিকার রহিত হওয়ায় —বিষ্ণুর সহিত অপর আধিকারিক দেবতাগণকে সমশ্রেণীতে স্থাপন প্রভৃতি অবিচার-সমূহ গ্রহণ করায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত ও চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুষ্ঠু বিচার-প্রণালী—ব্রহ্মসংহিতা ও পাঞ্চরাত্রিক বিচার-প্রণালী অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন না বলিয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে উদাসীন হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তজ্জন্যই পরবিদ্যাপীঠ ও পরবিদ্যার চর্চ্চা—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছিত বলিয়া বিদ্বদ্রূঢ়ির স্থান সর্ব্বোপরি। বৈকুণ্ঠ ও ক্ষণভঙ্গুর তদিতর লোকাদির পরস্পর বৈশিষ্ট্য রূঢ়িবৃত্তিতেই চিদ্বিলাস আবাহন করিয়াছে। সেই চৈতন্যচরিত সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার জন্যই পরবিদ্যাপীঠ।

যাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রচুর প্রণয় বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য গৌড়ীয়গণ সর্ব্বক্ষণ প্রচুর পরিমাণে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষামন্দির স্থাপন, শিক্ষকের দ্বারা সাধারণ লোকের নিকট প্রচার, পারমার্থিক বা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন ও সদ্গ্রন্থ প্রচার এবং শাস্ত্রসমূহের ভক্তিপর ও অভক্তিপর ব্যাখ্যাদি বিশ্লেষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাতে ভক্তিবিদ্বেষী ও সৎশিক্ষাবিরোধিগণ যতই আরক্তচক্ষু হউন না কেন, শিষ্ট শিক্ষক যেমন দুষ্ট বালকগণকে যেরূপেই হউক সর্ব্বদা সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, তদ্রূপ গৌড়ীয়গণও যেন সকলকে শিক্ষা দিতে পারেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কুশিক্ষারত জনগণ নানা অজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া মাধ্বগৌড়ীয়গণের প্রতি যতই অনাদর প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাদের কুবিচার আর কতদিন রক্ষা করিতে পারিবে, আমরা জানি না। আমাদের সহৃদয় প্রার্থনা—'গৌড়ীয়'-পত্র প্রত্যহ তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পঞ্চগৌড়ে ও পঞ্চদ্রাবিড়ে প্রচারিত হইবে। পঞ্চদ্রাবিড়ের অধিকাংশ লোকই বাঙ্গালা জানেন না। পঞ্চগৌড়ের চতুর্থ-পঞ্চমাংশ ব্যক্তিও বাঙ্গালা জানেন না। সুতরাং ইংরেজী, উর্দ্দু, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে বেদবেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য, শ্রৌত ও গৃহ্য

শাখাগণের প্রকৃত তাৎপর্য্য সুপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন কর্ণাট-বিপ্রদ্বয়কে, তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে, দাক্ষিণাত্য আন্ধ্রদ্বিজকে ও শ্রীদাস-গোস্বামী প্রভুকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তৎফলে তৎকালে প্রচার হইলেও কালধর্ম্মে লোকরুচি সেইসকল কথা আবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং নিখিল লোকমঙ্গলের জন্য উহা পুনরুজ্জীবিত হওয়া আবশ্যক।

স্মার্ত্তকুল ও সদ্ধর্ম্ম-বিরোধী ব্যক্তিগণের পাদপদ্মে পতিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যদি দৈন্যসহকারে জ্ঞাপন করা যায়, তাহা হইলে একেবারে সেইসকল কথায় বধির হইয়া থাকিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ লোক প্রীতির সহিত ভগবানের ভজন করিবেন। আমাদের ন্যায় লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই কনিষ্ঠাধিকারোচিত ও মধ্যমাধিকারোচিত বিষ্ণুভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হউক। তাহা হইলে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"—কথাটী বুঝিতে পারা যাইবে—ঢাকায় সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর অতি মূল্যবান্ উপদেশের মধ্যে প্রবেশাধিকার হইবে। নতুবা মায়ার বিকার দর্শককে ত্রিগুণতাড়িত করিয়া বিপথগামী করিবে। এ কথা প্রদর্শক শ্রীল প্রভুপাদের জগৎ জানিতে পারিয়াছেন। আংশিকদ্রষ্টৃগণ বহু অংশের সমাবেশে পরমাত্মার যে চিত্র হৃদয়ে অঙ্কন করেন, অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণ জাগতিক যাবতীয় বিষয়ের খণ্ডধর্ম্ম পরিহার করিয়া যে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন, ঐ নির্ব্বিশেষ চিৎসবিশেষ হইতে পৃথক্ মায়ার ক্রিয়া বলিয়া উহা মায়াবাদ-পদ্ধতিতেই অবস্থিত,—এ কথা ভগবদ্ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা পঞ্চোপাসকের পদ্ধতি-গ্রহণের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাসনার সম্মান করিতে গিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্যের অবশেষ-দ্বারাই বিষ্ণু-প্রেরিত আধিকারিক দেবগণকে বিষ্ণু-শক্তিগত পরিচয়ে বিষ্ণু-কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। কাত্যায়নীর পূজা ও সোমমৌলির পূজা বঙ্গদেশে প্রবল, তদ্ব্যতীত গণপতির পূজাও প্রচলিত আছে। তিরুবত্তর হইতে সংগৃহীত শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাদান পঞ্চমাধ্যায় ব্রহ্মসংহিতা সূর্য্য ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার ভগবদ্ভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিচারে পঞ্চোপাসকের অবিধিপূর্ব্বক সেবা পরিবর্ত্তিত হইয়া গুরু-জ্ঞানে আশ্রয়জাতীয় পূজায় দীক্ষিত হইতে পারিলে আমরা পুনরায় ভগবদ্ভক্তির পুনরাবাহন দেখিতে পাইব।

(সাঃ গৌঃ ১১শ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা)

সাধুসঙ্গই তীর্থভ্রমণের প্রকৃষ্ট ফল

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সংসারমরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

"যে চরণদ্বয় শ্রীহরির তীর্থে গমন করে, তাহা প্রশংসনীয়। যেহেতু তদ্দ্বারা সংসার-কূপ মরুভূমি উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসিতে পারে,— "কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মায়াবাদী, ইতর দেবযাজী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি সহজিয়াগণের এবং ভগবানের প্রিয়জন কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ত' তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলে কি দুষ্পার ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত শান্তির নিলয় ভগবদ্ধামে পৌঁছাইতে পারেন?" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতে হইলে আমাদের 'তীর্থ' সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। 'তীর্থ' শব্দটি 'তৃ' ধাতু (কর্ম্মবাচ্যে) 'থক্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃ' ধাতু 'তরণ' ও 'প্লবন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'তীর্থ' শব্দের 'প্লবন' ও 'তরণ' অর্থে "ভবসমুদ্রে পতিত কোন জীবের সন্তরণপূর্ব্বক ভবপারে পৌঁছানোকে" বুঝায়। বিজ্ঞানের ভাষায়, 'তরণ' বলিতে "increase of speed" কে বুঝায়। তীর্থভ্রমণের ফলে ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবা-লাভের লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যথার্থ তীর্থভ্রমণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নতুবা তীর্থভ্রমণের ফল ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া জীবনের পরিসমাপ্তিকে বুঝায় না। ধন, জন, জড় প্রতিষ্ঠাদির সংগ্রহার্থে পদযাত্রায় তীর্থ ভ্রমণাদি মহা অপরাধময়ী কার্য্য। আজকাল বিভিন্ন **Company super deluxe bus**-সহযোগে যাত্রী লইয়া তীর্থভ্রমণ, ধাম-ভ্রমণ তথা ভারত-ভ্রমণাদি করিয়া থাকেন, তাহা কেবলমাত্র ধন, জনাদি সংগ্রহের নিমিত্তই, সাধুসঙ্গ, সাধু-সন্ধান ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে নহে। এই জাতীয় তীর্থভ্রমণ প্রকৃতপক্ষে প্রমোদভ্রমণ ও জীবের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

'তীর্থ' বলিতে কেবল জড়-ভোগবিলাসীর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সফলতা সম্পাদনের স্থান নহে। প্রকৃতির আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তমের সন্ধান হইতে বিরত হইয়া প্রকৃতির সৃষ্টি সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ভোগ-বাসনায় উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ধাম বা তীর্থকে তাঁহারা জড়াপ্রকৃতির অন্তর্গত একটী বিশেষ স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। কর্ম্মী,

জ্ঞানী, তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে নিজেদের পাপমলিন চিত্ত ধৌত করিবার নিমিত্ত তীর্থে গমন করেন, তাহাও নিরর্থক। কারণ তীর্থদর্শন ও তীর্থ-স্নানের ফলে তাঁহাদের পাপ বিমুক্ত হয় সত্য, কিন্তু হৃদয় হইতে পাপ-বীজ ও পাপ-বাসনা কিছুতেই অপসৃত হয় না। তাই তাহারা পুনরায় পাপকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অনন্তকালের জন্য ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে থাকেন। এইরূপ ধরণের তীর্থ-স্নান, তথায় গমন, দর্শন ও মজ্জনকে শাস্ত্র কখনও তীর্থ-ভ্রমণের আখ্যা দেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, নাস্তিকাদির তীর্থভ্রমণ কেবল মনের ভ্রম ও পরিশ্রম মাত্র। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম,　　কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ ॥

সাধুগণের অনুগমনে তীর্থদর্শন আর কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির তীর্থদর্শন বাহ্যতঃ একই ধরণের পরিদৃষ্ট হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। শাস্ত্রে তীর্থভ্রমণের যে ব্যবস্থা—তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর হইলে তবেই জীবের মহামঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সাধুসঙ্গে নিজের মঙ্গলের কথা শ্রবণ ও আলোচনাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভক্তিসাধক কার্য্য। তীর্থ এমনই পবিত্র যে, তাহা সাধুসঙ্গে দর্শন করিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অথবা তথায় মজ্জন করিলে জীব মাত্রেই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া সেবকসূত্রে নিত্যকালের জন্য পরম করুণাময় ভগবানের চরণতলে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। সাধুগণ তীর্থপর্য্যটনস্থলে স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে তত্তৎকথা হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করত হরিকথার পীযূষধারা পান করাইয়া বিশেষ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করাইয়া থাকেন। যাত্রিগণ ভ্রমণ-কৌতূহলে অপ্রাকৃত জগতের কথা শ্রবণ করিতে অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন। আচার্য্যানুগমনে এতাদৃশ ভ্রমণের নামই সার্থক তীর্থভ্রমণ। হরিকথা-বর্জ্জিত স্থান কখনও তীর্থ হইতে পারে না। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উপদেশাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়,—"যেখানে হরিকথা, সেখানে তীর্থ।" প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে তীর্থভ্রমণ না করিলে জীবের হরিকথা শুনিবার সুসৌভাগ্য লাভ হয় না। 'প্রণয়ি-ভকত' বলিতে যিনি ভগবানের প্রীতিকামনা ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

গৌর আমার, যে-সব স্থান, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরব আমি, প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ॥ (শরণাগতি)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ও মনীষীবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নদ-নদী, গিরি-কান্তার, মরুভূমি, বন-উপবন-পরিপূর্ণ স্থান সমূহের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত যে-সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহাকে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ তীর্থ—তীর্থই, তীর্থ কখনও অতীর্থ হইতে পারে না। আবার অতীর্থকে তীর্থ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। মহাভাগবতগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপমলিন তীর্থকে তীর্থীভূত করিবার জন্য তীর্থভ্রমণের লীলাপ্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশামৃতের মধ্যে বলিয়াছেন,—ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলই তীর্থ। সুকৃতিমন্ত জনগণ ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবালাভের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পাপী লোকগণ পাপ-প্রবৃত্তি প্রবলা রেখে সাময়িক পাপ প্রক্ষালন ও জড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থগমন করে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপ-মলিন তীর্থকে তীর্থীভূত কর্‌বার জন্য তীর্থভ্রমণের লীলা করেন—স্বানুভাবানন্দে প্রভুসেবা-প্রমত্ত হ'য়ে বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান করে থাকেন।" আজকাল কোন নদীর তীরে বা কোন গভীর জঙ্গলের ভিতরে বা কোন পাহাড়ের উপরে অবস্থিত স্থানে জমজমাট মেলা বসিতে দেখা যায়। মেলা বসিবার স্থানটি নাকি কোন সিদ্ধ ফকিরের বা সিদ্ধ মহাত্মার স্বপ্নদৃষ্ট তীর্থস্থান। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত অতীর্থকে তীর্থ বলিয়া চালাইয়া দিয়া লোককে আকর্ষণপূর্ব্বক ধোকা দেওয়ার এ হেন পদ্ধতি মায়াবদ্ধ জীব ব্যতীত আর কাহার থাকিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১০।৮৪।১১) "জলময় স্থান হইলেই তীর্থ হয় না" বলিয়াছেন। শ্রীভাগবতের অন্যত্রও (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) "যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে···স এব গোখরঃ।" এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, "যিনি নদ্যাদিস্থিত জলকে তীর্থ বলিয়া মনে করেন, তিনি গো ও গর্দ্দভ পদবাচ্য অথবা গরুর তৃণাদি ভারবাহী গর্দ্দভ।"

ভাগবতগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ। ইহা ভাগবতের (ভাঃ ১।১৩।১০) "ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ" শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১)

উপরোক্ত পয়ারের অমৃতভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেই ছলে সাংসারিক জনকে নিস্তার করা, বৈষ্ণবের

এই একটী নিশ্চল স্বভাব।" জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাওয়া যায়,—"শ্রীভাগবতগণ গমন করিয়া তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী—সাংসারিক জনগণকে সেই তীর্থ গমনচ্ছলে উদ্ধার করেন—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্যস্বভাব।" তীর্থ পর্য্যটনের ফল যে কেবলমাত্র জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তি নহে, তাহা যে কেবল নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-সঙ্গ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুকৃপালাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ, ইহাই নিজ আচরণদ্বারা শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু জগজ্জীবগণকে জানাইয়া গিয়াছেন,—

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্রসহ হইল মিলন॥
নিত্যানন্দ বলে,—তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরও কর্ম্মকাণ্ডীয় গয়া-শ্রাদ্ধাদি নিরাসকল্পে গয়া-শ্রাদ্ধের ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক "গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন ও সাধুসঙ্গ" যে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের সম্যক্ ফল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।—

প্রভু বলে,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটিপিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

উপরোক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"গয়াতীর্থে যে-যে পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র সেই সেই পিতৃপুরুষই পিণ্ডপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ করেন। কিন্তু যে-সকল উর্দ্ধতন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষের নামাদি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, তাদৃশ কোটি-কোটি সংখ্যক পিতৃপুরুষগণ ঈশ্বরপুরীর ন্যায় কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর-দর্শকের দর্শন-জন্য সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয়-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ডপ্রদানের আবশ্যকতা থাকে না। যে মহাসুকৃতিশালী জীব ভগবানের নিজজনের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।"

ইহজগতে বিবর্ত্তবাদিগণ নিজেদের মাটিয়া শরীরকে যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া তীর্থভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁহারা বলেন,—"যাহা নাই এ দেহভাণ্ডে, তাহা নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।" বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকের কোনকালে মঙ্গল হয় না। কারণ তাঁহারা সাধুসঙ্গ না করিবার জন্যই তীর্থভ্রমণের প্রয়োজন নাই বলিয়া থাকেন। জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির তীর্থ-ভ্রমণলীলাদ্বারা জানা যায় যে, আচার্য্যানুগমনে তীর্থ-দর্শনদ্বারা শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী ধারা জীব-হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সাধুগণের অবস্থানস্থলই তীর্থ, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের চরম ফল। বৈষ্ণববর্জ্জিত তীর্থে ভ্রমণ করিয়া জীবের কোন শ্রেয়ঃলাভ হইতে পারে না। বৈষ্ণবসেবা করিয়া জীবন সার্থক করা প্রত্যেক জীবের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই বৈষ্ণব-ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির, তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেইস্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর]

স চ স্বভাবতো জ্ঞানী স্যান্ন কৃত্রিম-বোধবান্।
কিং চিত্রলিখিতং নেত্রং কঞ্চিদর্থং প্রপশ্যতি ॥ ৯২ ॥
অতো জড়স্য জীবত্বং জড়ো বক্তি ন পণ্ডিতঃ।
জীবস্তজ্জড়দেহান্যো মান্যো যং দেহিনং বিদুঃ ॥ ৯৩ ॥

(যুক্তিমল্লিকা, গুণসৌরভম্)

অর্থাৎ—"যদি তুমি দেহ ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না কর, তা'হলে বল দেখি—এই যে অবিকৃত শবদেহটি রয়েছে, এর মরণ হয়েছে, ইহা তুমি কিরূপে বলতে পার ? কারণ পূর্ব্বেও ইহার শরীরস্থ নেত্রাদি অবয়ব যেরূপ দেখেছি, সম্প্রতি অবিকল সেইরূপ বর্ত্তমান আছে।

অতএব ঐ শবদেহে বর্ত্তমানে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অসদ্ভাব হয়েছে, এরই নাম মৃত্যু—একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। অন্যথা তোমার মতে মৃত্যুরই মৃত্যু ঘটে থাকে অর্থাৎ মরণ বলে কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না।

তোমার মতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-নামে কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নেই, তাদৃশ অধিষ্ঠান জীবদ্দেহে ও মৃতদেহে সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। আত্মা ও অদৃষ্ট তুমি স্বীকারই কর নি। অতএব জীবদেহ অপেক্ষা শবদেহে কোন্ পদার্থ ন্যূন তাহা বল দেখি, যার জন্য উহাকে শব বলা যেতে পারে।

ঐ শবদেহ ক্রমশঃ নানাবিধ ক্রিমিরূপে পরিণত হয়ে থাকে, অতএব ইহাতে জীবত্ব-সম্পাদক সংযোগ-বিশেষের অভাব হয়েছে, এ কথা বলতে পার না; পরন্তু তাদৃশ সংযোগ সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান আছে। অতএব ইহাতে দেহস্বামী জীবাত্মারই অভাব হয়েছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সেই জীব স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্, পরন্তু কৃত্রিম জ্ঞানবান্ ন'ন। চিত্রাঙ্কিত নয়নদ্বারা কোন বস্তু দর্শন হয় কি ?

অতএব জড়দেহেরই জীবত্ব, এ কথা জড় ব্যক্তিই বলে থাকে, পণ্ডিতগণ ইহা বল্‌তে পারেন না। বস্তুতঃ জীব জড়দেহের অতিরিক্ত বলে স্বীকার্য্য, যা'কে পণ্ডিতগণ দেহী বলে অবগত হয়ে থাকেন।"

অষ্টমতঃ জীব বা আত্মা জড়দেহ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। প্রসঙ্গতঃ চিদ্‌বিজ্ঞানী পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁর "তত্ত্ববিবেক"-গ্রন্থে লিখেছেন,—"যত জড় বস্তু আছে, তা'তে বহুগুণ দেখা যায় এবং তা'তে বহু

পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তা'তে ইচ্ছা-লক্ষণ বস্তু নেই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মও নেই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হোক্ না কেন, তার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাক্‌লে অবশ্যই প্রকাশ পায়। জড়বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু—চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালন-কর্ত্তা ধর্ম্ম তার প্রধান পরিচয় হলেও স্বেচ্ছামত চালক হতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্যগতিকে সংঘটন হলেও তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। চিদ্বস্তু কীট-পিপীলিকাদি অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়-কুণ্ঠিত হয়েও আপন আপন ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চল্‌তে চল্‌তে কোন একটা বিচার উপস্থিত হ'লে আর একটা পথ অবলম্বন করে। এই বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড় বস্তুতে নেই, এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎ-এর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু অহং পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি।"

তিনি উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন,—"চৈতন্যকে জড়গুণ বলে গুণকে বস্তু-কর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তা'কে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে-পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে এসেছে। ঐ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভূ-মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হ'ত, তা'হলে অবশ্য তিন হাজার বছরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকত।"

এবম্বিধ নানা সাধারণ যুক্তির দ্বারা জীবাত্মা যে জড়দেহ থেকে সৃষ্টি হয় না এবং জীবাত্মার দেহরূপ পরিণাম হয় না—ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। দেহের জন্মের সাথে আত্মার জন্ম এবং দেহের বিনাশের সাথে আত্মার নাশ হয়—এরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত। সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, —দেহী জীবাত্মার জন্ম নেই ও মৃত্যু নেই, কিন্তু দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু ঘটে থাকে অর্থাৎ দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। যথা—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" (গীতা ২।২০)

অর্থাৎ,—"এই জীবাত্মা জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ হ'য়েও নিত্য, অপক্ষয়শূন্য, রূপান্তর-রহিত অর্থাৎ পুরাতন হলেও নিত্য নবীন, দেহ বিনষ্ট হ'লেও তা'র বিনাশ হয় না। কারণ এই শরীরের সহিত তা'র স্বরূপ-সম্বন্ধাভাব।"

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"
(গীতা ২।২২)

অর্থাৎ—"মানুষ যে-প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে অপর নূতন দেহ ধারণ করে থাকে।"

"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥" (গীতা ২।১৭)

অর্থাৎ—যিনি অবিনাশী জীব তিনি আত্মারূপে অতি সূক্ষ্ম ও অণু পরিমাণ হয়ে তার দেহের চৈতন্যকারক ব্যাপকতা শক্তির দ্বারা সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত থাকেন। জীবের দেহরূপে পরিণাম হয় না,—কেবল দেহেরই বিনাশ হয়। অণু আত্মা অব্যয় ও নিত্য হওয়ায় কেহই তাঁকে বিনাশ করতে সমর্থ হয় না।

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।" (গীতা ২।১৮)

অর্থাৎ—নিত্য জীবাত্মার এই শরীরসকল বিনাশশীল বলে কথিত হয়।

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।" (গীতা ২।৩০)

অর্থাৎ—দেহধারী এই জীবাত্মা সকল দেহেই নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন।

অতএব, শাস্ত্রানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমতঃ দেহের বিনাশ হলেও আত্মার নাশ হয় না। দ্বিতীয়তঃ দেহের জন্ম যখন আছে, তখন বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়তঃ বদ্ধাবস্থায় স্থূলদেহের বিনাশ হলেও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের সাথে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

জীবের স্থূলদেহের উৎপত্তি ও বিনাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু সূক্ষ্মদেহকে আমরা দেখতে পাই না, তবে ধারণা করতে পারি যে, মন-বুদ্ধি ও অহঙ্কার অবশ্যই আছে। জীবের সূক্ষ্মদেহ জীবোপাধি। স্থূলদেহের মত সূক্ষ্মদেহের বার বার প্রাপ্তি বা বিনাশ হয় না। সূক্ষ্মদেহদ্বারাই জীবের গতাগতিরূপ পুনর্জ্জন্ম হয়ে থাকে। জীবের জন্ম-জন্মান্তর কি-প্রকারে হয়? জীব এক শরীর হ'তে অন্য শরীরে গমনকালে সেই শরীর সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা নিয়ে যায়। যথা গীতা-প্রমাণ,—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" (গীতা ১৫।৮)

অর্থাৎ—"দেহস্বামী জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর হ'তে

নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হ'তে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ে যায়, সেই-প্রকার জীবও এইসকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে গমন করে।"

উক্ত শ্লোকানুসারে জানা যায় যে, বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি আধার হ'তে গন্ধ-গুণ গ্রহণ করে, কিন্তু পুষ্পাদি তথায়ই থাকে, তদ্রূপ জীব মরণকালে স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করে জীবিতকালের বাসনাযুক্ত মন তথা সূক্ষ্মদেহ ও তদনুরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মভাবে গ্রহণপূর্ব্বক অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে। এইরূপে কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে থাকে। জীবের মুক্তাবস্থায় জড় সূক্ষ্মদেহ থাকে না। মুক্তির লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হয়েছে,—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ।" (ছাঃ ৮।১২।৩) অর্থাৎ "এই জীব মুক্তি লাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হ'তে সমুত্থিত হ'য়ে চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তম পুরুষ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে আত্মার নিত্যত্ব-নিবন্ধন শোক করা অনুচিত জানিয়েছেন। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকায়তিক নাস্তিক-গণের মত উল্লেখ করে বলেছেন,—

"অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥" (গীতা ২।২৬)

অর্থাৎ—"হে মহাবাহো! আরও যদি তুমি জীবাত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত বলেই মনে কর, তা'হলেও তুমি এই আত্মার নিমিত্ত শোক করতে পার না।" উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ লিখেছেন,—"এবং স্বোক্তস্য জীবাত্মনোঽশোচ্যত্বমুক্ত্বা পরোক্তস্যাপি তস্য তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায়।** তথাহি মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টে ভূম্যাদিভূতচতুষ্টয়ে তাম্বূলরাগবৎ মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপদ্যতে; তাদৃশস্তচ্চতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা; স চ স্থিরোঽপি প্রতিক্ষণ পরিণামাদুৎপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিতি 'লোকায়তিকা' মন্যন্তে। দেহাদ্ভিন্নো বিজ্ঞানস্বরূপোঽপ্যাত্মা প্রতিক্ষণবিনাশীতি 'বৈভাষিকাদয়ো' বৌদ্ধা বদন্তি। তদেতদুভয়মতেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং প্রতিষেধতি।*** পরিণাম-স্বভাবস্য তস্য তস্য চাত্মনো জন্মবিনাশয়োরনিবার্য্যত্বাজ্জন্মান্তরাভাবেন পাপভয়াসম্ভবাচ্চ। হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য বৈদিকস্য চ তে নেদৃশং কুমতং ধার্য্যমিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ—"এই প্রকারে নিজ উক্তির দ্বারা জীবাত্মার অশোচ্যত্ব বলে, অপরের উক্তিরও আত্মসম্পর্কে যে তাহাই, পরমতের জ্ঞানের জন্য, ইহাই বলা হয়েছে।**

তথাহি মনুষ্যত্বাদি বিশিষ্টে ভূম্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারা অর্থাৎ ভূমি, জল, তেজ, মরুৎদ্বারা তাম্বূল রাগের ন্যায় এবং মদ-শক্তির ন্যায় চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, সেইরকম সেই চতুষ্টয়যুক্ত দেহই আত্মা। সেই আত্মা স্থির হ'লেও ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম হয় বলে উৎপত্তি ও বিনাশশালী, ইহা সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই সিদ্ধান্ত 'লোকায়তিকা' নাস্তিকেরা মনে করে। দেহ হ'তে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপও এই আত্মা প্রতিক্ষণে বিনাশশীল—এই কথা বৈভাষিক যোগাচার, মাধ্যমিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বলে থাকেন। এই পূর্ব্বোক্ত লোকায়তিক ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেও যে আত্মার শোচ্যত্ব নেই, তাহাই বলছেন।*** ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল সেই সেই আত্মার জন্মও বিনাশের অনিবার্য্যতাবশতঃ জন্মান্তরের অভাবে পাপও শোক-দুঃখাদি কখনও সম্ভব হয় না। হে মহাবাহো! ইহা অতিশয় উপহাসমূলক সম্বোধন; ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও বেদাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিশালী তোমার পক্ষে এই জাতীয় কুমত পোষণ করা কখনও উচিত নয়।" ভগবান্ স্বয়ং জানালেন যে, জীবাত্মা দেহ হতে সৃষ্ট ও দেহের বিনাশে জীবাত্মার নাশ—যাঁরা বলেন, তাঁরা নাস্তিক-শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের কুমত পোষণ করা শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তির পক্ষে উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভগবগীতার ১৮।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখেছেন,—"দেহনাশঃ এবাত্মনো নাশ ইত্যসুরাণাং মতম্"—অর্থাৎ "দেহনাশে আত্মার নাশ—ইহা অসুরগণের মত।"

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—"শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয় ইত্যাদি মতসকল নাস্তিকতা।"

দেহের সঙ্গে আত্মার সাম্য কল্পনা করে মানুষ শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। দেহ ও আত্মা পরস্পর ভিন্নধর্ম্মী হওয়ায় ও আত্মা নিত্য হওয়ায়, মৃত্যুতে জীব বা আত্মা শোকের বিষয়ীভূত হয় না। সুতরাং দেহের জড়-সত্তা থেকে চৈতন্য-সত্তা বা আত্মার সৃষ্টি হয় না। পরন্তু জড় দেহাদ্রিয়াদিতে আত্মার সংযোগ হলে জড়দেহ চেতনতা প্রাপ্ত হওয়ায় তা'কে জন্ম বলা হয়, আর আত্মা জড়দেহকে ত্যাগ করে গেলে আত্মারূপী চৈতন্য-সত্তার অভাবে দেহ যখন অচেতনতা প্রাপ্ত হয়, তখন তা'কে মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। অতএব চিদ্বস্তু আত্মা জড়দেহ থেকে সৃষ্ট হয় না এবং জড়দেহের সাথে বিনাশও হয় না।

জীবাত্মা অণু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ

জীবের দেহে যেমন ইন্দ্রিয়গণ আছে, তেমনি দেহের অভ্যন্তরে মন, বুদ্ধি ও আত্মা আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীতা ৩।৪২)

অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ হ'তে মন শ্রেষ্ঠ, মন হ'তে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হ'তে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা।" উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—"জীব জড়বদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলে মনে করে। তাহা অবিদ্যা-জনিত ভ্রম।" ঐ প্রসঙ্গে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের ভাষ্য,—"ইন্দ্রিয়েভোঽর্থা বিষয়াস্তদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ। বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ পরং বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংশয়াত্মকান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধের্ভোগোপকরণত্বাত্তস্যাঃ সকাশাদ্ভোক্তাত্মা জীবঃ পরঃ স চাত্মা মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামীতি দৈহিকং কর্ম্ম তু পূর্ব্বাভ্যাসবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ সেৎস্যতি।" অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয়গুলি হ'তে তাদের বিষয়গুলি তা'দের আকর্ষণ-কার্য্যহেতু শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার মনের অধীন বলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হ'তেও মন শ্রেষ্ঠ, কারণ- বিষয়ভোগের নিশ্চয়তাহেতু। সংশয়াত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা, বুদ্ধি ভোগ ও উপকরণাদির হেতু বলে বুদ্ধি অপেক্ষা ভোক্তা আত্মা অর্থাৎ জীব শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মা মহান্, দেহ-ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রভু, ইহার কিন্তু দৈহিক কর্ম্ম পূর্ব্বের অভ্যাস-বশে চক্রভ্রমি-ন্যায়ানুসারে হবে।"

ইন্দ্রিয়গণ স্থূল জড়-পদার্থ হওয়ায় সেগুলি স্থূলচক্ষে দেখা যায়। মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ হওয়ায় সেগুলি স্থূলচক্ষে দেখা যায় না। মন ও বুদ্ধিকে দেখা না গেলেও আমরা সকলেই মন বুদ্ধিকে স্বীকার করি। আমরা জড়ে অভিনিবেশবশতঃ যদ্দ্বারা চিন্তনরূপ কার্য্য করি তা'কেই মন বলা হয়। আর যদ্দ্বারা বিচারশক্তি পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধি নামে অভিহিত। মন ও বুদ্ধিকে চিদ্বস্তুর মত মনে হলেও এগুলি চিদ্বস্তু নয়,—এগুলি চিদাভাস বা সূক্ষ্ম জড়বস্তু। মন ও বুদ্ধি ব্যতীত তদতিরিক্ত চিদ্বস্তু আত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণই দেহের চেতনতা লক্ষিত হয়। আমরা সাধারণতঃ লক্ষ্য করি—যদি কোন জীবের দেহে জ্ঞান না থাকে তা'হলে মন মনন-কার্য্য করতে পারে না এবং বুদ্ধি বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। যে-জ্ঞানের অবস্থিতিতে মন ও বুদ্ধি নিজ নিজ কার্য্য করতে পারে, সেই জ্ঞানেরই অপর নাম 'আত্মা'। ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি ও দেহী জীব (জীবাত্মা) পরস্পর পৃথক্। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা দেহ ধারণ করে দেহী নামে অভিহিত। কাম-নামক রিপু ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করে দেহী জীবকে জড়বিষয়ে আকৃষ্ট করে ; যথা —

"ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥" (গীতা ৩।৪০)

অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় বলে কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে বিমোহিত করে।"

দেহে যে জ্ঞান বা আত্মা নামে কোন কিছু আছে, তা' আমরা কি করে বুঝব? জীবের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ, প্রাকৃত মন, ও প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা সেই অপ্রাকৃত আত্মাকে কি জানা যায়? আত্মার স্বভাব সর্ব্বস্তরের জীব-দেহের মধ্যেই প্রকাশিত আছে। যেমন আগুনের স্বভাব তাপ প্রদান করা; আগুনের এই স্বভাব পৃথিবীর সকল দেশে একই প্রকার দৃষ্ট হয়; তেমনি আত্মার স্বভাবও পৃথিবীর সকল দেশের বিভিন্ন জীব-দেহের মধ্যে একই প্রকার প্রকাশ পায়। জীবের অন্তর্নিহিত স্বভাবটি বিশ্লেষণ করলেই আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রতি জীবের স্বভাবই হচ্ছে—সে বাঁচতে চায়, কিছুতেই সে মরতে চায় না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে বা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সে নিজের সত্তাকে ধরে রাখতে চায়। আমরা দেহটাকে আত্মা বলে মনে করার নিমিত্ত মৃত্যুর সময় দেহটাকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। আমরা যে দেহটা ধারণ করে আছি, সেটা জড় বস্তু, তার সৃষ্টি ও নাশ আছে, তার নিত্য বিদ্যমানতা নাই;—তাই দেহটা অসৎ। কিন্তু আত্মার নিত্য সত্তা আছে,—তার জন্ম নাই এবং মৃত্যুও নাই। তাই সে সদ্‌বস্তু। সদ্‌বস্তু আত্মার এটাই স্বভাব যে, সে নিজ সত্তাকে সর্ব্বদা ধরে রাখ্‌তে চায়। 'সৎ'-শব্দ অস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অস্-ধাতু অর্থে সত্তা বুঝায়। যে সত্তা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাক্‌বে—তাহাই সৎ। আর যে দেহটা পূর্ব্বে ছিল না, এখন আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে থাক্‌বে না, তাহাই অসৎ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥" (গীতা ২।২৮)

অর্থাৎ—"হে ভারত! ভূতগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত, আবার মৃত্যুতে অব্যক্ত; অতএব শোকজনিত বিলাপে কি প্রয়োজন?

'অসৎ'-শব্দের দ্বারা বিনাশশীল দেহাদি জড় পদার্থকে, আর 'সৎ' শব্দের দ্বারা অবিনাশী আত্ম-চৈতন্যকে বুঝায়। জীবের মৃত্যুতে স্থূলদেহের নাশ হয়,—ইহাতে স্থূলদেহ যে অসৎ বা অনিত্য তা' আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সূক্ষ্মদেহ তথা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার মৃত্যুতে দেহ থেকে নির্গমন হয়, তার বারবার নাশ হয় না। জীবের সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ কোন্ সময় হ'তে জীবোপাধিরূপে বিদ্যমান, তা' জানা যায় না বলেই শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।২৯।৭০ শ্লোকে 'অনাদিমান্' বলা হয়েছে। "স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে"

—(ভাঃ ৪।২৯।৮৩) বচনানুসারে ভগবদ্‌স্মৃতির ফলে স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি হলে সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের নাশ হয়। কাজেই মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহও অসৎ বা অনিত্য। অতএব স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ—উভয়েই নশ্বর। কিন্তু একমাত্র চিন্ময় আত্মা অবিনশ্বর।

গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" (গীতা ২।১৬)

অর্থাৎ—অনাত্ম-ধর্ম্মত্বহেতু জড় শোক-মোহাদিযুক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অসৎ হওয়ায় তাদের সত্তা বা নিত্যস্থিতি নেই। সৎ আত্মায় অসৎ দেহদ্বয়ের ধর্ম্ম না থাকায় তার অভাব বা বিনাশ হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব আলোচনা করে এরূপ বিচার করেছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর]

হে মহামুনে! বিনা নিয়মে কার্ত্তিক মাস বা চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত করলে কুলাধম ও ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া পরিচিত হতে হয়। হে বিপ্রগণ! বিনা নিয়মে যারা কার্ত্তিক মাস যাপন করে, হরি তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হন; যেহেতু কার্ত্তিক মাস হরির প্রীতিকর।

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যস্তু ভক্তিভাবেন কেশবঃ।
নরকং তে গমিষ্যন্তি যমদূতৈস্তু যন্ত্রিতাঃ॥
জন্মকোটিসহস্রৈস্তু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো বিষ্ণুর্হারিতং তেন জন্ম বৈ॥

যারা কার্ত্তিক মাসে ভক্তিভাবে কেশবকে অর্চ্চন না করে, তারা যমদূত-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়ে নরকে গমন করে। বহু সহস্র কোটি জন্মের পর দুষ্প্রাপ্য নরজন্ম লাভ করে কার্ত্তিক মাসে হরিপূজা না করলে জন্মই বিফল হয়। কার্ত্তিক মাসে হরিপূজা, হরিকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণবদর্শন যার ভাগ্যে না ঘটে, তার দশ বৎসরের পুণ্য

নষ্ট নয়। সমুদয় তীর্থে স্নান করলে যে ফল হয়, সর্ব্বপ্রকার দান করলে যে ফল হয়, কার্ত্তিক মাসের ফলের সঙ্গে সেইসব কোট্যাংশেরও এক অংশ হতে যোগ্য হয় না। যেমন নদী, পর্ব্বত এবং সাগরের ক্ষয় নাই, তদ্রূপ কার্ত্তিক মাসে যা কিছু পুণ্য করুক, পাপই করুক, তার কখনও ক্ষয় হয় না। সেইজন্য আপনারা সবাই পাপ-পুণ্যের কোনটাই করবেন না। শাস্ত্রে এমন অনেক ধরণের কথা আছে, যা দুই ধরণের অর্থ বহন করে। পুণ্য করতে হবে,—ভাল কথা, পাপ করবে না। সব পাপ কেটে যাবে—এইজন্য যদি আমরা পুণ্য বা নাম-গ্রহণের ছলনা করি, তাহলে সেটা কিন্তু নামাপরাধের মধ্যে চলে যাবে। 'নামবলে পাপবুদ্ধি'-রূপ নামাপরাধ হয়ে যাবে। তা নাম-গ্রহণ হবে না। শ্রীনাম-গ্রহণের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝতে হবে।

হে ব্রহ্মণ! কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই; অতএব 'বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে' কার্ত্তিকমাস সর্ব্বদা প্রিয় বলে জানবে। তাহলে বৈষ্ণবগণের পক্ষে লেখা হয়েছে, অবৈষ্ণবগণের পক্ষে নয়তো? যদি এরূপ প্রশ্ন ওঠে? না, এ ফলশ্রুতি সকলের জন্য। সত্যযুগের সমান যুগ নাই বলা হয়েছে কেন?—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পূর্ণরূপে ছিল। সেজন্য সত্যযুগের মহিমা বিশেষ করে বলা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-স্থান যে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্র, সেখানে ৬০ হাজার ঋষি বসেছিলেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন ছিল,—দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কলিযুগ আসছে এখন, কলিযুগে আমরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি করে রক্ষা করব?

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

দারুণ কলিকাল আসছে, আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত। কলিজীব কি করে উদ্ধার লাভ করবে, তার ব্যবস্থা কি আছে বলুন। সূত গোস্বামীর কাছে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন। সূত গোস্বামী বললেন,—এ প্রশ্ন ত' পরীক্ষিৎ মহারাজ করেছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীশুকদেবের কাছে। তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। আমি সেইটা আপনাদের নিকট আলোচনা করছি, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। কি উত্তর দিয়েছিলেন পরীক্ষিৎ মহারাজকে শুকদেব গোস্বামী? তিনি বলেছেন,— কলিকাল আসছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কলি অশেষ দোষের আকর, এটাও ঠিক কথা। "কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥" শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীব উদ্ধারলাভ করবেন, এই ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সুতরাং হে ঋষিগণ, আপনারা ঘাবড়াচ্ছেন কেন, চিন্তা করছেন কেন? ঋষিগণ তাতে

আশ্বস্ত হলেন। কলিজীবের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে তাঁরা খুব দুঃখিত, চিন্তিত হয়েছিলেন।

এখানে বলেছেন, সত্যযুগের সমান যুগ নাই—ব্যাপারটা কি? সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম—সত্য, শৌচ, দয়া, দান পূর্ণরূপে ছিল। এক এক যুগ পার হয়ে গেছে, আর এক একটা পাদও সরে গেছে। সত্যযুগ শেষ হয়েছে, 'সত্য' চলে গেছে; ত্রেতাযুগ চলে গেছে, 'শৌচ' চলে গেল; দ্বাপর যুগ চলে গেল, 'দয়া' চলে গেল। কেবল 'দান' ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত কলিকাল। কিন্তু প্রত্যেক যুগেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। কোন যুগই নাম-সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া চলেনি। চারযুগের যে তারকব্রহ্মনাম সে সব ভগবানেরই নাম। ভগবানের নাম ছাড়া অন্য নাম নয়। যারা আজকাল কষ্টকল্পনা করছেন—ভগবানের নাম ছাড়া অন্য নাম করলেও আমাদের সব কিছু ব্যবস্থা হবে, এটা মিথ্যা কথা, বাজে কথা! কোন্ নাম করতে হবে তাও শাস্ত্রে সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। অন্য আধিকারিক দেবদেবীর নাম নয়, ভগবানের নাম, নারায়ণের নাম, বিষ্ণুর নাম, কৃষ্ণের নাম করতে হবে—একথা বলা আছে। এত পরিষ্কার লেখা থাকা সত্ত্বেও সন্দেহের কি আছে? সাধন-ভজন ব্যাপারটাই ভগবানকে লক্ষ্য করে, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। কেন একথা বলছেন?—যেহেতু উপাসনার কথা, আরাধনার কথা, সাধন-ভজনের কথা, সেজন্য এই কথাটা আসছে। আমরা কাঁর নাম জপ করব? —কৃষ্ণনাম জপ করব।

কৃষ্ণনাম—হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সব জায়গায় ত' হরিনাম—কৃষ্ণনামের কথা এল।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ত্রিসত্য করে বলছেন শাস্ত্র এই হরিনামের কথা। সেখানে অন্য কোন নামের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কৃষ্ণনাম হরিনাম করতে হবে আমাদের। এর দ্বারা মুক্তিলাভ হবে, ভক্তিলাভ হবে, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি লাভ হবে। এই নাম সাধন এবং এই নাম সাধ্য।

যাঁরা সত্যযুগে বাস করেছিলেন, তাঁরা অনেক সৌভাগ্যবান্ বলি আমরা। কিন্তু কলিকালে খুব একটা অসুবিধা নাই। তাও এটা আবার 'বিশেষ কলি'।

যার নাম 'ধন্য কলি'। যে যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন তার পরবর্ত্তী কলি, তার আবার বৈশিষ্ট্য বেশী। অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগের অন্তর্গত যে দ্বাপর যুগ, সেই যুগে এলেন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। আবার এরই পর কলিকালে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এসেছেন। সুতরাং এই কলিকে বলা হয় ধন্য কলি। 'ধন্য কলি ধন্য, নিতাই-চৈতন্য'; পরম করুণা করে এসেছেন। এটা বিশেষ কলি। সাধন-ভজনের জন্য ভাল ভাল ব্যবস্থা দেওয়া আছে। যদি মনে করি, আমরা লোকসানে পড়ে গেছি, তা ঠিক নয়। মহাজন-পদাবলীর মধ্যে আমরা পাচ্ছি এক জায়গায়—

যখন গৌর-নিত্যানন্দ,　　অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম,　　এ দেহের কিবা কর্ম্ম,
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার॥

এখানে আক্ষেপ ও দুঃখের কথা বলা হয়েছে,—গৌর-নিত্যানন্দ প্রভু, পঞ্চতত্ত্ব যখন এ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমার তখন জন্ম হয় নাই, তাঁদের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ হয় নাই। আবার একটা বিষয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ, পদকর্ত্তা চিন্তা করেছেন,—তখন যদি আমার জন্মার ঘর কম ছিল এবং আমি যদি তাঁদের দর্শন করে অপরাধ করে ফেলতাম। আর একটা করা—আমি কৃষ্ণের ভক্ত হব, এর থেকে ভাল কথা আমি গৌর-নিতাই এর ভক্ত হব। আবার কৃষ্ণভক্ত বললে একটু অহঙ্কার আসে, সেইজন্য বললেন,—আমি কৃষ্ণভক্ত হতে চাই না। তাহলে কি হবেন আপনি?—আমি ভক্তের ভক্ত হব। অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তির এও একটা বিচার-বৈশিষ্ট্য। কৃপাচার্য্য বললেন,—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
তদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

হে লোকনাথ! হে ভগবান্! তুমি যদি আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য দাসানুদাস দাসানুদাস বলে ভাব, তাহলে আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক। আমি যদি নিজকে কৃষ্ণভক্ত বলি, তাহলে অহঙ্কার আসে; আমি যদি কৃষ্ণের ভক্তের ভক্ত বলি তাহলেও কিছু অহঙ্কার থেকে যায়। কিন্তু আমি যদি কৃষ্ণের ভক্তের ভক্তের ভক্ত বলি তাহলে অহঙ্কার থাকে না। এটা অন্তরনিষ্ঠা, আন্তর-দর্শন। মুখে বললে হবে না, আন্তরিক অভ্যাসটা রাখতে হবে, যেন প্রাণ খুলে সরল-হৃদয়ে বলতে পারি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এক জায়গায় বলছেন,—ভক্ত বলে যে অভিমান, ভৃত্য বলে যে অভিমান, সেবক বলে যে অভিমান—এটা খুব বড় কথা।

অল্প করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্পভাগ্যে 'দাস' নাহি করেন ভগবান্॥

খুব সুন্দর কথা। এটাও ত' বুঝানো হয়েছে। আমি ভগবানের সেবক-সেবিকা—এটা বহু ভাগ্যের কথা। আগে আমার ভিতরে দৈন্যভাব আসুক, দীনতা আসুক, অমানী-মানদ-ধর্ম্ম আসুক। ভগবান্ যদি আমাকে মেনে নেন, গুরু-বৈষ্ণবগণ যদি মেনে নেন, তাহলে ত' আমার হয়ে গেল সব। আমি কৃত-কৃতার্থ। একজন প্রচুর সদ্‌গুণে ভূষিত, কিন্তু যদি তার হরিভক্তি না থাকে, শ্রদ্ধা না থাকে, শাস্ত্র বলছেন—হল না, হল না। কেন?—"হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ।" ভগবান্ হরিতে যার অভক্তি, তার আবার সদ্‌গুণ কোথায়? সে গুণ কোন কাজের হবে না। কেন? যিনি ভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করছেন না, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করছেন না, তিনি অসৎ মনোরথে প্রধাবিত। 'মন'-শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে। মনটা কিরকম?—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম॥

মনোধর্ম্মী মানে সকালে একরকম, দুপুরে একরকম, সন্ধ্যায় একরকম। সবসময় পাল্টাচ্ছে তার অবস্থাটা। এর নাম মনোধর্ম্ম। Oscillating mood। স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা সবসময় করে উঠতে পারছি না আমি। বহু উপদেশ শ্রবণ করবার পর অর্জ্জুন প্রশ্ন করে বসলেন কৃষ্ণের কাছে—বহু ভাল ভাল উপদেশ ত' দিলে, কিন্তু কিছুই ত' মনে রাখতে পারছি না, এখনই শুনছি এখনই ভুলে যাচ্ছি, তাহলে কি করব?—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

এ বিষয়ে কিছু বল, ভরসা রাখতে পারছি না, ভীষণ চঞ্চল আমার মন, কি করি বলতো? কি করে আমি এসব কথা মনে রাখব, সব ভুলে যাচ্ছি। এ অবশীভূত মন কারও কোন শাসন মানে না। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়েছেন?—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

অর্জ্জুন, তুমি যা বলছ তা ঠিক, মন বড়ই চঞ্চল, বড়ই দুষ্ট, তথাপি চঞ্চলতা পরিত্যাগ করবার জন্য তোমাকে দুটো উপায় অবলম্বন করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে

ভক্তি-অর্ঘ্য

জয় জয় প্রভুপাদ ভকতের প্রাণ।
বিরহ-কাতর হৃদে অনন্ত প্রণাম॥
আবির্ভূত হ'লে তুমি নীলাচল-ধাম।
জগন্নাথ-ভক্ত, বিমলাপ্রসাদ-নাম॥
গুরু-গৌর-অভীষ্ট পূরণে তব কাম।
প্রচার-সাধনে এ'লে নবদ্বীপ-ধাম॥
আবির্ভাব-তিরোভাব দুইই ত' সমান।
মহাজনগণ ইহা করেন বাখান॥
আবির্ভাবে যে আনন্দ করেন প্রদান।
তিরোধানে সে আনন্দ বিরহ-আখ্যান॥
সাক্ষাতে আলম্বনে যে পায় প্রয়োজন।
বিরহ-উদ্দীপনে লভেন সে ধন॥
ভক্তের বিরহ-শোকে কৃষ্ণ সুখী হন।
অনায়াসে ভক্তিদেবী দেন ভক্তি ধন॥
অনিত্য সুখ-দুঃখে জনম-মরণ।
সাধু-ভক্ত-বিরহে না হয় সে জনম॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভূলোকেতে আসেন যখন।
প্রভুর তারণ-গুণ ল'য়ে আগমন॥
ভকতবৎসল প্রভু অতি দয়াবান্।
গোলোকের প্রিয়তম করেন প্রেরণ॥
নিত্যসিদ্ধ প্রভুপাদ আসার কারণ।
পতিত-উদ্ধার-কার্য্য করিতে সাধন॥
সর্ব্ব মহাগুণগণ ভক্ত-ভিতরে।
কৃষ্ণের সকল গুণ ভকতে সঞ্চরে॥

ভকত-হৃদয়ে কৃষ্ণ সদা বাস করে।
সেইহেতু ব্রহ্মাণ্ড তারণ-শক্তি ধরে॥
জড়বিদ্যা যত কিছু করি' অধ্যয়ন।
পরাবিদ্যা ভক্তিশাস্ত্র করিল সাধন॥
যতি-বেষ ধরি' করে অভীষ্ট-পূরণ।
ভক্তিসিদ্ধান্ত যাহা করে প্রচারণ॥
রূপানুগ ভক্তিধারা বহে সর্ব্বক্ষণ।
যে ধর্ম্ম লুপ্ত নহে নিত্য-বর্ত্তমান॥
স্বতঃসিদ্ধ আত্মধর্ম্মে নাহি কারো জ্ঞান।
মায়াগুণ—উচ্চবিদ্যা না পায় সন্ধান॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাক্যে নাহি কর্ম্ম-জ্ঞান।
অন্যাভিলাষ, কুটীনাটী নাহি পায় স্থান॥
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতে হয় ত' প্রমাণ।
আদি-মধ্য-অন্তে শুধু হরি-গুণগান॥
বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা যাহা নিত্য সনাতন।
শুনিলে অবিদ্যা হরে, পাপ-পরিত্রাণ॥
ভুবনমঙ্গল হয় সবার কল্যাণ।
ভক্তগণ সেই বার্ত্তা করে বিতরণ॥
ব্যষ্টি-সমষ্টি-জ্ঞানে ঈশ্বর দর্শন।
সর্ব্বময় সুদর্শনে হয় অদ্বয়-জ্ঞান॥
জগন্নাথ সুসম্বন্ধে যাঁহার বিজ্ঞান।
অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দোষ পায় পরিত্রাণ॥
ভোগবাঞ্ছা ছেড়ে যায়, পরাবিদ্যা-জ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞান-দিব্যজ্ঞান লভে জ্ঞানাঞ্জন॥
(যবে) ব্যাসরূপে প্রভুপাদ করেন বরণ।
প্রেমলাভের অধিকার পায় সে তখন॥
ভক্ত হ'তে ভক্তিধন লভে সর্ব্বজন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত সবে করে পান॥

(যিনি) গৌর-নিজশক্তি শ্রীভকতিবিনোদ।
লীলাভূমি প্রকাশিলে করি' প্রতিরোধ ॥
সহজিয়া, গোঁসাই সব বিঘ্ন আরম্ভিল।
সরস্বতী-প্রচারেতে সব দূরে গেল ॥
ভারতের সর্ব্বস্থানে বাণী প্রচারিল।
শুদ্ধ প্রচার-কেন্দ্র সব গড়িয়া উঠিল ॥
ভক্তিবিনোদ ভক্তিগ্রন্থ যাহা বিরচিল।
গৌরবাণীরূপে তাহা বিশ্বে খ্যাত হৈল ॥
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচারিল প্রভুর গুণ-নাম ॥
কলিকালে ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরশক্তি বিনা নাহি হয় প্রবর্ত্তন ॥
সেই শক্তি আসি' করে নাম-প্রচারণ।
গৌরকৃষ্ণ-অভীষ্ট পূরাণ নিজজন ॥
ভক্তিধনের দাতা মহাসিদ্ধ ভক্তগণ।
প্রেমধন লাভ করেন ভাগ্যবন্ত জন ॥
'কমল-মঞ্জরী' যবে করে আকর্ষণ।
'নয়ন-মঞ্জরী' তবে করিলা গমন ॥
'প্রভুপাদ'-শ্রীচরণে করি নিবেদন।
এ দীনের 'ভক্তি-অর্ঘ্য' করুন গ্রহণ ॥
সবে মিলি' কর কৃপা—এই নিবেদন।
গুরু-বৈষ্ণবচরণে রহুঁ মন-প্রাণ ॥
নিত্যলীলা হ'তে কৃপা করুন বর্ষণ।
অভয় চরণ হউক হৃদয়ের ধন ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

———

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও

শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

"গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ, শ্রীগদাধরাভিন্নতনু শ্রীগৌরনিজজন জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাণীর সার্থক রূপায়ন-মানসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে এবং সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায়, সমিতির অন্যান্য ত্রিপণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণের সহযোগিতায় কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির প্রচারিত কলিকলুষ কল্মশনাশকারী তারকব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তনমুখে চৌরাশীক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করা হয়। শাস্ত্রে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা ধামে অথবা তীর্থে পালন করিবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীসমিতির পরিচালকগণ সে-কারণে প্রতি বৎসরই ব্রতপালনেচ্ছুক ত্যাগী, গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীধামে এই ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

এই ব্রতমাসে প্রত্যহ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ 'শ্রীসত্যব্রত মুনি'-রচিত "শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্", "শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তবরাজ", "শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্" কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করেন। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ যখন সকলে সমবেত কণ্ঠে এই স্তবগুলি কীর্ত্তন করিতেন, তখন সত্যই এক অনির্ব্বচনীয় বৃন্দাবনীয় ভাবের সৃষ্টি হইত।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ও স্থানীয় প্রায় তিন শতাধিক যাত্রী লইয়া ব্রজ-মণ্ডলের বিভিন্ন লীলাস্থলীসমূহ পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমাকালে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ (পুরী), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীধামের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক যাত্রিগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন।

পরিক্রমার শেষভাগে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাগমনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে সকল ভক্তগণ উচ্ছ্বসিত হন। তিনি দুইদিন তথায় শ্রীহরিকথার মাধ্যমে শ্রীদামোদরব্রত, কার্ত্তিকব্রত, ঊর্জ্জব্রত প্রসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় যুক্তিসহকারে এই ব্রতের নিত্যতা, ব্রতের বিধি-নিষেধাবলী, ব্রতের মহিমা-মাহাত্ম্য, অকরণে প্রত্যবায় প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

ব্রত-সমাপ্তি-দিবসে অর্থাৎ ২১শে কার্ত্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ৭।১১।১৯৯৫) মঙ্গলবার বৃন্দাবনস্থ শ্রীসমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বদিবস হইতে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গন বিচিত্র রঙ্গিন পতাকা, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপকরণসমূহদ্বারা সুসজ্জিত করেন।

২০শে কার্ত্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ৬।১১।১৯৯৫) সোমবার অপরাহ্ণে এক বিশাল নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে সন্ধ্যায় বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও অধিবাস কীর্ত্তনদ্বারা অধিবাসকার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

২১শে কার্ত্তিক, ১৪০২ (ইং ৭।১১।৯৫), মঙ্গলবার সমিতির সভাপতি আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও সহ-সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীনরহরি দাসাধিকারী যথাক্রমে ব্রহ্ম, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বৈদিক পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে অভিষেক ও বৈষ্ণবহোমাদি সম্পন্ন করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত, রবাহূত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ (অন্ধ্রপ্রদেশ), শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ এবং স্থানীয় পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয় 'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, অপ্রাকৃতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত প্রাঞ্জল ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণ এবং যুক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করত শ্রোতৃবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

পরিশেষে এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, আনুকূল্যকারী সুধী-ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীসমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—এন্‌ভিডি-৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪০২ ; ১৬।১২।৯৫

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৩শে মাঘ, ১৪০২ (ইং ৭।২।৯৬) বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ২৫শে মাঘ (ইং ৯।২।৯৬) শুক্রবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—২৩শে মাঘ, বুধবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্ণে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

২৪শে মাঘ, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

২৫শে মাঘ, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ১০ মাধব, সঙ্কর্ষণ, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ পৌষ, সোমবার, ১৪০২, ইং ১৫/১/৯৬ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগিরিধারিণে নমঃ

অলং দীপাবল্যাং বিপুলরতি গোবর্দ্ধন-গিরিং
জনন্যা সংপূজ্যোজ্জ্বলিত মহিলোদ্গীত-কুতুকৈঃ।
নিশাদ্রাবৈঃ পৃষ্ঠে রচিত-কর লক্ষ্মশ্রিয়মসৌ
বহন্ মেঘধ্বানৈঃ কলয় গিরিভৃৎ খেলয়তি গাঃ॥ ১॥

দীপান্বিতায় (দীপাবলীতে) যশোদাদেবী সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিতা গোপ-মহিলাদিগের সহিত উত্তম গীত-কৌতুকে বিশেষ ভক্তিসহকারে গোবর্দ্ধন-

পূজা করিয়া হরিদ্রা-দ্রবদ্বারা যাঁহার পৃষ্ঠদেশে নিজহস্তের চিহ্ন রচনা করিয়াছেন, (হে রূপমঞ্জরি-সখি !) সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ-জননী-দত্ত ঐ চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করত মেঘ-গম্ভীর-নিশাদে গো-সকলকে ক্রীড়া করাইতেছেন, দর্শন করুন ॥ ১ ॥

পুরো গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজনৃপতি-মুখ্যা ব্রজজনা
ব্রজেন্দ্র্যেষাং পশ্চান্নিখিল-মহিলাভির্ব্রজনৃপা ।
ততো মিত্রব্রাতৈঃ কৃতবিবিধ-নর্ম্ম ব্রজশশী
ছলৈঃ পশ্যন্ রাধাং সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্ ॥ ২ ॥

অগ্রে গো-গণের সহিত নন্দরাজ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ এবং ইহাঁদিগের পশ্চাৎ নিখিল ব্রজ-মহিলাদিগের সহিত ব্রজেশ্বরী যশোদাদেবী গমন করিতেছেন। তদনন্তর ব্রজশশী শ্রীকৃষ্ণ মিত্রবৃন্দের সহিত বিবিধ কৌতুক করত ছলে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন। হে সহচরি ! দর্শন করুন ॥ ২ ॥

উদঞ্চৎ কারুণ্যামৃত-বিতরণৈর্জীবিত-জগদ্-
যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণ-সুমনসাং বাসিতজনম্ ।
কৃপাঞ্চেন্ময্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥ ৩ ॥

সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণ করত যিনি জগৎকে জীবিত করিতেছেন এবং যিনি গুণরূপ পুষ্পসমূহের গন্ধে জন-সকলকে আমোদিত ও তৃপ্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি কৃপা না করেন, তবে হে সখি ! যাহাতে আমার সমস্ত অঙ্গ শ্রীকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) বাস করে, আপনি তাহাই করুন অর্থাৎ আপনার আজ্ঞায় আমি শ্রীকুণ্ডে দেহত্যাগ করি ॥ ৩ ॥

উদ্দাম-নর্ম্ম-রসকেলি-বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধা-মুকুন্দ-যুগলং ললিতা-বিশাখে ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রমিহ রূপ-যুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥ ৪ ॥

অতিশয় পরিহাস-রসক্রীড়াতেই যাঁহাদিগের অঙ্গ বিনির্ম্মিত, হায় ! এতাদৃশ রাধাকৃষ্ণ-যুগল, ললিতা-বিশাখা, গৌরাঙ্গচন্দ্র এবং শ্রীরূপ ও সনাতন, ইহাঁদিগকে এই ব্রজে দর্শন না করিয়া আর কতই না বেদনা সহ্য করিব ; অরে ললাট, তুমি বিদীর্ণ হও ॥ ৪ ॥

ব্রজপতি-কৃত পর্ব্বানন্দি-নন্দীশ্বরোত্থৎ-
পরিষদি বদনান্তঃ স্মেরতাং রাধিকায়াঃ।
রচয়তি হরিরারাদ্দৃগ্বিভঙ্গেন নত্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ ॥ ৫ ॥

(হে সখি!) সূর্য্য যেমন কিরণদ্বারা কমলিনীর পুষ্পকান্তি প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ব্রজপতি নন্দ-মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত পর্ব্বোপলক্ষে নন্দীশ্বরবাসী জন-সকলের সভায় শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নয়ন-ভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধিকার বদন-মধ্যে মন্দ হাস্য রচনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

উপগিরি-গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে।
ভ্রমতি নিভৃত-রাধা-নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন।
অতিতৃষিত-চকোরী-লালসেবাম্বুদস্যো-
পরি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য-আকাশদেশম্ ॥ ৬ ॥

(হে সহচরি!) যেমন আকাশ-প্রদেশে মেঘের উপরে সুধাপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে অতি তৃষ্ণাতুরা চকোরীর লালসা ভ্রমণ করে, তদ্রূপ গিরি-সমীপে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যপূর্ণ বদন-বিম্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধা নেত্রভঙ্গীচ্ছলে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

দ্যুতিজিত-রতি-গৌরী-ক্ষ্মা-রমা-সত্যভামা-
ব্রজপুর-বরনারীবৃন্দ-চন্দ্রাবলীকাম্।
গিরিভৃত ইহ রাধাং তন্বতো মণ্ডিতাং ত-
ত্তদুপকরণমগ্রে কিং নিধাস্যে ক্রমেণ? ৭ ॥

যাঁহার কান্তি কামপত্নী রতি, গৌরী, পৃথিবী, লক্ষ্মী, সত্যভামা ও ব্রজপুরের উত্তম উত্তম রমণীগণ এবং চন্দ্রাবলীকেও জয় করিয়াছেন, এতাদৃশী শ্রীরাধাকে যিনি এই ব্রজ-মধ্যে অলঙ্কৃতা করিয়া বিস্তার করিতেছেন, সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আমি কবে তৎকালোচিত উপকরণ স্থাপন করিব? ৭ ॥

কনক-রচিত-কুম্ভদ্বন্দ্ব-বিন্যাসভঙ্গী-
রুচিহর-কুচযুগ্মং সৌরভোচ্ছূনমস্যাঃ।
সপুলকমথ গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছো-
গিরিভৃত ইহ হস্তে হন্ত দাস্যে কদা তান্ ॥ ৮ ॥

কনক-রচিত কুম্ভযুগ্মের বিন্যাস-ভঙ্গীর শোভাহারী, সৌরভপুষ্ট ও পুলকিত

শ্রীরাধার কুচযুগলকে যিনি গন্ধ-দ্রব্যদ্বারা চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক, হায়! সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমি কবে গন্ধদ্রব্যসকল অর্পণ করিব? ৮ ॥

কৃষ্ণস্যাংসে বিনিহিত-ভুজাবল্লিরুৎফুল্ল রোমা
রামা কেয়ং কলয়তি তরাং ভূধরারণ্য-লক্ষ্মীম্।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয়-চটুল-ব্যাকুলা রাগপূরৈ-
রন্যা কাস্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে ভুজলতা স্থাপনপূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গী হইয়া অত্যাদরে গোবর্দ্ধন-সমীপ-প্রদেশের বনশোভা দর্শন করিতেছেন, এই রমণী কে? হে সহচরি! জানিলাম,—প্রণয়-চটুলা, ব্যাকুলা এবং অনুরাগসমূহে পরিপূর্ণা শ্রীরাধা ব্যতিরেকে আর কে এ প্রকার হইবে? ৯ ॥

অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমল-পয়ঃ-ফেণনিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদ-বিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥ ১০ ॥

জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব্ব প্রেম-সমুদ্রের সুনির্ম্মল বারি ফেণ-সমূহদ্বারা সর্ব্বদা মাদৃশ জনকে যে-প্রকার সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই; সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্-রূপ দাবানল-গ্রস্ত হওয়ায় আমি আশ্রয়শূন্য হইয়াছি; অতএব পূর্ব্ব-কৃপাসিক্ত সেই মদ্বিধ জন এখন উক্ত শ্রীরূপগোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করিবে? ১০ ॥

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্র-তুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে ॥ ১১ ॥

জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্র-তুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ১১ ॥

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়-তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকট-কদন-ভারং কো বহত্বন্যথা বা? ১২ ॥

যদি আমার দেহ ভৃগুপাতদ্বারা পতিত না হয় তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই, যেহেতু ঐ দেহকে বিধাতা বজ্রসারদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অথবা

আমি প্রাগঢ় তর্ক করিয়া এই একটী অন্য কারণ দেখিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এতাদৃশ দুঃখভার বহন করিবে ? ১২ ॥

গিরিবর-তট-কুঞ্জে মঞ্জু-বৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্ ।
ধৃতরতি রমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজ-দধি-ফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥ ১৩ ॥

আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুবিমল কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সানুরাগ রমণীয় চরণারবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে এবং বৃন্দাবনের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তি-কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাতেই যেন সর্ব্বকাল বাস করি ॥ ১৩ ॥

বসতো গিরিবর-কুঞ্জে
জপতঃ শ্রীরাধিকেহনুকৃষ্ণেতি ।
ধয়তো ব্রজ-দধি-তক্রং
নাথ ! সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥ ১৪ ॥

হে নাথ ! হে রূপগোস্বামিন্ ! গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে বাস, "অগ্রে হে রাধিকে ! পশ্চাৎ হে কৃষ্ণ !"—এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও ঘোল পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নোত্তর

বৈধী ভক্তি

১। বিধিমার্গ কাহাকে বলে ?

"বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্য-ধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৎগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।" —কৃঃ সং ৮।১০

২। বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন্ কোন্ বৃত্তি ক্রিয়াবতী ?

"সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগানুগা ভক্তিতে ক্রিয়া করে।" —জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৩। রাগোদয়ের পূর্ব্বে জীবের কৃত্য কি?

"যে-কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪। স্মার্ত্তধর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে প্রভেদ কি?

"আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম—নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি।" —চৈঃ শিঃ ৩।১

৫। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে চরম কল্যাণ কি?

"মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়াভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ।" —শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ১

৬। মায়িক শরীর থাকা-কাল পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য কি?

"যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির॥
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ॥
ধাম-কৃপা নাম-কৃপা ভক্ত-কৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে॥
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ॥" —নঃ ভাঃ তঃ ১০৭-১০৮

৭। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, গৌণ ভক্তি ও সাক্ষাৎ ভক্তির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি?

"কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে "কর্ম্মকাণ্ড" বলা যায়; এ কর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহাদিগকে "কর্ম্মযোগ" বা "জ্ঞানযোগ" বলা যায় এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণ ভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কর্ম্মকে কেবল 'সাক্ষাৎ ভক্তি' বলা যায়।" —ব্রঃ সঃ ৫।৬১

৪। সুকৃতি কয় প্রকার? কিরূপে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়?

"সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফলভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচন', হঃ চিঃ

৯। প্রকৃত-ভজন ও ভজনপ্রায় চেষ্টার স্বরূপ কি ?

"'নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে॥'
'অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥"

এই সমস্ত পদ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবপ্রায় ছায়ানামভাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া অতি সুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে 'ভজন'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজন-প্রায় তীব্র সাধন-মাত্র। প্রকৃত ভজন অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত-স্বরূপে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যেই হইয়া থাকে।" —'সংশয়-নিবৃত্তি', সঃ তোঃ ৪।১২

১০। গৃহস্থের উপস্থবেগ ধারণ কি ?

"বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।" —'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

১১। অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত-পাচিত অন্ন কি কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে ?

"শুদ্ধ বৈষ্ণবদ্বারা যে অন্ন পক্ব হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণ-পূজা-সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।" —'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১২। অন্য দেব-পূজকের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করা উচিত কি ? করিলে কি অসুবিধা হয় ? কোন্ সময় অন্য দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা যায় ?

"অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৩। আত্মমঙ্গলকামীর সঙ্কল্প কি ?

"সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল-পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভে যত্ন করিব। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

১৪। কৃষ্ণ-ভজনকারী কি দুর্নৈতিক বা জড়াসক্ত। কোন্ সময় কৃষ্ণ-ভজন হইয়া থাকে ?

"কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হইবে না।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

১৫। হরিবাসরের সম্মান কিরূপ?

"পূর্ব্বদিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু-উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন এবং পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসরের সম্মান।" —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

১৬। পুরুষোত্তম-ব্রতাদি-পালন কিরূপ?

"পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল (শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতবিধি-সকল) স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালন-নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।"
—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

১৭। কিরূপ আচার স্বীকার করা কর্ত্তব্য?

"যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বক এবং সেই আশ্রমের লিঙ্গগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন।" —'ভেক-ধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৮। বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের ক্রম কি?

"শরীর-যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগদ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তি-সাধন যত নির্ম্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।" —'জীবতত্ত্বম্', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ

১৯। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

"গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম-আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেইস্থানে কালাতিপাত করিবেন।" —'বৈষ্ণবের সঞ্চয়', সঃ তোঃ ৫।১১

২০। গৃহত্যাগী কিরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন? কিরূপে কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে?

"গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্র করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তি-সাধন করিবেন, কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন।" —'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯ (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারদ্বারা বা মিছা ভক্তিদ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যায় না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগ মাত্র; তাহা কখনও সেবা নয়। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা আত্মধর্ম্ম, ভক্তি নয়। কৃষ্ণ জড়জগতের কাজ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্য বস্তু।

ভগবান্—বিভু চেতন, নিত্যবস্তু; আর তাঁহার অংশ বলিয়া আমরাও নিত্য-বস্তু; ভগবানের সহিতই আমাদের নিত্য-সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া তিনি এখন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে আমাদের যাবতীয় পাপ—সকলপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গ প্রদান করিবেন। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না; কিন্তু যে জিনিষ নিত্য পরম মঙ্গলময়, তাঁহার সঙ্গবিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলে অপ্রাকৃত-বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ শ্রবণের জন্য, শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন।

কৃষ্ণ প্রেমময়, তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার

নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই, কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার—যাবতীয় ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায়ে আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব। সাধুগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। গুণতাড়িত ব্যক্তিদিগের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গফলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের শক্তিদ্বারা প্রতারিত হই।

কৃষ্ণসেবাই আমাদের কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে জড়প্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে; কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা থাকিবে না। অধোক্ষজসেবা ভূমিকায় জড়কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হন। শুদ্ধসত্ত্বেই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। নামাপরাধের শ্রীনামে স্ফূর্ত্তি নাই। অপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে ব্যভিচার উপস্থিত থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তর-রহিত, আর কৃষ্ণও তাঁহার নিজজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্যসেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য অস্তিত্বের অভাব-হেতু তিনি নিত্য সেবা-গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না।

শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীব-বিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহাদ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে। জল সেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতাবীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনরত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণকল্প-বৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ করিতে হইলেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফলপ্রদাতা নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে জগতের নানা অভিলাষ উপস্থিত হইবে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে—এ-সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্তরত্ন ও হারাইয়া ফেলিতে হয়।

অধিকারই ভিন্নতা-প্রকাশক

'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'—এই গীতাবাক্যকে সকলেই বহুমানন করেন। ভজনরাজ্যে এতদনুসারেই বৈধীভক্তির ব্যবস্থা সর্ব্বত্র বিহিত হইয়াছে। এতদনুসারেই সাধককে সাধনপথে সার্থকতা প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উন্নতিলাভ ঘটে না—ইহা সুসত্য। এই বিধানেই শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রবণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিরাকার বিগ্রহে যে-সমস্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণীমাত্রেই ভগবৎ-

সেবাপর হইবে। পরন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই বিপরীত ফল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এমন কি, এবম্প্রকার আচরণকেও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যথা—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বর ব্যতীত অর্থাৎ সামর্থ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত বা অধিকারী ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখনও মনের দ্বারাও করিবেন না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইলেও অনধিকারী ব্যক্তি কখনও ইহা (রাসলীলাদি) স্মরণ করিবে না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাপ্রযুক্ত অনধিকারী কেহ যদি এই (রাসলীলাদি) ঈশ্বর-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

গুরুবর্গ এবং আচার্য্যগণ এই বিষয়টী অতীব কঠিনভাবে অনধিকারী সাধককে নিষেধ করিলেও মূঢ়তাবশতঃ বহুল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের আদেশ অগ্রাহ্য ও লঙ্ঘিত হইতে দেখা যায়। ইহা যে মূঢ়তা, বিজ্ঞতা নহে, তাহাই শ্রীল শুকদেব উক্তি করিয়াছেন এবং ইহার পরিণামকে ভজনের উন্নতি না বলিয়া 'বিনাশ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অত্যন্ত কামুক, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-ব্যক্তিগণও উন্নত উজ্জ্বল মধুর-রসের ব্যাখ্যায় কাপট্য ও নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বভাববশতঃ অশ্রুবর্ষণ করত নির্ব্বোধ শ্রোতাগণকে মোহিত ও প্রতারিত করিয়া উভয়ের সর্ব্বনাশ করে এবং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার চরম উন্নতি করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা সাধু ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত হইলেও তাহাদের পরিণাম শোচনীয়। ইহা আদর্শ হইতে পারে না—ইহাই শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশ।—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কম্পাশ্রুপুলকাদয় ॥

অর্থাৎ, স্বভাবপিচ্ছিল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের করুণ ঘটনাদিতে অশ্রুপাত ঘটে অথবা অভিনেতাদের চেষ্টাজনিত অশ্রুপাত দেখা গেলেও তাহা শুদ্ধপ্রেমিক ভক্তের প্রেমাশ্রুবর্ষণ বলিয়া জ্ঞান করা সঙ্গত নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব দূরে থাকুক, তাহা তাহার আভাসও নহে জানিতে হইবে। এমনকি, তাহাদের মুখোচ্চারিত পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণেও শাস্ত্রে নিষেধ দেখা যায়। সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া পান করিলে যেরূপ ভয়াবহ পরিণাম, তাহাই জানিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব ইহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়াও স্বীকার করেন নাই।—

"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব॥" "কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

যদ্যপি পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়,—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণকর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। প্রকৃতপক্ষে, এই সংজ্ঞাই বৈষ্ণবের সার্ব্বিক পরিচয় নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রাম-নিবাসী রামানন্দ এবং সত্যরাজ খাঁন প্রভুর প্রতি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহেন,—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে,— যাঁ'র মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, শ্রেষ্ঠ সবাকার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একবার কৃষ্ণনাম কাহাকে বলিয়াছেন, তাহাও নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বদ্ধজীবের নামাপরাধকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু তাহা অন্ততঃ নামাভাস হওয়া আবশ্যক এবং এই নামাভাস-ফলে জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া শাস্ত্রের বিচার।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।
অনুসঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥
অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত 'বৈষ্ণব', করিহ তাঁহার সম্মান॥

(পুরশ্চরণ বলিতে —স্বেষ্ট-দেবতার মন্ত্রসিদ্ধি-নিমিত্ত দেবতার পূজাপূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্র জপ, হোম, তর্পণাভিষেক ও ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গ সাধনাকে বুঝায়।)

অধিকার-বিচার সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের মন্তব্য,—

"ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ একাকার সব।" এ স্থলে বিচার্য্য,—মুক্ত পুরুষকে যেরূপ সম্মান, ব্যবহার ও সেবা কর্ত্তব্য, নামাপরাধী, কপটী, দুশ্চরিত্র অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর প্রতিও তদ্রূপ আচরণ উচিত বা অনুচিত। উভয়কে সমজ্ঞানে সম-আদর করা অনুচিত বলিয়াই শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ।

যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ,—

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
সে-যুক্তবৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরির বৈভব॥
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল বৈষ্ণব॥
বিষয় মুমুক্ষু, ভোগের বুবুক্ষু, দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ, কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব॥

মায়াবদ্ধ সাধক শ্রীগুরুদেবের যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিতে গিয়া স্বীয় ভোগ-বৃত্তি-চরিতার্থ হইতেছে, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝে না।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে॥"—বাক্যটি মুক্তপুরুষের আচরণকেই বুঝায়; ইহা কখনই বদ্ধজীবপক্ষীয় বাক্য বা আচরণীয় নহে। 'অনাসক্তস্য' এবং 'নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে' পদে বদ্ধজীব লক্ষীভূত হয় না। বিলাসবহুল বাসগৃহ, খট্টা-শয্যাদি এবং সুস্বাদু আহার্য্যাদিতে বদ্ধজীবের ভোগবৃত্তি-চরিতার্থই হইয়া থাকে; তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ উপলব্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদাসগোস্বামীকে যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্ত হইয়া ভোগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল দাসগোস্বামী এই আদেশের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। মায়াবদ্ধ সকল সাধকপক্ষে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না; মায়াগ্রস্ত সাধকের ইহা আচরণীয় নহে।

গৃহত্যাগী সাধকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি—

"শুনি তুষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিল।
ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-ধারণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হৈয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আচরণে ইহার ব্যতিক্রম জীবের মহান্ কল্যাণোদ্দেশ্যে হইয়া থাকে; পরন্তু মায়াবদ্ধ জীবের অধিকার অনুযায়ী আচরণই কর্ত্তব্য। ব্যতিক্রম করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-সংস্কার জন্য সাধুজী তাঁহার কয়েকটী শিষ্যকে অদৃশ্য হওয়া, জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া ও স্পর্শমাত্রে তালা খুলিবার বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহাদের দ্বারা রাজা ও রাজাবিশেষ ধনীর ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করত শ্রীমন্দিরের ও প্রাকারগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। পরন্তু পরবর্ত্তিকালে ঐ শিষ্যগণ তাহাদের গুরুদেবের বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া ধনাদি লুণ্ঠন করিতে থাকায়, সাধুজী তাহাদিগকে কাবেরী-নদীর মধ্যস্থলে লইয়া নদীতে নিমজ্জিত করত বিনাশ করিয়া তাহাদের ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং গুরুমারা বিদ্যাদ্বারা সংসার প্রতিপালন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ কখনই পরমার্থপ্রদ নহে, অনধিকারহেতু তাহা আচরণীয় নহে।

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

(বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহার নাম গুণ; অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ।—ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।)

ভগবানের সমস্ত আচরণই যেরূপ অসমর্থ ব্যক্তির আচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, তদ্রূপ গুরুবর্গ ও আচার্য্যবর্গের সমস্ত আচরণও অনধিকারী শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের আচরণের মধ্যে যেগুলিতে তাহার অধিকার, তাহাই আচরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ কৃষ্ণের বিষপান, দাবানলপান, কালীয়দমন, যাবতীয় অসুরমারণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি আচরণে অসমর্থ হইয়া গোপীদের সহিত লীলার আচরণ বা আলোচনা করিতে গেলে চলিবে কি? এইরূপ অপ্রাকৃত অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেব, তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে যাহাই আচরণ করিয়াছেন, অনধিকারী শিষ্য তাহা আচরণ করিতে পারে না। আচরণ করিলেও তাহা নকল বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহাতে আসলের সুফল বর্ত্তমান থাকে না। যেরূপ শ্রীগুরুদেবের উচ্চারিত 'হরে কৃষ্ণ' নাম শুদ্ধনাম, পরন্তু অনধিকারী শিষ্যাভিমানীর ঐ 'হরে কৃষ্ণ' শব্দ শুদ্ধনাম

না হইয়া নামাপরাধ হইয়া থাকে। সুতরাং অনধিকারী শিষ্যাভিমানী যদি গুরু সাজিয়া হরিনাম-দীক্ষা প্রদান করেন, তাহা কিরূপে সমশক্তি প্রকাশ করিবে? শ্রীগুরুদেবের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া শিষ্য নামোচ্চারণ করিতে সক্ষম হয়। অনধিকারী গুরুব্রুবের সে শক্তি কোথায়? শ্রীগুরুদেব ও গুরুব্রুবের উচ্চারিত নাম বা মন্ত্রের পার্থক্য বালিশ বা অনধিকারী ব্যক্তি কখনই বুঝিতে সক্ষম নহে। পরন্তু ফলবিচারে তাহার ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগুরুদেবের সমস্ত আচরণ বা কর্ম্ম—সাক্ষাদ্ভক্তি এবং গুরুব্রুবের বা বদ্ধজীবের আচরণ মায়িক বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের সকল আচরণই—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" বলিয়া জানিতে হইবে। পরন্তু বদ্ধজীবের কার্য্যাদি সেরূপ নহে। বদ্ধজীবের হরিনাম, পাঠ-কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহসেবা, তীর্থযাত্রা, ধামপরিক্রমা, গ্রন্থ ও পত্রিকাদির প্রকাশন, শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও ভাষণ-উপদেশাদিতে অন্যাভিলাষিতা থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের ক্ষেত্রে ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধভক্তি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহার ভেদ উপলব্ধি না হইলেও, তাহা একরূপ নহে। ইষ্টক-প্রস্তরের সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেই বড় গুরু হওয়া যায় না। নানাবিধ বিলাসবহুল ভোগদ্রব্যাদি অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের ক্ষতিকারক নহে, পরন্তু নকল গুরুর তাহা অশোভনীয় ও পরিবর্জ্জনীয়। মায়ামোহিত শিষ্যব্রুব তাহার নকল গুরুদেবের দুর্ব্বলতাকে অপ্রাকৃত লীলা বলিয়া জ্ঞান করিলেও তাহা নির্দ্দোষ অপ্রাকৃত কাম-গন্ধহীন হয় না। এজন্য শাস্ত্রে এরূপ গুরুকেও বর্জ্জন করিতে উপদেশ দৃষ্ট হয়।—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

(বঙ্গানুবাদ—ভোগবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত, মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যপন্থানুগামী ব্যক্তি নাম-মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১।৬২ শ্লোকে এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকে অবশ্য শ্রবণীয় বৈধীভক্তি বলিয়া উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে অধিকার লঙ্ঘন করিবার উপদেশ নাই। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনকারী শ্রোতার অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারীকেও শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা বা শ্রীমতী রাধারাণীর মহিমা শ্রবণ করান না। পারকীয় রসাশ্রিত গোপীদিগের লীলাই সর্ব্বোত্তম হইলেও তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন অনধিকারীর নাই। এম. এ ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তক সর্ব্বোত্তম হইলেও তাহা শিশুপাঠ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই অধিকার বিচারিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে,—

বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞে যদৃচ্ছাক্রমে কবি আদি নবযোগেন্দ্রগণ সমাগত হইলে নিমিরাজ সবিনয়ে প্রার্থনা জানাইলেন,—

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত **যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্**।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাসত্যাত্মানমপ্যজঃ॥

বঙ্গানুবাদ—যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনকে নিজ স্বরূপ (দেহ) পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, তাদৃশ ভাগবত-ধর্ম্ম **যদি আমাদের শ্রবণের অধিকারী** বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহা বর্ণন করুন।

যদিও শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাধিকারীর সুমঙ্গলপ্রদ এবং শ্রোতব্য, তথাপি ভক্তিবৃত্তি ব্যতীত, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-প্রবৃত্তিতে তাহার সম্যক্ সার্থকতা প্রকাশ পায় না। অয়স্কান্ত বা স্ফটিকাদিতে সূর্য্যতেজের যেরূপ প্রতিফলন বা প্রকাশ, মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলাবিনাশাদির অনুশীলন-কারীও সর্ব্বোত্তম অধিকারযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যদ্যপি এই শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা বর্ণনে উক্ত হইয়াছে,—

"সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি।"

অর্থাৎ এই সদ্ধর্ম্ম-অনুরাগীর কথা দূরে থাকুক, দেব-বিশ্বদ্রোহীকেও সদ্য পবিত্র করিয়া থাকে। তথাপি শ্রীগুরুদেব বা ভাগবতবক্তা কখনই তাঁহার প্রিয়তম ও প্রেমাস্পদ বস্তুকে অনধিকারী ব্যক্তিকে প্রদান করেন না। পুত্রসন্তানেরই পিতার হীরকাদি দ্রব্যাদিতে অধিকার থাকিলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ও বালককে পিতা তাঁহার বহুমূল্যের হীরকাদি অলঙ্কারগুলি প্রদান করেন না, সন্তান যখন ঐ মূল্যবান্ অলঙ্কারের মর্য্যাদা ও মূল্যবোধ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহাকে ঐ অলঙ্কারাদি প্রদান করেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে এইরূপ নিষেধ করিয়াছেন।—

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ (১৮ ৬৭)

বঙ্গানুবাদ—তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। তপস্বী হইলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনও ইহা বলিবে না। ভক্ত ও তপস্বী হইলেও শ্রবণেচ্ছু না হইলে ইহা কাহাকেও বলিবে না। আমি ভগবান্ বাসুদেব, আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া আত্মপ্রশংসাদি দোষ আমাতে অধ্যারোপপূর্ব্বক অজ্ঞানবশতঃ যিনি আমার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী, তাহাকেও ইহা বলিবে না। কেবলমাত্র আমার প্রতি অসূয়াশূন্য, তপস্বী, ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই এই গীতাকথ বলিবে।

সুতরাং অনুশীলনকারী বক্তা ও শ্রোতার উভয়েরই অধিকার বিচার একান্ত কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———

গুরুসেবক ও গুরুভোগী

নিখিল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ প্রধান। তন্মধ্যে আদৌ গুরুপাদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা এবং বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস বা প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা—এই তিনটী বিষয় সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। এইজন্য গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে গুরুসেবা ও হরিসেবা যেখানে নাই, সেখানে মঙ্গলের কোন কথা নাই বা থাকিতে পারে না। গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিকী সেবা-বুদ্ধি ও অকপট আনুগত্য থাকিলেই সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের নিত্য মঙ্গলকর উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গুরুসেবোন্মুখতা ব্যতীত জাগতিক দক্ষতা, চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা আত্মকল্যাণ লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। ভগবানের করুণাঘন বিগ্রহরূপে শ্রীগুরু ভক্ত-সাধকের নিকট প্রকটিত হইয়া ভজনরস-ধারায় সাধকের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়কে সুশীতল করত শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রেমসেবা-দানে তাঁহাকে ধন্য করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতের (৭।৭।৩০) "গুরুশুশ্রূষয়া" শ্লোকানুসারে একমাত্র গুরু-শুশ্রূষারূপা ভক্তিদ্বারা ও গুরুর প্রতি সমস্ত লব্ধবস্তুর সমর্পণদ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধান করা সম্ভবপর।

শাস্ত্র বলেন,—গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। কারণ গুরু—আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই। এইজন্য গুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণসেবা স্বতঃই হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশামৃতের মধ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁহার অভিন্নমূর্ত্তি বা প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্য-লাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা গুরুর দাস্য বা সেবা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব বা প্রকৃত শিষ্য, আর বাকী সকলেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা—সোজাকথায় ভোগী হইবার বাসনাযুক্ত।" **ভক্তরাজ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুকে বাদ দিয়া ভগবৎসেবা হয় না, গুরুসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই।** গুরুসেবায় উদাসীন হইলে জড় অহঙ্কার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া চিরদিনের জন্য বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ঐকান্তিকভাবে গুরুসেবা না করিয়া নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিলে মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় থাকে না। গুরুসেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতিশীঘ্র গুরুকৃপা লাভ হয়। গুরু প্রসন্ন হইলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল ও একমাত্র লাভ। অপার্থিব স্নেহ-মমতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ গুরুদেব স্নেহ-প্রীতি বা স্নেহসেবা দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হন বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সেবাই গুরুকৃপা-লাভের অব্যর্থ উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকানুসারে সর্ব্বধর্ম্মের উত্তম ভগবদ্ভক্তিই। কিন্তু তাঁহারও উত্তম অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গসমূহের শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুসেবা। শ্রীগুরুসেবায় ভক্তিসিদ্ধি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রো নৈব বিদ্যতে॥

"শ্রীগুরুসেবা সর্ব্বধর্ম্মের উত্তমেরও উত্তম, তাহা অপেক্ষা অতি পবিত্র পরমধর্ম্ম বিশ্বে আর কিছুই নাই।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের মধ্যে জানাইয়াছেন,—"তস্মাদন্যদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অর্থাৎ "প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবা করিলে অন্য কোন ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না।" শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মধ্যে পাওয়া যায়,—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
কাম-ক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্ট-কারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

"ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবাই সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই। কেবল গুরুসেবাদ্বারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি সবই দূর হয় এবং অনায়াসে ভগবানকে লাভ করা যায়।" আগমেও পাওয়া যায়,—

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

"রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা পারদ-স্পর্শে তাম্র যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কেবল শ্রীগুরুদেবের স্নেহ-সেবাদ্বারাই শিষ্য ভগবানকে লাভ করেন।" শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও শ্রীভাগবতের (১০।৮০।৩৪) টীকায় লিখিয়াছেন,—"জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি।" অর্থাৎ "ভগবজ্-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা জীবের অধিক সেব্য আর কেহ নাই। তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর নাই।" কালীতন্ত্রের মধ্যে শিবজী বলিয়াছেন,—

গুরুমারাধয়েদ্ বিদ্বান্ সর্ব্বকার্য্যার্থ-সিদ্ধয়ে।
গুরুসেবা-প্রসাদেন সর্ব্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ।
অন্যথামঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেন্নরঃ॥

"হে পার্ব্বতী! কল্যাণাকাঙ্ক্ষী শিষ্যমাত্রেই কায়, মন, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন। কারণ গুরুসেবা-প্রভাবে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, নিখিল মঙ্গল লাভ হয়। কিন্তু গুরুসেবার প্রতি উদাসীন হইলে জীবের পদে পদে অমঙ্গল হইয়া থাকে।" শ্রীভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

নাহমিজ্যা-প্রজাপতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
ত্যুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরু-শুশ্রূষয়া যথা॥

"আমি গুরুসেবার দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম বা অন্য কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।" শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

"যে ব্যক্তি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধনদ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন।" এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলকর কার্য্য আর নাই। সকলের আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা

গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি ও বিশ্বাস সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে বল আসে না। আমরা আশ্রিত, গুরু আমাদের রক্ষক ও পালক—এই বিচার আসে না।"

গুরুসেবাই যাঁহার জীবন, ভূষণ ও সত্তা, তিনিই প্রকৃত গুরুসেবক

গুরুসেবকের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। তিনি গুরু ছাড়া কিছুই জানেন না বলিয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয় তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও বাস্তব-সত্য গুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত যথেচ্ছচারিতায় জীবনের অপব্যবহার করেন না বলিয়া গুরুসেবক কখনও জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন না। যিনি শ্রীগুরুদেবের অন্তরের অভীষ্টানুসারে সেবা করেন তিনিই প্রকৃত শিষ্য এবং তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ বলিয়া শ্রীগুরুর হৃদয় তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হয়। **প্রকৃত শিষ্য জানেন,—"শ্রীগুরুদেব সাংসারিক লোক নহেন, সুতরাং তাঁহাকে সংসারের কোন দ্রব্য দিয়া বশ করা যায় না। তিনি কেবল সেবারই বশ।"** শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ৩।২৪।১৩ টীকাতে লিখিয়াছেন,—**"নিজের অযোগ্যতা বা সামর্থ্যের বিচার না করিয়া আদেশমাত্র নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা পালন-পূর্ব্বক কায়-মনো-বাক্যে তদীয় সুখবিধানই গুরুভক্তি বা গুরুসেবা।"** গুরুদেব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। অতএব গুরুসেবার অর্থ,—তাঁহাকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা। তাই গুরুসেবক গুরুসেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া অসুবিধার সৃষ্টি করেন না। **কপটী ও অহংকারী ব্যক্তি গুরুসেবার অভিনয় করিয়াও যেক্ষেত্রে কোটিজন্মেও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, সেইক্ষেত্রে গুরুনিষ্ঠ সেবক গুরুসেবাদ্বারা একজন্মেই ভগবানকে লাভ করেন।**

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ২০৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ" অর্থাৎ গুরুসেবাই ভগবানকে একমাত্র পাওয়ার উপায়। এইজন্য নিষ্কপট ভক্তগণ প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া থাকেন। গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণ গুরুসেবাদ্বারা একজন্মেই ভগবানকে লাভ করেন। কিন্তু যাহারা কপটী ও অহংকারী তাহারা গুরুসেবার অভিনয় করিয়াও ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে না।" এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও বলিয়াছেন,—**"গুরু অপেক্ষা**

অধিক সেব্য বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই, তজ্জন্য গুরুই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেবনীয়, চিন্তনীয় ও কীর্ত্তনীয়। কারণ গুরুকৃপা ও গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে না। তাই গুরুনিষ্ঠ স্নিগ্ধ ভক্তগণ সুদৃঢ় বিশ্বাস, আদর ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া গুরুকৃষ্ণের সুখবিধান করিয়া থাকেন। গুরু-সেবকগণ গুরুচিন্তায় তন্ময় থাকিয়া কি ভজনে, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, কি সর্ব্বকালে অর্থাৎ জীবনে-মরণে, সম্পদে-বিপদে, দূরে-নিকটে, দিনে-রাত্রে, প্রভাতে-সন্ধ্যায়, সংকীর্ত্তনে, মহাপ্রসাদ সেবনে, বিশ্রামে, সর্ব্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুসেবা করিয়া থাকেন।"

উপমন্যু ও সত্যকামের দ্বারা গুরুসেবকের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক নিষ্কপট ব্যক্তিই তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকেন। **প্রকৃত গুরুসেবক গুরুর কোন বস্তুকে ভোগ করেন না, সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম।** তিনি 'শিক্ষককে অঙ্ক কষিয়া দেওয়ার' ন্যায়' গুরুসেবার দ্বারা গুরুরই উপকার হইতেছে, তাহার কিছু লাভ হইতেছে না' এই দুর্বুদ্ধি প্রকাশ করেন না। গুরুদেবের আদেশ যতই কঠোর ও তীব্র হউক না কেন, গুরুসেবক অবিচলিত-চিত্তে সন্তোষের সহিত তাহা পালন করেন। গুরুসেবা করিতে করিতে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক, প্রাণও যদি বিনষ্ট হয়, তাহাও তিনি আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন। সরল, নিষ্কপট, গুরু-সেবারত ব্যক্তিই অপরের মঙ্গল করিতে পারেন।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ "শিষ্যক্রবের গুরুসেবা ও হরিভজন"-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"স্নিগ্ধশিষ্য জানেন, মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাই, ঐকান্তিক গুরুসেবাদ্বারাই উহা লাভ হইয়া থাকে। তাই তিনি গুরুসেবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তিনি জানেন, গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। নিজে নিজে ভগবৎসেবা হয় না, তজ্জন্য গুরুর আনুগত্যেই তিনি কৃষ্ণসেবা করেন। কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে গুরুপাদপদ্মকে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। তিনি সেবার দ্বারাই গুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ সেবা-তৎপরতাই নিষ্কপট শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। তিনি গুরুসেবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট পার্থিব ধন-জন-বৈভবাদি কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নয়। গুরুই তাঁহার হিতকারী বন্ধু, তিনিই তাহার রক্ষাকর্ত্তা, জীবন, ধন ও সর্ব্বস্ব।" (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

———

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯০ পৃষ্ঠার পর]

জীবগণের সত্তা যে নিত্য বর্ত্তমান তা'র প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে ;—যথা—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥" (গীতা ২।১২)

অর্থাৎ—"আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান বুঝাবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনকে বল্‌ছেন—আমি—পরমাত্মা ইতঃপূর্ব্বে কখনও ছিলাম না ইহা কিন্তু নহে, তুমি অর্জ্জুন কখনও ছিলে না, ইহা নহে। এই নরপতিগণ কখনও ছিলেন না, ইহা নহে। ইহার পর আমি, তুমি বা এই নরপতিগণ আমরা সকলে থাকব না, তাও নয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই নিত্য, সুতরাং শোকাতীত।" ইহাতে ভগবানের বিশেষ বক্তব্য এই—আমরা সকলে নিত্যকাল আছি ও নিত্যকাল থাক্‌ব। আমার সত্তা ত্রিকাল-সত্য, জীবগণের সত্তাও ত্রিকাল-সত্য। অতএব জীবাত্মা যে মৎস্বরূপ তা'র পরিচয় এইভাবে পেয়ে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ জীবের স্বভাব—সে জান্‌তে চায় অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা তা'র বর্ত্তমান। জীবের মধ্যে দুইটী সত্তা আছে,—একটী জড়সত্তা এবং অন্যটী চিৎসত্তা। জড়সত্তা যথা—দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আর চিৎসত্তা—জীবাত্মা। জীব চেতন বলেই সে মৃত্যুকালেও নিজের সত্তাকে ধরে রাখ্‌তে চায়। জীবের দেহটা জড় বা অচেতন হলেও চেতন বস্তু জীবাত্মার উপস্থিতিতে দেহটা চেতনের মত ব্যবহার করে। চেতন-বস্তু আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ জড়বৎ পড়ে থাকে। তাই জীব স্বরূপতঃ চিৎবস্তু—ইহা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমরা সর্ব্বদাই চেতনের সঙ্গ কামনা করি। জড়বস্তুর কোন কামনা-বাসনা থাকতে পারে না। চেতন বস্তু কখনও চেতনের সঙ্গছাড়া সুখী হ'তে পারে না। যদি এ পৃথিবীতে আমার কোনও আত্মীয়-স্বজন না থাক্‌তো, কিংবা একটা মানুষও বা একটা প্রাণীও না থাক্‌তো ; তা'হলে আমি একা জীবিত থেকে প্রচুর টাকা-কড়ি, নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার, বিশাল অট্টালিকা, বহু সুন্দর সুন্দর মোটর, উড়োজাহাজ, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ, নানারকম উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য প্রভৃতি পেয়েও কি সুখী হ'তে পারতাম? নিশ্চয়ই তা'তে সুখী হ'তাম না। সুতরাং জড়বস্তু পেয়েও সুখী হওয়া যায় না।

আবার চেতনের সঙ্গেই যদি আমাদের সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তবে অতুল ঐশ্বর্য্য, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদি জড়বস্তুর দিকে আমাদের আকর্ষণ কেন? চেতনের সঙ্গে যা'তে আরও বেশী করে মেলামেশা করা যায়, সেজন্য জড় বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি প্রভৃতি আমরা কামনা করে থাকি। আমার সুন্দর বাড়ী দেখ্‌বার জন্য যদি কোন মানুষ না থাকে, তা'হলে সুন্দর বাড়ী তৈরী করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকে? আমার সুন্দর পোষাক দেখ্‌বার জন্য কোন মানুষ যদি না থাকে, তা'হলে কি সুন্দর পোষাক পরবার ইচ্ছা জাগ্‌বে? আমরা চিৎস্বরূপ বলেই চেতন-বস্তুর সঙ্গ চাই ও স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা পোষণ করি। তবে জীব চেতনধর্ম্মী হ'লেও সমস্ত জীবের চেতনতার প্রকাশ সমান নয়।

জীবের চেতনার ক্রমবিকাশ অনুসারে চেতনের বিভিন্নস্তর নির্নীত হয়েছে। যথা—আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণ বিকচিত-চেতন। আচ্ছাদিত-চেতন জীব জড়গুণে এত বেশী অভিনিবিষ্ট যে তা'দের চেতনধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়; যেমন—বৃক্ষ, তৃণ, প্রস্তর-গতিপ্রাপ্ত জীব ইত্যাদি। কোন কোন জীব বিশেষ অপরাধবশতঃ আচ্ছাদিত চেতন-স্বরূপ স্থাবর যোনিও প্রাপ্ত হয় এবং ভগবৎকৃপায় অপরাধ হ'তে মুক্ত হয়ে সদ্‌গতি লাভ করে;—এ রকম উদাহরণ শাস্ত্রের বহুস্থানে উল্লিখিত আছে; যেমন—যমলার্জ্জুন বৃক্ষ, অহল্যার পাষাণ-দেহপ্রাপ্তি প্রভৃতি।

পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্কুচিত-চেতন। আচ্ছাদিত-চেতনের চেতনত্ব প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু সঙ্কুচিত চেতনের চেতনতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পায়। এরা আহার করে, নিদ্রা যায়, ভয় পায়, ইচ্ছাপূর্ব্বক এক স্থান হ'তে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। এদের ক্রোধ আছে, নিজের খাদ্যাদি সম্পর্কে বোধ আছে—এরূপ কিছু কিছু বোধ-শক্তি ও অনুভব-শক্তি এদের মধ্যে দেখা যায়। প্রাকৃত মনুষ্য-দেহের তিনটী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়; যথা—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণ বিকচিত-চেতন। যা'রা ঈশ্বর স্বীকার করে না, কিন্তু নীতি মেনে চলে, অথবা যা'রা নীতি মানে না—তা'রা উভয়েই মুকুলিত-চেতন। যা'রা নীতির সহিত ঈশ্বর বিশ্বাস করে ও যারা শাস্ত্র-বিধি-নিষেধ মেনে সাধন-ভজন করে—এরূপ সাধক-ভক্তগণ বিকচিত-চেতন। আর যা'রা শাস্ত্র-বিধি-নিষেধের অপেক্ষা না করে একমাত্র ঈশ্বরে রুচি-বিশিষ্ট ও একটু রাগ-প্রাপ্ত—এইরূপ ভাবভক্ত মানুষই পূর্ণবিকচিত চেতন। অতএব জীব-সত্তা যে চৈতন্যজ্ঞান-স্বরূপ ও স্বাধীন ইচ্ছানুরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট, তাহা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীল জীবগোস্বামিধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভে ১৯শ সংখ্যায় শ্রীজামাতৃমুনি-প্রদর্শিত পাদ্মোত্তর-বচন, যথাঃ—

"জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ-স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥"

অর্থাৎ—"জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন, অপ্রাকৃত, জড়দেহ লাভ করলেও তার জন্ম বা বিকার নাই, স্বরূপতঃ একরূপ-বিশিষ্ট, অণু অর্থাৎ জড় পরমাণু হ'তেও সূক্ষ্ম, জড়দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিভাবাপন্ন, চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ অর্থাৎ 'আমি' শব্দবাচ্য, ক্ষেত্রী অর্থাৎ জড়দেহরূপ ক্ষেত্রাধিপতি, বিভিন্নরূপ অর্থাৎ ভগবান্ হ'তে পৃথক্ এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বর্ত্তমান।" শ্রীমদ্-বাদিরাজতীর্থ-স্বামিপাদকৃত "যুক্তিমল্লিকা-গুণসৌরভ"-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—

"সুখরূপাশ্চ তে সর্ব্বে জ্ঞানরূপাশ্চ সর্ব্বদা।
অনাদি নিত্যাঃ সত্যাশ্চ চিদ্রূপাবয়বা যতঃ ॥"

অর্থাৎ—"যেহেতু জীব চিন্ময় অবয়ববিশিষ্ট, সেজন্য তারা সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞানরূপী এবং অনাদি নিত্য-সত্য-বস্তু।"

জীবাত্মা অণুচেতন-ধর্ম্মযুক্ত হয়ে সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত থাকে, তার প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥" (গীতা ১৩।৩৪)

অর্থাৎ—"হে ভারত, যেরূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে থাকে।"

এ প্রসঙ্গে বেদান্ত-প্রমাণ, যথা—"গুণাদ্বালোকবৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২৬) অর্থাৎ —একটী দীপের আলোক যেমন কোন গৃহের একস্থানে অবস্থান করে সমগ্র গৃহটিকে আলোকিত করে, তেমনি জীবাত্মা চেতয়িতৃত্ব লক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের মত সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এবম্বিধ বহুশাস্ত্র-প্রমাণে জীবের চেতয়িতৃত্ব-ধর্ম্ম নিশ্চিতরূপে জানা যায়।

তৃতীয়তঃ জীবের আর এক স্বভাব যে, জীবমাত্রেই আনন্দের মধ্যে থাকতে চায়। দুঃখের মধ্যে কেউই যেতে চায় না। বিষ্ঠার কীট হ'তে আরম্ভ করে সর্ব্বোন্নত জীব পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে আনন্দ পেতে চায়। যে-বৃক্ষটি অন্ধকারে আছে, সেও আলোকের দিকে শাখা প্রসারিত করে দিয়ে

আনন্দ পেতে চায়। জীবের যা' কিছু চাহিদা সবই আনন্দ পাওয়ার জন্য। কেউ গুণবতী, রূপবতী স্ত্রী চায়, কেউ রূপবান্, গুণবান্, প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির অধিকারী স্বামী চায়, কেউ সুন্দর মেধাবী পুত্র চায়, কেউ ভাল উচ্চ মাহিনার চাকুরী চায়, কেউ বড় বড় অট্টালিকা ও বহু গাড়ীর মালিক হ'তে চায়, কেউ উচ্চপদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন প্রভাবশালী নেতা হ'তে চায়,—এইরূপ কামনা-বাসনার মূলে আনন্দ পাওয়ার আশা। এই আনন্দগুলি সমস্তই জড়ীয় ভৌতিক সত্তাতে থাকায় এগুলি ক্ষণিক ও বিনাশশীল। চেতন বস্তু জীবাত্মা এই জড় দেহটার মধ্যে থা'কায় দেহটা চেতনের সংস্পর্শে ভৌতিক আনন্দের দিকে ধাবিত হয় ও আনন্দের অনুশীলন করে। চেতন আত্মার অভাবে দেহটা অসৎ, অচেতন ও নিরানন্দময় হ'য়ে থাকে। অচেতন দেহের আনন্দ অনুশীলনের শক্তি নেই। পিতা-পুত্রের বাৎসল্য, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য, ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহ-মমতা ততক্ষণই শোভা পায় ও পরস্পরকে আনন্দ দেয়, যতক্ষণ তা'দের দেহে চেতনা থাকে। দেহের মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট আছে বলেই একজন অন্যজনকে ভালবাসতে পারে এবং প্রীতির আদান-প্রদান করতে পারে। বাজারে চায়ের দোকানে যারা চা খায়, তারা চায়ের মাটির ভাঁড় যতক্ষণ গরম থাকে ও চা খাওয়া শেষ না হয়, ততক্ষণই তারা মাটির ভাঁড়টাকে আদর করে। কিন্তু চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে মাটির ভাঁড়টাকে অপ্রয়োজনবোধে ছুড়ে ফেলে দেয়।

তদ্রূপ যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে, ততক্ষণই দেহটার আদর; আত্মার কাজ সম্পূর্ণ হ'লে যখন আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, তখন অচেতন দেহটাকে কেউ আদর করে না বা তা'কে নিয়ে কেউ আনন্দ-চর্চ্চা করে না। কোনও মৃত মহিলার দেহে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণালঙ্কার পরালেও আনন্দ পাওয়া যায় না। যেখানে চেতনের অস্তিত্ব আছে, সেখানেই আনন্দ আছে। "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ"—(গীতা ২।৫৫)—'আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা জীব তুষ্ট হয়।' আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ। আত্মা ব্যতীত দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির কোন কর্ম্মক্ষমতা থাকে না। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ একত্রিত হ'লেও আত্মা ব্যতীত তাহা জীবন্ত হ'তে পারে না। প্রীতির অনুশীলন করা বা আনন্দের চর্চ্চা করা চেতনের ধর্ম্ম;—অচেতন পদার্থের কোন আনন্দবোধ থাকে না। অতএব আত্মাই দেহের মধ্যে অবস্থান করে সকল প্রকার অনুশীলনের প্রেরণা-দাতারূপে কার্য্য করে।

জড় বিষয়ভোগের আনন্দ জীবকে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধে জীবের কাছে জড়দেহ ও দৈহিক বস্তুগুলি প্রিয় হয়েছে। জীবমাত্রেই

প্রীতির বশীভূত। দেহে আত্মা আছে বলেই দেহটা এত প্রীতির বস্তু বা আনন্দের বস্তু হয়েছে। অতএব চেতন আত্মাই আমাদের কাছে প্রিয়। চেতন আত্মা ব্যতীত জড় দেহটা আমাদের কাছে প্রিয় হয় না। ভালবাসা চাওয়া বা আনন্দ চাওয়া চেতন বস্তু জীবাত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম। এমতে আমরা যুক্তির মাধ্যমে ও শাস্ত্রবাণী-দৃষ্টে বুঝতে পারি যে, আত্মাই জীবের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির পরিচালকরূপে দেহে অবস্থান করে দেহকে জীবিত রাখে এবং আত্মা স্থূল জড় বা সূক্ষ্ম জড়—কোনটিই নয়, পরন্তু সৎ-চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।

জীব সচ্চিদানন্দ হ'লেও আদৌ পূর্ণ নহে, পরন্তু অণুমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে জীবাত্মা যে অণুচৈতন্যস্বরূপ, তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।—

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ"॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২৬ শ্রুতিস্তব ব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক

অর্থাৎ—"কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করলে তার শতাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ। জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীগুরু-বন্দনা

পৌষী-কৃষ্ণ-নবমীতে
তাপদগ্ধ ধরণীতে
এক মহাজন।
সত্যকে আশ্রয় ক'রে
কল্যাণের পথ ধরে
আবির্ভূত হন॥
তেরশো আটাশ সাল
আট পৌষের সকাল
আট ঘটিকায়।
শুক্রবার মহাদরে
সুন্দর পবিত্র ঘরে
সৌন্দর্য্য ছড়ায়॥

জ্ঞানী, গুণী, সাধুজন
দেখে আকর্ষিত হন
আচারে-বিচারে।
লক্ষণাদি ছিল মিষ্টি
যেন বিধাতার সৃষ্টি
বিশিষ্ট আকারে॥
রূপে যিনি রূপবান্
গঠনেতে সু-মহান
বিবিধের মাঝে।
মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে
গুরুর আশীষ ল'য়ে
বিভূতিতে 'রাজে॥

শৈশবের ক্রিয়া-কর্ম্ম
পারমার্থিকের ধর্ম্ম
বড়ই মধুর।
মাতৃদেবী সু-লক্ষণা
খাদহীন খাঁটি সোনা
ধর্ম্মে ভরপুর॥
বাল্যকাল ও কৈশোর
সেবাধর্ম্মে ছিল ভোর
ন্যায়পরায়ণ।
বয়ঃবৃদ্ধি মাঝখানে
অন্তরে দৃঢ়তা আনে
অতি সু-লক্ষণ॥
সময়ে বৈরাগ্য আসে
তুচ্ছতায় সব ভাসে
যা' কিছু অলীক।
হৃদয়ে আশ্রয় লয়
সর্ব্বাপেক্ষা মধুময়
প্রাণের অধিক॥
জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে
প্রশান্ত হৃদয়-পটে
অতীব গভীরে।
চেতনা জাগ্রত হয়
সব হয় গৌরময়
অতি ধীরে ধীরে॥
গৈরিক বসন ধরি'
মুখে শুধু 'হরি হরি'
সহাস্য বদন।
পূর্ব্বাশ্রম নাহি রয়
আলোয় আলোকময়
হন "সৎজন॥"

গৌরধর্ম্ম রীতি-নীতি
সর্ব্বজনে প্রেম-প্রীতি
স্নেহ-ভালবাসা।
সকলেরে কাছে আনে
সৎ আচারের টানে
হৃদে বাঁধে বাসা॥
গুরুদেব শ্রীকেশব
ছিলেন প্রধান, সব
তাঁর-ই ইচ্ছায়।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে
ত্রিদণ্ড সহস্তে ধরে
নিত্য শোভা পায়॥
কলিযুগে শ্রীবামন
মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হন
গুরুর আদেশে।
'মঠে'-র অধ্যক্ষ হন
সবাই হয় আপন
সুষ্ঠ পরিবেশে॥
মঠাদির শ্রীবৃদ্ধিতে
নূতন মঠ সৃষ্টিতে
যাঁ'র অবদান।
স্মরণীয় হ'য়ে আছে
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কাছে
মহা মূল্যবান্॥
ধর্ম্ম-গ্রন্থ সু-মুদ্রণে
তার নব রূপায়নে
নূতন পন্থায়।
শিষ্য ও ভক্তের দল
হয়ত' প্রাণচঞ্চল
পরম শ্রদ্ধায়॥

মঠাদি সংরক্ষণে
সু-প্রচার অভিযানে
বিজ্ঞতার রূপ।
সত্যনিষ্ঠ প্রেরণায়
তত্ত্বসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায়
অতি অপরূপ॥
মহারাজের বক্তৃতা
অগণিত ভক্ত, শ্রোতা
মহা সমাদরে।
দূরকে নিকটে টানে
সকলেরে কাছে আনে
অন্তরে বাহিরে॥
ভাষণের তত্ত্ব, তথ্য
দানে সদা নূতনত্ব
অপূর্ব্বতা আনে।
মন বিগলিত করে
নয়নেতে জল ঝরে
নিত্যের সন্ধানে॥
গৌড়ীয় গগনমাঝ
'বেদান্ত সমিতি' আজ
প্রিয় অতিশয়।
দিকে দিকে ওঠে ধ্বনি
দূর হ'তে সদা শুনি
'গুরুজী'-র জয়॥
হরিনামের মহিমা
ছাড়িয়ে গিয়েছে সীমা
স্বপ্নের বাহিরে।
সব আজ একাকার
বাকী কোথা নাহি আর
বিশ্ব চরাচরে॥

'গুরুদেবে' গুরুভক্তি
সু-বিদিত তার শক্তি
জেনেছে যে-জন।
জীবন সার্থক তা'র
হবে না-কো পুনর্ব্বার
হেথা আগমন॥
গুরুদেবের আদেশ
পালনেতে সবিশেষ
যিনি তৎপর।
তা'রে ভোলা নাহি যায়
সকাল আর সন্ধ্যায়
মহাশক্তিধর॥
'নরহরি' তোরণেতে
একবার প্রবেশেতে
মন শুদ্ধ হয়।
'দেবানন্দ মঠে' গেলে
অপার্থিব বস্তু মেলে
ভক্তি উপজয়॥
'গুরুর সমাধিস্থল'
করেছেন সমুজ্জ্বল
অসীম শ্রদ্ধায়।
সাথে ছিল অনেকেই
কেহ আছে, কেহ নেই
এই দুনিয়ায়॥
মন্দিরটি পরিচ্ছন্ন
বিগ্রহাদি সু-প্রসন্ন
মনোমুগ্ধকর।
শ্রীকেশব—প্রতিষ্ঠাতা
অন্ধজনে চক্ষুদাতা
করুণাপ্রবর॥

দ্বিতলেতে অধ্যক্ষের
সুন্দর দু'টী কক্ষের
সাজ ও সজ্জায়।
প্রীতিকর হ'য়ে আছে
যাত্রীসাধারণ-কাছে
শুদ্ধ শুচিতায়॥
সভাপতি ও আচার্য্য
করেন কল্যাণ কার্য্য
জীবের কল্যাণে।
সাধন-ভজন স্তরে
কৃপাবিন্দু দান করে
শাস্ত্রের বিধানে॥
সর্ব্বত্র শ্রীকেশবের
তথ্যপূর্ণ জীবনের
যিনি রচয়িতা।
তিনি মঠের প্রধান
অতি মহা জ্ঞানবান্
মহত্তর পিতা॥
বছর বছর ধরে
উৎসবাদি চলে জোরে
গুরুর কৃপায়।
কে কোথা আছিস্ ওরে
দিনমণি যায় যে-রে
আয় ছুটে আয়॥

নবদ্বীপের এ-স্থান
জীবে দানে পরিত্রাণ
জটিলতা হ'তে।
ভেসে চলে দূরান্তরে
ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে
অমৃতের স্রোতে॥
শ্রীবামন মহারাজ
আবির্ভূত হন আজ
মঙ্গলের জন্য।
অন্ধকারে আলোদাতা
কলিযুগ-জীবত্রাতা
সবার বরেণ্য॥
গুরুপাদপদ্ম-তলে
রাখো পুষ্প দলে দলে
ভক্তিসহকারে।
বলো, গুরু তুমি সত্য
বিশ্ব চরাচরে নিত্য
মুক্তি পারাপারে॥
আমরা ভজনহীন
দীনাপেক্ষা অতি দীন
অতি অভাজন।
জীবনে অন্তিম ক্ষণে
থাকে যেন সু-স্মরণে
তোমার চরণ॥

—**শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ,** সেবাসুহৃদ্
সাংবাদিক পি. টি. আই.

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৪ পৃষ্ঠার পর]

একটা অভ্যাসযোগ—মনটাকে সবসময় **engagement** দিতে হবে, চাকরী দিতে হবে। যখনই সে নিশ্চিন্তভাবে থাকবে কোন চাকরী ছাড়া, কোন কাজ ছাড়া, তখনই সে উল্টোপাল্টা করবে। কেননা, এটা বদ্ধমনের ধর্ম্ম। সেজন্য তাকে কাজ দিতে হবে সবসময়, **engagement** দিয়ে রাখতে হবে। **Engagement** যদি দেবে ত' ভাল কাজ দেবে, তাকে ভগবৎ-সম্পর্কিত কাজ দেবে, আত্মোন্নতিসূচক কাজ দেবে তাকে। সেই কাজে তাকে নিযুক্ত রাখবে, তাহলে ভাল হবে।

হরিনাম করছি আমি, হরিনাম করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এক্ষেত্রে নাম-অপরাধ হবে।

নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণকর্ত্তা বলেন প্রমাদ॥

নামাপরাধের মধ্যে রয়েছে এটা। তাহলে ভগবৎসম্পর্কীয় কাজ, শ্রদ্ধা-ভক্তি-মূলক কাজ তাকে দিতে হবে। আহ্নিক করতে বসলাম, পৈতা ধরে আছি, মনটা কলকাতা, বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ সব ঘুরে চলে এল। পৈতা কিন্তু হাতে ধরাই আছে। মুস্কিল, অন্যমনস্ক ভাব—অনবধান। মনকে **control** করতে হবে। কিভাবে?—মনকে কাজ দিয়ে। দুষ্টু ছেলে সবসময় দুষ্টুমি করছে, এটা ধরছে, ওটা ভাঙছে, একটা খেলনা দিয়ে দেন, চুপচাপ বসে থাকবে। মনকে ওরকম কাজ দিতে হবে। শাস্ত্রে এ উপদেশ কেন?—শাস্ত্রেই বুঝিয়েছেন মনটা যখন ফাঁকা থাকে, তখন আসল কাজ ফেলে সে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'**A vacant mind is the devil's workshop**'—শূন্য মন শয়তানের বাসা। সেইজন্য যদি তাকে কাজ দিতে হয় তাহলে ভাল কাজ দেব, ভগবচ্চিন্তা করতে অবসর দেব। হরিনাম করছি, করতে করতে ঘুম আসছে, দাঁড়িয়ে বা চলাফেরা করতে করতে হরিনাম করতে হবে। তাহলে ঘুমটা আর আসবে না। আবার ওটাকে রেখে দিয়ে হাতের কাজ কিছু করা যাক্। আমি ত' ভগবানের সংসারে আছি। ভগবানের সংসারে আমার প্রতিজ্ঞা—আমি সবটা ভগবানের প্রীতিকামনায় করব, তখন হাতে কিছু সেবাকাজ আরম্ভ করলাম, ঘুম ছেড়ে গেল, আবার নাম করতে আরম্ভ করলাম।

মা-যশোদা তিনি রাজরাণী, তাঁর ত' দাসদাসী অনেক। ছেলেটা পরের বাড়ীতে চুরি করে খাচ্ছে। 'মাখনচোর মুরারি'। বহুরকম নালিশ আসছে, কিন্তু

কোন নালিশই বিশ্বাস করতে পারছেন না মা। আমার গোপাল ত' আমার কাছে শুয়ে থাকে সবসময়, চুরি করে কখন! এরা আমার ছেলেটাকে দেখতে পারে না, তাই সবসময় নালিশ করে। আসলে ছেলেটা কিন্তু ওরকম দুষ্টু। ওরা মিথ্যা কথা বলে না, ঠিক কথা বলে, কিন্তু মা-যশোদা বুঝে উঠতে পারেন না। পরে এমন সব নালিশ আসতে লাগল, মা-যশোদাকে একটু বিশ্বাস করতেই হল যে, এসব দুষ্টুমী করে ছেলে। যেই মা ভোরবেলায় উঠে চলে যায়, গোপাল তখন সুড় সুড় করে বেরিয়ে পড়ে। পাশের ঘরে ঘর্ ঘর্ করে দধিমন্থন আরম্ভ হয়ে গেছে, গিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছে সেখানে। গোপালের গায়ে প্রচুর গয়নাগাটি লাগান আছে। এত বহু মূল্যবান্ গয়না আছে যে রাতের অন্ধকারেও সব দেখা যাবে। আবার কতকগুলো গয়না আছে রুণুঝুনু আওয়াজ করে। সেগুলোকে চেপে ধরেছে, শয়তান ত'। দেখছে কোন্ ঘরে দধিমন্থন হচ্ছে। প্রদীপ জ্বলছে, ফু দিয়ে নিভিয়ে দিল। আগে দেখে নিয়েছে ঘরের কোথায় কি আছে। পরে মাখন নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। চোর, চোর, ধর, ধর। এই চুপ, খবরদার, কিছু বলবে না, বললে আরও বেশী উৎপাত করব। ব্যাপার-গুলো কি? যেখানে কিছু পাচ্ছে না, সেখানে দোলনায় শোয়ানো বাচ্চাকে চিম্‌টি কেটে দিল। বাচ্চাটা চিৎকার করতে লাগল, আর গোপাল দৌড়ে পালাল। কোন গৃহস্থের বাড়ীর উঠানের গাছ-গাছালি গোড়া থেকে উপড়ে দিয়ে, কেটে দিয়ে চলে এল। এইরকম ধরণের নালিশের পর নালিশ আসছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেন না মা-যশোদা। এমন অবস্থা হল শেষ পর্য্যন্ত, তখন মনে করলেন, বোধ হয় আমার গোপাল কিছু কিছু এরকম উৎপাত করছে। তা না হলে এরা মিথ্যা কেন বলবে এসব। সমস্ত দাস-দাসী—যারা দধিমন্থন-কাজ করছিল তাদেরকে বললেন, এবার থেকে ঐ কাজগুলো আমিই করব। আমার ঘরে এত খাবার, ছেলে ঘরে খায় না, পরের ঘরে চুরি করে খায় ননী, মাখন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! দাস-দাসীরা কাজ করে ত', যত্ন করে হয়ত' করে না, সেইজন্য খায় না। তখন তিনি নিজেই কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ—দধিমন্থন করতে বসলেন। দধিমন্থন যখন করছিলেন তখন তাঁর মুখটা কিন্তু বন্ধ ছিল না, ভগবানের বাল্যলীলাকথা গান করে যাচ্ছেন তিনি।—

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি॥
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত॥

'হাতে কর কাম, মুখে কর নাম।' হাতে যে কাজটা সেটা সেবাকাজ, আর মুখে যে নাম সেটাও সেবাকাজ। কিন্তু দুটোই একসঙ্গে করতে হবে। অনেকে আমাদের আজকাল প্রশ্ন করেন,—আমি যদি শুধু সেবাকাজ করি, হরিনাম না করি? না, তা চলবে না, হরিনামও করতে হবে (সংখ্যানাম), আবার নির্দ্দিষ্ট সেবাকাজও করতে হবে। ওটা ছেড়ে এটা, এটা ছেড়ে ওটা, তা নয়। ওই নাম এবং সেবা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটা করলে হবে না, দুটোই করতে হবে। সংখ্যানাম যা আছে সেটা করতেই হবে। তার ভিতরে আবার বিভিন্ন সেবাগুলো করতে হবে। এ সংসারটা এমনই, এ সংসার সময় দেয় না আমাদের কাকেও। সময় বের করে নিতে হবে আমাকেই। আমার গুরুদেবের কাছে আমি ব্যাখ্যা শুনেছিলাম—সংসারটা কিরকম? বললেন, সংসারে কেউ কখনও সময় দেয় না। কিরকম? 'তোর হাড় খাব, তোর মাস খাব, তোর চামড়া দিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাব।'—এই হল সংসারের স্বরূপ। সংসার ত' কখনও অবসর দেয় না আমাকে। আমি খেটে খেটে মরে গেলেও কেউ বলে না যে, আমি তোমার কাজের জন্য কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। বরং সমালোচনা এত করার পরেও। তাহলে সেই সংসারের লোকের কাছে আমি সময়ের আশা করি কেন? আশা করা বৃথা। যদি সাধন-ভজন, নাম-ভজন, সেবাকাজ করতে হয়, ঠাকুরের সেবাপূজা করতে হয়, তাহলে সময় বের করতেই হবে আমাকে। **Routined life** দরকার। **Routine** ছাড়া চলবে না। তা না হলে সময় বের হবে না। সব জিনিষটা নিয়ে চলতে হবে আমাদের।

হরিনাম করতে হবে, সেবাকাজও করতে হবে, শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করতে হবে, পাঁচজন লোক এলে তাঁদের আদর-যত্নও করতে হবে। কোন্‌টা ছাড়ব আমি? সব কাজগুলো করতে হবে আমাকে, কিন্তু সময়-অনুসারে। এটাই ত' নিয়ম। জগতে কেউ আমাকে সময় দেয় না, আবার সময় কিন্তু ঠিক চলে যায়, বয়ে যায়। **"Time and tide wait for none."** সমুদ্রের তরঙ্গ ঠিক চলে যায়, সময়ও চলে যায়। যদি চলেই যায়—চলমান বস্তুকে ধরে রাখতে হবে তার সদ্ব্যবহার করে—**best utilise** করে। একথা সব জায়গায় লেখা আছে।

"এ ধন, যৌবন,　　পুত্র-পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদল-জল,　　জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥"

"দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায় সম্পদ বল্, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর॥"

সাধু-মহাজন-বাণীতে রয়েছে একথা। আমরা সবাই বলছি—আরে, ঢের ঢের সময় রয়েছে, এখন সংসারে কিছু ভোগসুখ কর। যখন বুড়া থুড়্থুড়া হয়ে যাবে, তখন ওসব ধর্ম্ম-কর্ম্ম। বলি,—কিরকম বুড়া থুড়্থুড়া ?—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥"
"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানবঃ তব সন্তোষ॥"
"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াত-স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে ?
কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে ??

—তত্ত্বজিজ্ঞাসাসূচক এসব কথাগুলো চিন্তা করতে হবে। এ প্রশ্ন হৃদয়ে রাখতে হবে, এর উত্তরও পাওয়া চাই। সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হতে হবে, সময় নাই। নীতিশাস্ত্রে একটী শ্লোক পড়েছিলাম—খুব সুন্দর কথা।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

আমি যখন লেখাপড়া করব, বিদ্যার্জ্জন করব, টাকা-পয়সা রোজগার করব, সে-সময় ভাবতে হবে আমি অজর, অমর। তা না হলে চলবে না। আর যখন ধর্ম্মাচরণ করব তখন ভাবতে হবে—আর সময় নাই, সময় নাই। মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করে রয়েছে।

এ ভাব না থাকলে ধর্ম্মাচরণ হবে না। এটা দুর্ব্বলতা নয়। অনেকে বলছেন, এটা দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা দুরকমের। সাধন-ভজনহীন ব্যক্তির দুর্ব্বলতা—ভগবচ্চিন্তা না করা, ভগবৎ-ধ্যান-ধারণা না রাখা। আর হরিভজন করা, সৎপথে এগিয়ে চলা, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, ভজনে ঠিক ঠিকভাবে সময়টার সদ্ব্যবহার করা — এটা দুর্ব্বলতা নয়, সৎসাহসিকতা।

ধর্ম্মের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে কি আজকাল ?—'ভয়ে ভক্তি', আমরা ধর্ম্মাচরণ করি ভয়ে। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন,—সবথেকে যাঁদের চরম সৎসাহস আছে,

তাঁরাই সাধন-ভজন পথে অগ্রসর হতে পারেন, সাধন-ভজনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে হরিভজন হয় না। আত্মবলে বলীয়ান্ যিনি, তিনিই সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হতে পারেন। শাস্ত্রের বাণীর, বেদের বাণীর উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে আজকাল। উপনিষদে আছে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' কোন কোন কর্ম্মি-সম্প্রদায়, জ্ঞানি-সম্প্রদায় তারা বলছেন,—লাঠি-সোটা নিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে। লাঠিখেলা চাই, সড়্কি-খেলা চাই; এসব দিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে। 'বলহীনেন লভ্যঃ'—এখানে কোন্ বলের কথা বলা হয়েছে? **Physical strength, mental strength?** না—আত্মবলের কথা বলা হয়েছে। সেটা হল বলদেবের চিদ্‌বল। সেই বলের কথা বলা হয়েছে। এটা শারীরিক বা মানসিক কসরৎ নয়।

শ্রীল বলদেব প্রভু দুটো অসুরকে বধ করেছেন, দেখা যায়। একটা—প্রলম্বাসুর, আর একটা—ধেনুকাসুর। এ অসুর দুটোই হল অজ্ঞানের **Symbol**। বলদেবের কাজটা কি? গুরুদেবের কাজটা কি? আমরা যে প্রণাম-শ্লোক পড়ি,—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান-তিমির থেকে যিনি আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তিনি হলেন সদ্‌গুরু। অনেকে আবার উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দেন। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' মানে—অজ্ঞানের ওজন তিন মণ দশ সের! 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া' মানে—জ্ঞানের ওজন শোলার ওজন! শাস্ত্রীয় অর্থ নিতে হবে আমাদের—**Positive side**-এর অর্থ গ্রহণ করতে হবে আমাদের। জগতের যত চিন্তা-ভাবনা, জগতের যত ক্রিয়া-কলাপ-অনুষ্ঠান সবগুলো তাৎকালিক। এর কোন বিশেষ সুফল নাই। শাস্ত্রে যত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর সবগুলো শব্দব্রহ্ম—একথা বলা হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে যে-সব গল্প-গুজব করি, সেগুলো শব্দ-সামান্য। শব্দব্রহ্মের অপরিসীম ক্ষমতা, সে শব্দ উচ্চারণ করলে। কে উচ্চারণ করবেন?—চেতন-জিহ্বায় যদি উচ্চারিত হয় সে-শব্দ, তাহলে ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যাবে। সেই নাম যদি নামব্রহ্ম, নাদব্রহ্ম; যদি চেতন-জিহ্বায় উচ্চারিত হয়—সেবোন্মুখ-জিহ্বায় যদি উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফল—সেই নাম আমার কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন, সেই নাম আমার কাছে তাঁর পূর্ণস্বরূপ অবগত করান।—

ঈষৎ বিকশি' পুনঃ,　　দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ।

"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল"—কীর্ত্তনের মধ্যে একথা পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীনামের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন, নামের আশ্রয় করলে সাধক-সাধিকার কি অবস্থা হয় এবং সিদ্ধিকালে কি অবস্থা হয়, এসবগুলো ত' শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাদের ত' সেইভাবে কেঁদে কেঁদে নাম করতে হবে। কাঁদতে না পারলে হবে না। শাস্ত্রের সর্ব্বত্র লেখা আছে কান্নার কথা। কিভাবে কাঁদতে হবে, কেমন আকুলতা-ব্যাকুলতা থাকলে ভগবান্ আমার কান্নাটা শুনবেন, ব্যবস্থা নেবেন, সেটা দেখাবার জন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঐ মূর্ত্তিতে এলেন। ছেলেটা খুব কাঁদছে, রান্না-বান্না ফেলে এসে বাচ্চাটাকে কোলে নিতে হয় মাকে। তারপর আবার পিঠ চাপড়ে দিতে হয়। ঐ রকম কান্না কাঁদতে হবে, তাহলে ভগবান্ ব্যবস্থা নিয়ে নেন। বাবা, বাছা, আর কাঁদিস্ নে, আমি তোমার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছি। তবে ত' কান্নাটা সফল। লোক-দেখানো কান্না কাঁদলে হবে না। লোকে আমাকে খুব বড় সাধু বলবে, খুব বড় বৈষ্ণব বলবে, এজন্য নয়। অন্তর থেকে কাঁদতে হবে। সেই আকুলতা-ব্যাকুলতা স্বয়ং চৈতন্যমহাপ্রভু রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে জগদ্‌গুরুরূপে এসে শিক্ষা দিয়েছেন। কেমন কাঁদতে হবে?—অঝোরে ক্রন্দন, আকুল ক্রন্দন, এমন চোখের ধারা, এমন কান্না জগতের কেউ কখনও দেখে নাই। (**ক্রমশঃ**)

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চিত হইলেও যেরূপ তদপাশ্রিত প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হন না, তদ্রূপ তন্নিজগণ ও তদাশ্রিতগণও জড়-গুণাবদ্ধ নহেন—ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮) নিত্য-অপ্রাকৃত ধামে সপার্ষদে তিনি নিত্য-লীলামত্ত। তথাপি অনাদিকাল-বহির্ম্মুখ এই অনন্তকোটী জীবের বিমুক্তি সংঘটনে তাঁহার নিত্য অবতরণ-লীলা—কখনও স্বয়ংরূপে, কখনও তদেকাত্মরূপে, কখনও বা অদ্বয়জ্ঞানান্তর্গত তদ্বিভূতিরূপে। স্থান-পাত্র-কালাধীন সাধারণ-মানব-মনীষায় তাহা কখনও লক্ষীভূত হইবার নহে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের ৭৫তম

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪০২, শনিবার (ইং ১৬।১২।১৯৯৫) কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীসমিতির অন্যতম শাখামঠ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইলেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী মঠস্থ সেবকগণ অত্যন্ত সাধারণরূপে এবং প্রায় অলক্ষিতে উক্ত ব্যাস-পূজানুষ্ঠান করিতে চাহিলেও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে নাই। "হস্তে কি কখনও পারে সূর্য্য আচ্ছাদিতে? সেইমত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত) বস্তুতঃ ইহাই ব্যাস-সূর্য্যের মহিমা। চতুর্দ্দিক হইতে কোন এক অজানা আকর্ষণে সমুদ্র-লহরীর ন্যায় ব্যাস-পূজার্থীগণের সমারোহ হইতে থাকিলে শ্রীমঠ যথার্থরূপেই স্বীয়-মাধুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর পাদপদ্ম বন্দনা ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তৎসহচরবৃন্দের অনুগ্রহে তিনি ব্যাসাসন গ্রহণ করিলে সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন এবং শ্রীব্যাসপূজা আরম্ভ হয়। তবে পূর্ব্ব-পরিকল্পনানুসারে সাধারণরূপে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা থাকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদর্শিত ব্যাসপূজা-পদ্ধতি অনুসরণ সম্ভব হয় নাই। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগোকুলানন্দদাস ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক শ্রীব্যাসপূজা, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক ব্যাসাভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের আরতি এবং পরিশেষে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু "শ্রীব্যাসপূজা-মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরুতত্ত্ব"-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব হরিকথা ব্যাখ্যা করিয়া সমুপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণ-হৃদয়রঞ্জন করেন।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ।"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ব্যাস-স্বরূপের ক্রিয়া। "কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্"—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে এই জগদ্‌গুরুত্ব এবং ব্যাস-স্বরূপ অন্তর্নিহিত। তাঁহারই করুণাশক্তি মূর্ত্ত হইয়া জগতে জগদ্‌গুরু ও ব্যাস-রূপে প্রপঞ্চিত হন। তিনি জীবের অজ্ঞানান্ধকারময় হৃদয়-কন্দরে শ্রীকৃষ্ণরূপ মূল ব্যাসদেব-প্রকাশিত শাস্ত্র-সূর্য্যের রশ্মি বিস্তার করিয়া 'ব্যাস'-পদবাচ্য হন। সুতরাং 'ব্যাস' বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন—একটী অখণ্ড তত্ত্বকে বুঝায়। 'ব্যাসপূজা' বলিলেও

শ্রীগুরুপূজা যেরূপ বুঝিতে হইবে, সেরূপ 'শ্রীগুরুপূজা'-অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-নারদ-বাদরায়ণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাক্ষাৎ মহান্ত গুরুদেব পর্য্যন্ত পূজাই লক্ষ্য হয়। প্রাকৃতিক-নিয়মে বশীভূত হইবার অভিনয়ের মাধ্যমে বদ্ধ-জীবোচিত সাধন-ভূমিকা আচরণ-মুখে জীবকে শুদ্ধাভিধেয় প্রদর্শন করায় তিনি আচার্য্য। কারণ সিদ্ধ-ভূমিকা প্রকাশে জীবের বাস্তব-কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

চতুঃসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সারস্বত ধারায় শ্রীগুরুতত্ত্ব এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যান্বিত। অনর্পিতচর 'স্বভক্তিশ্রী' সমর্পণোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের মনোভীষ্ট-স্থাপক শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামীর আনুগত্যে এই গুরুতত্ত্ব দেদীপ্যমান্ হইয়াছেন। সখীরূপ গুরুর আনুগত্যে মঞ্জরী-রূপ গুরুর মাহাত্ম্য আরও অধিকরূপে প্রকাশিত। তাঁহার দাস্য-পরম্পরায় শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর সেবা-লাভের লালসায় লুব্ধজীব যথার্থই ধন্য।

মধ্যাহ্নে পুষ্প-মুকুট ও বনমালা-সজ্জিত সৌন্দর্য্য-কন্দ শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর ভোগারাত্রিকান্তে সহস্রাধিক মঠাশ্রিত ভক্তমণ্ডলী ও শ্রদ্ধালু জনগণের নিকট বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হন।

অপরাহ্ণে কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীব্যাসতত্ত্ব-সম্বন্ধে এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সময়ান্তরে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইবে। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের আবাল্য অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বিধান করেন।

প্রতিবৎসর এইরূপে শ্রীব্যাসপূজা প্রকটিত হউন এবং সমগ্র বৎসরের দীর্ঘ-প্রতীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হউক—ইহাই তদ্গুণমুগ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ ও তচ্চরণাশ্রিত ভক্ত-মণ্ডলীর হার্দ্দিক প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে
শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা
শ্রীমনঃশিক্ষা
এবং
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত
শ্রীহরিনাম-চিন্তামণির
পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : ৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে ও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১৬ই ফাল্গুন, (ইং ২৯।২।৯৬) বৃহস্পতিবার হইতে ২২শে ফাল্গুন, ১৪০২ (ইং ৬।৩।৯৬), বুধবার পর্য্যন্ত **এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩০শে পৌষ, ১৪০২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির **'সভাপতি-আচার্য্য'** অথবা **'সাধারণ সম্পাদক'**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।৯৬), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৯৬), শুক্রবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৯৬), শনিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জামগর (জহ্নু মুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য) —**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৯ই ফাল্গুন (ইং ৩।৩।৯৬), রবিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ২০শে ফাল্গুন (ইং ৪।৩।৯৬), সোমবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২১শে ফাল্গুন (ইং ৫।৩।৯৬), মঙ্গলবার ;—**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৯৬), বুধবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য ঃ—রাত্রিবাসে ইচ্ছুক যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৯৬) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।৯৬), বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৫টা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৭শ বর্ষ | ৯ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৫০৯ শ্রীগৌরাব্দ ২৯ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৪০২, ইং ১৩/২/৯৬ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রথমৈকরাত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ে]

১। বন্দে নবঘন-শ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসসম্।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ৬৭॥

১। উপবর্হণ-গন্ধর্ব্ব (শ্রীনারদ) বলিলেন, —নব-ঘনশ্যাম, পীত-কৌষেয়-বসনধারী, আনন্দময়, সুন্দর, পরম-পবিত্র, জড়া প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি॥ ৬৭॥

২। রাধেশং রাধিকা-প্রাণবল্লভং বল্লবী-সুতম্।
রাধা-সেবিত-পাদাব্জং রাধা-বক্ষঃস্থল-স্থিতম্॥ ৬৮॥

৩। রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃত-মানসম্।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তম্॥ ৬৯॥

২-৩। যিনি রাধাকান্ত, রাধিকার প্রাণবল্লভ ও বল্লবী-পুত্র, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাধা-কর্ত্তৃক নিসেবিত ও তৎবক্ষঃস্থলস্থিত, এবং যিনি রাধার অনুগামী, রাধা যাঁহার ধ্যেয়, রাধা-কর্ত্তৃক যাঁহার চিত্ত অপহৃত, যিনি রাধার আধার, বিশ্বের আধার ও সকলের আধার, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬৮-৬৯ ॥

৪। রাধা-হৃৎপদ্ম-মধ্যে চ বসন্তং সন্ততং শুভম্।
রাধা-সহচরং শশ্বৎ রাধাজ্ঞা-পরিপালকম্ ॥ ৭০ ॥

৫। ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যম্।
তং ধ্যায়েৎ সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭১ ॥

৪-৫। যিনি রাধার হৃৎকমলে নিত্য বিরাজমান ও সর্ব্বমঙ্গলদায়ক, যিনি রাধার চির-সহচর ও আজ্ঞা-পালক, এবং সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সতত যাঁহার ধ্যানমগ্ন, আমি সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি ॥ ৭০-৭১ ॥

৬। সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশ-শেষ-সংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭২ ॥

৭। নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৩ ॥

৬-৭। ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তদেব যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন, এবং সাধুগণ যাঁহার নির্গুণ (অপ্রাকৃত) সনাতন পরব্রহ্মরূপ ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা ও নিত্য, সত্য, পরমেশ্বর, আমি সেই সনাতন ভগবানের বন্দনা করি ॥ ৭২-৭৩ ॥

৮। যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরম্।
বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ৭৪ ॥

৯। বেদাবেদ্যং বেদ-বীজং বেদ-কারণ-কারণম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৭৫ ॥

৮-৯। যিনি সৃষ্টির আদি-কারণ, সর্ব্ব-বীজাধার, পরাৎপর-তত্ত্ব, নিখিল-অবতারাবলীর বীজ-স্বরূপ, সকল কারণের কারণ, নিখিল দেবের অগোচর, বেদের বীজ-স্বরূপ এবং বেদের মূলীভূত কারণ, (ভক্ত)-যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের ভজনা করেন ॥ ৭৪-৭৫ ॥

১০। ইতি তেন (গন্ধর্ব্বেণ) কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৭৭ ॥

১১। হরিভক্তিং হরের্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ।
পার্ষদ-প্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

১০-১১। গন্ধর্ব্ব-(শ্রীনারদ) কৃত এই স্তোত্র যিনি পবিত্রভাবে সংযতচিত্তে নিত্য পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হন, এবং প্রাণান্তে নিত্য গোলোকে উত্তমা গতি—হরিভক্তি, শ্রীহরির দাসত্ব ও পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭৭-৬৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৯ পৃষ্ঠার পর]

২১। গৃহত্যাগীর কি স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকা উচিত ?

"ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমানভাবে দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

২২। বাল্যকালে কি হরিভজন হওয়া সম্ভব ?

"বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন,—ইহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে।"　　—চৈঃ শিঃ ১।১

২৩। ভজন-প্রণালীর গৌণ-ভেদ ও মুখ্য-ভেদ কি ? গৌণ-ভেদের দ্বারা কি ক্ষতি হইতে পারে ?

"দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদসমূহদ্বারা

কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না।" —চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। সাধনের উন্নতির প্রমাণ কি? বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

"সাধন-পর্ব্বের একটী রহস্য আছে; অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর বৈরাগ্য —ইহারা তিন জনেই সমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরু-কৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

২৫। ক্রম-সোপান কি?

"ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্ম-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ-ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

২৬। বন্যজীবন হইতে প্রেম-মন্দিরে গমনের ক্রম-সোপান কি?

"বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক-জীবন, কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২৭। রাগময় ভক্তজীবনও কি বৈধভক্ত-জীবনের ন্যায় একটী সোপান?

"নরজীবন একটী সোপানময় গঠনবিশেষ;—অন্তজ-জীবনই সর্ব্ব-নিম্নস্থ সোপান, নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবন—দ্বিতীয় সোপান, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন—তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত-জীবন—চতুর্থ সোপান এবং রাগ-উত্তেজিত-ভক্তজীবনই—সোপানোপরি অবস্থান।" —চৈঃ শিঃ ৩।৪

২৮। ভক্ত ও অভক্তের ব্যবহারিক দুঃখের মধ্যে তারতম্য কি?

"অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। * * * ভক্তমহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।" —'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ, ৩।২

২৯। ভজনের প্রথমাঙ্গ কি? গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে কি করিবেন?

"ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব

শিষ্যের পঞ্চসংস্কার করিবেন। দশমূল পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না।"　　—'দশমূল নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩০। কিরূপে স্বরূপভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপজ্ঞান ও কৃষ্ণানুশীলন হয়?

"স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না।"

—'দশমূল নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩১। হৃদয় হইতে কাম-বাসনা কিরূপে দূর হয়?

"কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।"　　—চৈঃ শিঃ ১।৭

৩২। ভাবোদয় ও প্রেমোদয় কিরূপে হয়?

"সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়, ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুসঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।"

—'দশমূল নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩৩। কিরূপে নামাপরাধ হইতে ত্রাণ ও নামাভাস-দশা দূর হয়?

"গুরু-কৃপাতেই নামাভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৪। নিখিল-ভজন-সঙ্কেতের সংক্ষিপ্ত-সার কি?

"যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত-সারস্বরূপ।"　　—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৫। নামে রুচিও ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে লাভ হয়?

"কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধী নহেন, অসৎসঙ্গজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না; সে-কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভ-লক্ষণ। **অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন-সহকারে নাম করিলে**

স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয়? শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কি সেই অপরাধ ক্ষয় হয়?

"কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।" —'অহংমম-ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৭। কিরূপে ভজনে উন্নতি হয়?

"নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মী-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়।"
— চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৮। কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়?

"অঙ্গে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মলদ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় না। জড়কর্ম্ম—নিজেই মল, কিরূপে অন্য মল পরিষ্কার করিবে? ব্যতিরেক জ্ঞান—অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মল-পরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৩৯। অন্তর্ম্মুখ জীবন কাহাদের? কাহাকে অন্তর্ম্মুখ জীবন বলে?

"পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন মায়াবদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।"
—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৮, উপসংহার

৪০। কোন্ কোন্ সাধনে কোন্ কোন্ লোক লাভ হয়? প্রেমাতুর ভক্তগণ কোন্ লোক লাভ করেন?

"জড়-জগতে ঊর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশ লোক; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকী মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্ব্রত-ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই ঊর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখধাম এবং

তদূর্দ্ধে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধ-ভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোক-ধাম লাভ করেন।" —ব্রঃ সং ৫।৫

৪১। বৈষ্ণব-সাধন কোন্ মার্গদ্বারা সাধিত হয়?

"যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গদ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন।" —প্রেঃ প্রঃ

৪২। জড়-বিষয়রাগ কিরূপ ভগবদ্রাগরূপে পরিণত হইতে পারে?

"চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়।"

—'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৩। কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র হেতু কি?

"সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৪। সাধনভক্তিতে কয়টী সোপান? প্রেমের দ্বার কি?

"সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়।" —'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৫। সাধন-ভক্তের সর্ব্বোচ্চতা কিরূপে প্রমাণিত হয়? কে যথার্থ ভগবৎ-কৃপা-লব্ধ?

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ। যোগাদি মনের উন্নতি-সাধন-পন্থা। কিন্তু সাধন-ভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে

তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধার মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক-ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৪৬। শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের সহিত গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত পারমার্থিকগণের গ্রহণীয় কেন?

"ঋষিগণ আপন আপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে-সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তিবিলাসে' অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীরূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটি উপায় উদ্ধার করত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যিনি আপাত সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতর চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দকে এক মনে করা মহাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মায়ার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোঝাই হইয়া আছে। অতএব অসুবিধাগুলিকে দূর করিতে হইলে এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগুরুর মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে ২৪ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণস্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

আমরা এ জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর

আশা-ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুরও প্রভু; সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমরা প্রভুরূপে পাইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন পরতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব এবং দ্বিভুজ; তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। স্বয়ংরূপবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গললাভ হয়। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিতে হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটী রিপু একাধারে অসূয়া ও মাৎসর্য্যে বিদ্যমান থাকে। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইলেও মৎসরতার সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারই কৃপায় রিপুসকল দমিত হয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মরূপা ব্যতীত ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদিতে যন্ত্রণা লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হইয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কি-প্রকারে আমাদের সদ্‌গতি হইবে?

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ়-বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্‌দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিষের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া ভাঙ্গী হইব না—গোগর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিব। এ জগতে ক্ষুদ্রবস্তুর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য-বিচার—সকলই মনোধর্ম্ম।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয় ভোগ হইয়া যাইবে। জগতের যত লোক আছে তাহাদের কথা, সমস্তই ভোগের কথা; তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাওয়া যায় না। নামাপরাধ কিছু নাম নহে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীমন্ত্রের কৃপায় মননধর্ম্ম বা ভোগপ্রদ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়। সংসারমুক্ত সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণসেবা—একই বস্তু।

গুরুসেবক ও গুরুভোগী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১১শ বর্ষ, ৪২২ পৃষ্ঠার পর]

এই ছয়প্রকার সেবকাধম কখনও গুরুর প্রীতিবিধান করিতে পারে না। ইহাদের কার্য্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া নিজসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ব্যস্ত থাকিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিজে সুখে থাকিবার চেষ্টার মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র থাকিতে পারে না। যিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবোপকরণ বিষয়-বৈভব আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় থাকেন, তিনি ভোগী ও অপরাধীর মধ্যে পরিগণিত। গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধির উদয় হইলে গুরুতে আমাদের লঘুজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে আমরা তৃণাদপি সুনীচ না হইয়া দাম্ভিক হইতে বাধ্য হই। **গুরুর অভীষ্টানুসারে সকল কার্য্যই করা হইতেছে—'গুরুদক্ষিণা'।** শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় করিয়াও সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ না করিবার ফলে গুরুকে গুরু-দক্ষিণা আমাদের দেওয়া হইতেছে না। গুরু-বৈষ্ণব হইতে বড় হইবার জন্য গুরুভক্তি বা গুরুসেবার মুখোস পরিধান করিলে শিষ্য-নামধারীর ধ্বংস অনিবার্য্য। যেখানে গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুর প্রতি আপন-জ্ঞান ও প্রবল আদর নাই, সেইখানে শিষ্যব্রুব যতই হরিনাম-সংকীর্ত্তন, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, ঠাকুরসেবা প্রভৃতি করুক না কেন, তাহার কৃষ্ণে ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাভের কোন উপায় নাই।

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ না করিয়া যাহারা বাহিরের হাবভাব বা কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া শ্রীগুরুর প্রীতি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা নিত্য গুরুসেবক নহেন। তাহাদের চেষ্টা 'কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার' ন্যায় হাস্যাস্পদ। বণিক্‌বৃত্তির দ্বারা গুরুদেবের শুদ্ধসেবা হয় না, তাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেবার অভিনয় হয় মাত্র। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে জগতের অন্যতম বস্তু রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র জ্ঞান করিয়া শিষ্য জীবনে চরম বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনে। এক গঙ্গার তটেই আম্র ও নিম্ববৃক্ষ অবস্থান করিয়া এক গঙ্গার জলই পান করিয়া থাকে। কিন্তু আম্রবৃক্ষ সুমিষ্ট ফল ও নিম্ববৃক্ষ তিক্তফলই প্রসব করে। ইহাতে গঙ্গার জলের কোন দোষ নাই বা গঙ্গার দান-কার্য্যেও কোন কৃপণতা নাই, কিন্তু আধারের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন ফল প্রসূত হইয়া থাকে। তদ্রূপ একই সদ্‌গুরুর নিকট আসিয়াও কেহ যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, আবার কেহ বা গুরুদেবের বিরুদ্ধমতের প্রচারক হইয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপালাভের অভিনয় করিয়াও রামচন্দ্রপুরী বঞ্চিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক ও শ্রীল ঈশ্বরপুরী যথার্থ কৃপাপ্রাপ্ত অর্থাৎ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার 'উপদেশামৃতের' মধ্যে শিষ্যব্রুবের কতিপয় লক্ষণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—"অনেক শিষ্য নামধারী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে প্রতিষ্ঠানে নিজের প্রতিষ্ঠা কম পড়ায় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভোগী বা নারকী। * * * শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে যে-সকল শিষ্য বিপথগামী হইয়া শ্রীগুরুদেবের নানাভাবে দ্রোহাচরণ করে, তাহারা শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালেও যে ছদ্মভাবে কপটাচারী ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গুরুভোগী গুরুসেবার জন্য বিধিসমূহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নিষেধসমূহকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়া তাহা করিতে উদ্যোগী হন। নিষেধসমূহ—শ্রীগুরুদেবের আদেশ, তাঁহার আসন, বস্ত্র, শয্যা, পাদুকা এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না। শ্রীগুরুর গমন, ভাষণ, চেষ্টা, স্বরাদির কদাচ অনুকরণ করিবেন না। গুরুর অগ্রে বা সন্নিধানে পাদ-প্রসারণ করিয়া উরুর উপর পদস্থাপন করিয়া, নিজের পদ যাহাতে দেখা যায়, এমনভাবে কদাচ বসিবেন না। গুরুর অগ্রে হাইতোলা, উচ্চহাস্য, অঙ্গুলী-স্ফোটন, অঙ্গদোলানো, হস্তপদাদি সঞ্চালন কখনও করিবেন না। শ্রীগুরুর অগ্রে বা সমীপে আসনে বসিবেন না, শয্যা ব্যবহার করিবেন না, গুরুর সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন করিবেন না, অন্যের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করিবেন না। শ্রীগুরুর নিকটে থাকিলে তাঁহার আদেশ না লইয়া কোথাও গমন করিবেন না। গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত কাহাকেও দীক্ষাদান বা শাস্ত্রব্যাখ্যা কখনও করিবেন না। গুরুদেবের প্রতি আজ্ঞাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। হস্ত বা অঙ্গুলিচালনাদিদ্বারা কোন সঙ্কেতাদি করিবেন না। 'অমুকটা দিন' 'অমুকটা নিন' ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক বাক্য কখনই ব্যবহার করিবেন না। প্রয়োজনে 'করিতে আজ্ঞা হউক', 'বলিতে আজ্ঞা হউক', এইরূপ প্রার্থনাসূচক বাক্য ব্যবহার করিবেন। গুরুর দ্রব্য তাঁহার আজ্ঞাব্যতীত ভোজন বা ব্যবহার কদাচ করিবেন না। যেখানে শ্রীগুরুর নিন্দা বা তাঁহার মহিমার অপকর্ষ হয়, সেস্থানে কখনও যাইবেন না। গুরুনিন্দকের মুখ দর্শন করিবেন না। গুরুদেবের তাড়ন-ভৎ'সনাদিতে সহিষ্ণু হইবেন। মোটকথা গুরুর প্রতি এমন ব্যবহার আচরণ কখনও করিবেন না, যাহাতে শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি বা লঘুবুদ্ধি আসিতে পারে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ "শিষ্যব্রুবের গুরু-সেবা ও হরিভজন"-প্রবন্ধে 'শিষ্যব্রুব বা গুরুভোগী'র যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে :—

(১) শিষ্যব্রুব নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুরুকে চিনিয়া লইতে পারিবে—মনে করে এবং অন্যাভিলাষের সহিত গুরুসেবায় ছলনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহে।

(২) শিষ্যব্রুব দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরু বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি লাভ না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে এবং বৈষ্ণবের দোষানুসন্ধানে রত হইয়া 'মক্ষিকার ব্রণানুসন্ধানের' ন্যায় স্বভাববশতঃ অবশেষে গুরু-পাদপদ্মাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়।

(৩) দেহারামী শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যোগ্য নিজ প্রিয়বস্তু তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে। সে শাস্ত্রীয় বিধি ও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবিগ্রহার্চ্চন ও হরিসেবার বাহাদুরি দেখায়।

(৪) বৈষ্ণবাভিমানী বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদির পরিবর্ত্তে উহা নিজেই আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পায়।

(৫) প্রতিষ্ঠাকামী অসৎশিষ্য গুরুদেবের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠাপর তোষামোদী মনযোগান কথার পরিবর্ত্তে পারমার্থিক কল্যাণকর কঠোর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করত গুরুনিন্দায় অগ্রসর হয় এবং হরিভজন হইতে ছুটী লইয়া মায়ার সংসারে প্রবেশের যত্ন করে।

(৬) শিষ্যাভিমানী দম্ভাহঙ্কারবশে হরিভজন হইতে বিরত হইয়া তাহার সর্ব্ব-নিকৃষ্টতম অধোগতি—নরকের দ্বারস্বরূপ সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া চরম-দুর্দ্দশা বরণ করে।

(৭) শিষ্যব্রুব ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা না দেখিয়া স্ব-শ্রী কাতর হইয়া শ্রীগুরু-দেবের বৈভব—সতীর্থ-মঠ-মন্দির ধর্ম্ম-প্রচারাদির সমালোচনাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ সঙ্ঘ-মিশনের শতমুখী প্রশংসা করে।

(৮) সুবিধাবাদী শিষ্যব্রুব আমি গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হইব, মঠের পয়সায় প্রাকৃত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিব, আমার কোনপ্রকার অভাব থাকিবে না, সুখে-শান্তিতে আমার দিন কাটিবে—প্রভৃতি অবান্তর ফল কামনা করিয়া গুরু-ভগবানের সেবার তাৎপর্য্যরূপ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়।

গুরুসেবাই কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের একমাত্র উপায়

যাহাদের সংসার বাসনা বা বিষয়-বাসনা প্রবল থাকে, তাহারা ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু পাইলেও প্রাণ দিয়া সেবা করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের বিশেষ মঙ্গল হয় না। তাহারা অমূল্যবস্তু গুরুসেবার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া অসার সংসারকে সার মনে করিয়া জন্মে জন্মে কষ্ট পাইয়া থাকে। একমাত্র নিষ্কপটভাবে গুরুসেবা করিলেই মায়াজাল ছিন্ন হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

যাঁহারা সত্যসত্যই মঙ্গল চাহেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই জীবনে গৌরপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উপদেশামৃতকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, ভগবান্ যাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা করা বা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যে আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

জীবের কৃত্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

"কেশাগ্র শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৯)

শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"—(মুঃ উঃ ৩।১।৯) অর্থাৎ—"আত্মা বা জীব চিদ্রূপ ও অণু। এই জীব বিজ্ঞেয়। বিশুদ্ধচিত্তে একে উপলব্ধি করতে হয়।"

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

অর্থাৎ—"সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানতে হবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। ('আনন্ত্য'-শব্দে বিভুত্ব বুঝতে হবে না। অন্ত—মৃত্যু; তদ্‌রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ)।"

শাস্ত্রে নানা শ্লোকে জীবকে চিৎকণ বা অণুচৈতন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চিৎকণ বা অণুচৈতন্য জীবাত্মা এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে তাহা মনেরও গোচরীভূত হয় না। আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদুক্তি,—"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম-বিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে"—(গীতা ২।২৫) অর্থাৎ এই আত্মা অব্যক্ত তথা প্রাকৃত চক্ষুরাদির অগোচর, অচিন্ত্য তথা মনেরও অগোচর এবং অবিকার্য্য তথা ছয় প্রকার বিকারের অযোগ্য; এস্থলে অবিকার্য্য বলার উদ্দেশ্য দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ বা মৃত্যু—এই ছয়টী বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু জীবাত্মার এই প্রকার অবস্থা হয় না।

জড়বিজ্ঞানীদের মতে একটী অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরের নিউক্লিয়াস এতই ক্ষুদ্র যে তাহা অঙ্কে লেখা সম্ভব হলেও মনের দ্বারা কল্পনা করা দুরূহ। এক্ষণে অতিশয় ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের ন্যায় অচিৎ পদার্থের আয়তন যদি মন কল্পনা করতে না পারে, তবে অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় আত্মার স্বরূপ ধারণা করা কি চিদাভাস মনের পক্ষে সম্ভব? সুতরাং আমরা জড়দেহ-স্বরূপ—একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আত্মাই আমাদের বাস্তব স্বরূপ। সেই আত্মা আমাদের সকলের দেহের মধ্যে থাকলেও আমরা তাঁ'কে জড়চক্ষে দেখতে পাই না কেন? চিন্ময় আত্মাকে চিন্ময় ভক্তি-চক্ষুর দ্বারাই দেখা যাবে, জড়চক্ষুর দ্বারা দেখা যাবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

"পশ্যন্ত্যাত্মনিচাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত গৃহীতয়া।" (ভাঃ ১।২।১২)

আত্মালোকে তথা ভক্ত্যালোকের সাহায্যে চিন্ময় চক্ষে আত্মা এবং আত্মার নিত্য প্রিয় ভগবানকে দর্শন করা যায়। জীবের চিন্ময় শুদ্ধ বিগ্রহের চক্ষুই ভক্তি-চক্ষু। জীব বা আত্মাকে জানা সহজ কথা নয়। আত্মবিদ্যা বা ভগবদ্‌বিদ্যা অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ জানা যায় ও তখন ভক্তি-চক্ষে আত্মাকে দেখা যায়। এমতে আত্মার স্বরূপের আলোচনায় উপলব্ধি হয় যে,—জীব বা আত্মা অণুসৎ, অণুচৈতন্য ও অণু আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ এককথায় জীবের স্বরূপ অণু-সচ্চিদানন্দ। মহাজন-গীতিতে পাই,—

"ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্ত্ব তাই, এ জড় জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার?
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।"

জীব স্বরূপতঃ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস

দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বা একত্রিতভাবে থাক্‌লেও তাহা জীবের স্বরূপ নয়। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য যাঁরা বুঝতে পারেন না, তাঁরাই লিঙ্গ-পদার্থ তথা সূক্ষ্মজড় বা চিদাভাস মনকেই আত্মা বলে ভ্রম করে থাকেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু। স্থূল বা লিঙ্গশরীর ব্যতিরিক্ত আত্মা বা চিত্তত্বকেই জীব বলে। জীব দেহ নহে,—আত্মা—এ সম্বন্ধে ঋষি ভরত রাজা রহুগণকে কৃপা করবার জন্য বলেছিলেন,—

"স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড্ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহং মদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি।" (ভাঃ ৫।১০।১০)

অর্থাৎ—"রোগা, মোটা, মনঃপীড়া, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়-ভোগ-বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়ে আসক্তি, ক্রোধ, দেহে আমি-আমার বুদ্ধি, শোক, মোহ—এইসকল দেহ-সৃষ্টির সঙ্গে দেহ-অভিমান নিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি ত' দেহ নই ; আমি নিত্য, শুদ্ধ, চেতনময় আত্মা। অতএব, আমাকে ঐ কথার দ্বারা উপহাস করাতে আপনার মূর্খামিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলেছেন,—"মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়া-প্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্য-শরীরং ব্যবসন্তং ন প্রিয়া-প্রিয়ে স্পৃশতঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১২।১)

অর্থাৎ—"হে ইন্দ্র! এই দেহ জড় ও মরণশীল, মৃত্যু ইহাকে অনুক্ষণ গ্রাস করে রয়েছে। এই শরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই নশ্বর শরীরকেই যাঁরা 'আত্মা' বলে ভ্রান্ত হ'ন, তাঁরাই সুখ-দুঃখের কবলে পতিত হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁরা এই দেহকে সেরূপ বিচারে দর্শন করেন না, সুখ-দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করতে পারে না।"

জীবকে শাস্ত্রে চিৎকণ বা অণুচৈতন্য বলা হয়েছে। জীব চিৎকণ অর্থাৎ পূর্ণ চিৎবস্তুর কণামাত্র—ইহাই প্রতীতি হয়। জীব অণুচৈতন্য—এই অর্থে বিভুচৈতন্য বস্তুর শক্তিরূপ অণু অংশ বুঝায়। জীবের স্বরূপের পরিচয় অণুসচ্চিদানন্দ হ'লেও উহা জীবের স্পষ্ট পরিচয় নয়। কোও ব্যক্তি যদি চিকিৎসক বা উকিল হন, তবে ঐ সম্মানজনক খ্যাতি ব্যক্তিগত পরিচয় হ'তে পারে, কিন্তু উহাই তা'র পূর্ণ পরিচয় নয়। সেই ব্যক্তিটি কার পুত্র অথবা কার পিতা অথবা ঐরূপ কোন সম্বন্ধ

তা'র নিশ্চয়ই আছে,—সেই সম্বন্ধজনিত পরিচয়ই তা'র পূর্ণ পরিচয় প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। সেইরূপ জীবেরও একটা সম্বন্ধগত পরিচয় আছে। দেহটা আমি নই, কিন্তু এই দেহটাকে নিমিত্ত করে আমার পিতা, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী অথবা আমার স্বামী—এইরূপ সম্বন্ধগত যত পরিচয় এ জগতে আছে, সেগুলি নৈমিত্তিক পরিচয়। দেহটাকে নিমিত্ত করে দেহ ও দৈহিক বস্তুগুলিতে সম্বন্ধ পাতিয়ে যে ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি নৈমিত্তিক ব্যবহার। যে দেহটার নিমিত্ত এই জাগতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, সেই দেহটাই স্থায়ী নহে। যতক্ষণ দেহ জীবিত থাকে, ততক্ষণই সম্বন্ধ-ব্যবহার। দেহের নাশ হলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ আর থাকে না। সুতরাং এই সম্বন্ধ অনিত্য বা অসৎ। আমরা যদি আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে কোনও হোটেলে অবস্থান করলাম এবং সেখানে কয়েকমাস থেকে সে-দেশের বহু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সম্বন্ধ পাতালাম। তারপর দেশে ফিরে এসে আর কখনও সেখানে গেলাম না এবং পত্রদ্বারা ব টেলিফোনেও কোন যোগাযোগ রাখ্‌লাম না ; তা' হলে সেখানকার সম্বন্ধ-পাতানো লোকজনের সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ থাক্‌বে? এগুলি সব নৈমিত্তিক সম্বন্ধ। এ জগৎটা আমাদের কাছে বিদেশ-সদৃশ। এ জগতে যে-সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমরা সমত্ব ও প্রিয়ত্ববোধে সম্বন্ধ পাতিয়েছি, এরা কেউই আমাদের প্রিয়জন নয়, —এরা কেউই আমাদের দুঃসময়ের সঙ্গী নয়। যখন আমরা কেউ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করব, তখন কোনও প্রিয়জন কি সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গী হবে অথবা মৃত্যুর পর কি কেউ সঙ্গী থাকবে? আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌কাল বা দুঃসময় হচ্ছে মৃত্যুর সময়। মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পরেও যিনি সঙ্গে থাকেন, তিনিই একমাত্র প্রিয়জন। যিনি আমাদের জন্মের পূর্ব্বে সঙ্গে ছিলেন, জন্মের পরে মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্গে আছেন এবং মৃত্যুর পরেও সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্‌বেন,—তিনিই ত' আমাদের প্রিয়জন। তাঁর সঙ্গেই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা নিত্য প্রীতির বিষয়কে না জেনে জড় বিষয় দেহ-গেহ, স্ত্রী-পুত্র, প্রভৃতিতে সম্বন্ধ পাতিয়ে যে প্রীতির ব্যবহার করি, তাহা তাৎকালিক সুখপ্রদ হলেও পরিণামে দুঃখ দেয়। জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ অণু-সৎ-চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ হওয়ায় আনন্দ চাওয়া তার ধর্ম্ম। কিন্তু কোন্ আনন্দ নিত্য বা শাশ্বত, তা' বুঝতে না পেরে নিজেকে ভোক্তা-জ্ঞানে জড়-বিষয়ে প্রীতি করে নানাপ্রকার শোক-দুঃখ-তাপাদি পেয়ে থাকে। প্রীতি জীবের একটা স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। অণুচেতন জীব বিভুচেতন-স্বরূপ ভগবানকে বাদ দিয়ে জড়বস্তুতে যে প্রীতি করে তা' মরে যায়, নিত্যকাল থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব বলেছেন,—

"এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥"
(ভাঃ ৫।৬)

অর্থাৎ—"জীবাত্মার পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞান অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত হ'লে মন কর্ম্মের অধীন হ'য়ে জীবকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে-কাল পর্য্যন্ত তা'র আমাতে (শ্রীবাসুদেবে) প্রীতি না জন্মে, তাবৎকালাবধি তা'র দেহ-বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভ হয় না।" যতক্ষণ জীব ভগবান বাসুদেবকে ভালবাসতে না পারবে, ততক্ষণ জন্ম-মরণশীল দেহের সঙ্গে তা'র সংযোগ থাকবে ও দেহ-সম্বন্ধজনিত অনিত্য প্রাকৃত সুখ-দুঃখের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাবে না। জীব যেহেতু আত্মা, সেইহেতু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহ এবং পঞ্চভূতময় জড় স্থূলদেহ—এই দেহদ্বয় আত্মার বন্ধন-দশা। এই দেহদ্বয়ের বন্ধন হ'তে মুক্তি পেতে গেলে একমাত্র বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রীতির আস্পদ জেনে সেবা করতে হবে, তদ্ব্যতীত অন্যদেব-দেবীর সেবার দ্বারা দেহ-বন্ধন বিমোচন হবে না।

জীব যাঁকে প্রীতি করবে, সেই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের কোন সম্বন্ধ আছে কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জানিয়েছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" (গীতা ৭।৪)

অর্থাৎ—আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতির বৃত্তি—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত। জীবতত্ত্ব ইহা হ'তে পৃথক্। ভগবৎস্বরূপ নিত্য; তাঁর বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি জড়া ও ভোগ্যা বলে অপরা বা নিকৃষ্টা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই অপরা প্রকৃতিকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে বিস্তারিত কথিত হয়েছে; যথা—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥" (গীতা ১৩।৬)

অর্থাৎ—ক্ষেত্রের স্বরূপ চব্বিশ তত্ত্ব যথা,—পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ) অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, দশটী বাহ্যেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—কর্ম্মেন্দ্রিয়) মনোরূপ একটী অন্তরেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)—এবম্ভূত চব্বিশটী প্রাকৃত তত্ত্বই ক্ষেত্র।—এগুলির একটীও আত্মার স্বরূপের বস্তু নয়। অতএব জীবের স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মশরীর ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের অপরাশক্তি মায়া হ'তে উদ্ভূত। এই অপরা প্রকৃতি ব্যতীত ভগবানের আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭।৫ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন,—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অর্থাৎ—হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত অপরা প্রকৃতি বা মায়াশক্তি অপেক্ষা পরা শ্রেষ্ঠা আমার আর একটী প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি থেকে নিঃসৃত জীব-কর্ত্তৃক জড়জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হচ্ছে। এক্ষণে জীবভূতা পরা প্রকৃতি চেতন বলে উৎকৃষ্টা বা শ্রেষ্ঠা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭।৬ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্টভাবে জানালেন,—

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

অর্থাৎ—সমস্ত ভূতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয় হ'তে জাত—ইহা অবগত হও। আমি সকল জগতের উৎপত্তির কারণ এবং বিনাশেরও একমাত্র কারণ।

ভগবানের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয় মধ্যে মায়াশক্তি স্থাবর ও জঙ্গমের ক্ষেত্র বা দেহরূপে পরিণত হয়, আর পরা প্রকৃতির অংশ জীবশক্তি চেতন বলে ভোক্তৃরূপে নিজ কর্ম্মানুসারে শরীরসকলে প্রবেশ করে সেগুলিকে ধারণ করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক জীবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতির অংশ এবং দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতির অংশ হওয়ায় প্রত্যেক জীবই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি। সুতরাং প্রত্যেক জীবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেব-দেবীর সঙ্গে জীবের ঐরূপ সম্বন্ধ নাই। কেননা, অন্য দেব-দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বা তেজাংশ-সম্ভূত বা ভক্ত হওয়ায় তাঁরা কৃষ্ণেরই অংশ। কৃষ্ণসম্বন্ধে দেব-দেবীগণের সহিত সম্বন্ধ হ'লেই সেই সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে আনন্দ বর্দ্ধন করে। যেমন এ জগতে দেখা যায়—কাকা, জেঠা প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; তাঁরা পিতৃব্য ব'লে পিতার ন্যায় ব্যবহার করেন, কিন্তু তথাপি পিতার মত বাৎসল্যভাব তাঁদের থাকে না। কারণ তাঁরা কেউই জন্মদাতা পিতা বা জনক ন'ন। তেমনি গণেশ, সূর্য্য, কালী, দুর্গা, প্রভৃতি দেব-দেবীগণ কেউই পরতমতত্ত্ব ভগবান্ ন'ন এবং ভগবানের আসনে বসবার তাঁরা যোগ্যও ন'ন; পরন্তু সকলেই ভগবান্ কৃষ্ণের অধীন।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" (চৈঃ চঃ)

"এক কৃষ্ণ—সর্ব্ব সেব্য, জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁ'র সেবকানুচর॥" (চৈঃ চঃ)

পিতার পিতৃত্বই যেমন বাৎসল্য ধর্ম্ম প্রকাশ করে, তেমনি ভগবানের ভগবত্তা হল প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম। এবম্বিধ প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম কোনও দেব-দেবীর মধ্যে নেই, কারণ দেব-দেবীগণ জীবের থেকে গুণে শ্রেষ্ঠ হ'লেও ভগবানের বিভিন্নাংশ শক্তি, আর জীবও ভগবানের বিভিন্নাংশ শক্তি। জীব কোনও দেব-দেবীর থেকে সৃষ্ট নয়। দেব-দেবীগণ মায়িক-ভূমিকাতেই অবস্থান করেন। মহাপ্রলয়ের সময়ে দেব-দেবীগণ ও জীবগণ বিষ্ণুর লোমকূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লিখিত আছে,—"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সং ৫।৪৮)

অর্থাৎ—"মহাবিষ্ণুর একটী নিশ্বাস বের হয়ে যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁ'র রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ড-পতিগণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবাদি স্ব-স্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব কার্য্যের নিমিত্ত সেই কাল মাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁর কলা-বিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে,—
"সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥" (গীতা ৮।১৭)

মানব-পরিমিত সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তদ্রূপ তাঁ'র একরাত্রি। এই প্রকার শত বৎসর পরমায়ু অন্তে ব্রহ্মার পতন ঘটে। ব্রহ্মার এই প্রকার অবস্থা হ'লে তল্লোকবাসীর অভয়ত্ব ও নিত্যত্ব কোথায়? তাই দেব-দেবীগণের সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ থাকতে পারে না। দেব-দেবীগণ সাধারণ জীব অপেক্ষা গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় নমস্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে
শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে
শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছের
পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ এবং
শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-স্রজমালা।

অনধিকার চর্চ্চা

কি আশ্চর্য্য! বলি, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে কি ব্যবসায় চলে না? তদতিরিক্ত সীমায় হস্তক্ষেপ করিয়া সীমা-লঙ্ঘন কি বর্ত্তমান-কাল কলির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম? শ্রীভগবান্ আছেন, পরকাল আছে, মরিতেই হইবে; চর্ম্ম, রক্ত-মাংস ও তজ্জনিত জড়াভিমান সমস্তই নশ্বর, অচিরস্থায়ী; ইহা কি একবারও মনে হয় না? হায়! জীব, তোমার কি এতই দুর্ভাগ্য যে, ভীষণ যন্ত্রণা-দায়ক সংসারকারাগারে মায়া-রজ্জুতে হাতে, পায়ে ও গলদেশে বাঁধা থাকিয়াও—প্রতিমুহূর্ত্তে কারাকর্ত্রী শ্রীদুর্গাদেবীর কৃপাপ্রসাদ-ভিখারী হইয়াও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না?

যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের হুহুঙ্কারে আসমুদ্র হিমাচলবাসী—সমস্ত পাপী, পাষণ্ডিগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' রব-রোল তুলিয়াছেন, যে বৈষ্ণাবাচার্য্যগণের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত ও দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রচার-কার্য্য সত্যপিপাসু সুবুদ্ধিমানবগণ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন, যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারচেষ্টা চিন্ময়ধাম-দর্শনকারি-মহাত্মগণ ও প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন, আজ তাহা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফলে নিজস্ব গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে অশিষ্টভাষা-প্রয়োগে কয়েক লাইন লিখিয়াই কি উড়াইয়া দেওয়া যাইবে! হিতবাদ-প্রচার-ছলনায় ঐরূপ মনে করাও কি নিজকে নিজে 'নগণ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার দৃষ্টান্ত নহে?

বর্ত্তমানকালে মানুষ যে-প্রকার স্বাধীন-চেতা, তাহাতে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এতদিনে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত। হাড়, মাংস, চর্ম্মের বড়াই করিয়া চর্ম্মের উপাসক 'চামার' হইয়া যাইত।

কেবল চামড়ায় আসক্ত বর্ণাভিমানী যে-সকল ব্যক্তি সমাজের 'নেতা', 'শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত', 'পুরোহিত' প্রভৃতি বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সদাচার-বর্জ্জিত। আর সাধারণ সমাজে ত' সদাচার-ভ্রষ্ট লোকের অভাবই নাই।

কেহ বা যদি মুখে 'সদাচার' মানেন, তথাপি গৃহমেধি-ধর্ম্মে রুচিবশতঃ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজনের আব্দারে পড়িয়া তাহাদের অসদাচরণের সাহায্য হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে পান না; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা কিম্বা তত্তৎসম্পর্কিত কোন না কোন ব্যক্তি কেল্‌নার হোটেলে আতিথ্য গ্রহণ করায় তিনি সমাজে অপাংক্তেয় ও গোপনে স্পর্শদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। অতএব

যাঁহারা ঐ প্রকার গোঁজামিল দেওয়া সমাজ লইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা প্রকৃত সদাচারী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণের আচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে—শ্রীবিষ্ণু দীক্ষা-গ্রহণে পারমার্থিক বৃত্ত-ব্রাহ্মণ বলিয়া বিচারিত, তাঁহারা তথা-কথিত অসদাচারী বৃত্তচ্যুত বর্ণচতুষ্টয়ের সহিত সহযোগিতা রাখেন না। বরং অসৎসঙ্গবোধে তাহাদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া শ্রীবিষ্ণু-সেবার উপযোগী বৈষ্ণবাচার রক্ষা করেন। তাঁহারা সমাজে কোনপ্রকার সম্মান বা বিবাহ-আদান-প্রদান-প্রয়াসী হইয়া—শ্রীকৃষ্ণ দাসাখ্যার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বৈষ্ণববিরোধী প্রকৃতিবাদী স্মার্ত্তসমাজের 'চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি পদবীলাভের চেষ্টা করেন না। তাঁহারা শ্রীঅচ্যুত-গোত্র ভিন্ন অন্য কোন ফলভোগময় জড়-পরিচায়ক গোত্রের পরিচয় দেন না। অবৈষ্ণবোচিত কোন প্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহারা যোগদান করেন না। পতিতদ্বারা পরিবেষ্টিত পতিতপাবনে সজ্ঞাগ্রহণকারী গোস্বামিব্রুবগণের পতিত শিষ্যগণকে আহরণ করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তোষণের ইন্ধনে বাধা প্রদান করেন না। তাঁহারা নিজে গুর্ব্বভিমানী নহেন; একমাত্র শ্রীগুরুসেবকাভিমানে হরিসেবাই তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তবে যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বা বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত সৎসঙ্গ ও সুকৃতির ফলে জানিতে পারিয়াছেন—'আমি পতিত, আমাকে উদ্ধার হইতেই হইবে,' তাঁহারাই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবে প্রপত্তির প্রয়োজন বোধ করিয়া বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করেন। অবশ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুদেবের কৃপায়—তাঁহাদের পাতিত্য আর থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এখন গুর্ব্বভিমানী গুরুব্রুবগণ যদি এই প্রকার উদ্ধারকামী পতিতের উপর পতিত-পাবন-গিরি দেখাইতে চাহিয়া মৎসরতা-বশে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপর যথেচ্ছাচারিতার সহিত অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদিগকে বলিবার যোগ্য ভাষা 'আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ' অথবা 'রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য' প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রযুক্ত ভাষাব্যতীত আর কি সমীচীন ভাষা আছে? তাহারা অবৈষ্ণব, সুতরাং—'শ্বপাকমিব নেক্ষেতে' আদেশবাক্যই পালনীয়।

ব্যাসাবতার গৌরজন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে-প্রকার নিন্দকের মাথায় লাথি মারিয়া, নিন্দককেও কৃপা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই প্রকারে—যদিও অসম্ভাব্য, তথাপি পরদুঃখদুঃখী অভিমানী-ভক্তিহীন-দীন-জনহিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগৌড়ীয় শাস্ত্র-যুক্তিমূলক সুসিদ্ধান্তদ্বারা ঐ সকল বৈষ্ণব-বিরোধিগণের অপসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্ত খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া সর্ব্বসাধারণে কৃপা বিতরণ করিতেছেন। তথাপি দুর্ভাগ্যের তাড়নায় সংযত না হইয়া 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা' এই

প্রবাদবাক্যের সাম্যস্বরূপ 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণবদ্বেষী-কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত—'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' গাহিয়া ফেলিয়াছেন। 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী', সুতরাং এই সকল আচার্য্য-লঙ্ঘনকারী—গুর্ব্বপরাধী—হতশ্রীগণের নিকট শাস্ত্র শাসনবাণী কীর্ত্তন অরণ্যে রোদন মাত্র। সজ্জন বিদ্বেষের অবাধ গতির পন্থা আবিষ্কার করা কি ইহাদের জীবনের প্রধান ব্রত? 'পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে', সুতরাং মৃত্যু যাহাদের কাম্য বস্তু, তেমন গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রচারকদের জন্য এই কয়টী গ্রাম্য মেয়েলি প্রবাদ-কথা বলিয়াই অদ্য উপসংহার করিলাম। কারণ গ্রাম্য মেয়েলি প্রবাদ-কথায় তাহাদের যথেষ্ট রুচি দেখা যায়।

সাধু সাবধান! গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ সজ্জন-বিদ্বেষসূচক ভাষা প্রয়োগে সর্ব্বসাধারণের প্রাণে ভীষণ আঘাত দিতেছেন। ইহার তীব্র প্রতিবাদ করার অধিকার সাধারণের নিশ্চয়ই আছে জানিবেন। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণ মায়ার কুহকে পড়িয়া হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া হিতবাদের ছলনায় যতই অহিতবাদ প্রচারের আয়োজন করুন না কেন, শ্রীগৌড়ীয় তাঁহার নিজস্ব সংবাদ কুমতবাদ-খণ্ডন নিরন্তকুহক সত্য নিত্যকাল প্রচার করিতেই থাকিবেন। সুতরাং

"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।
* * * *
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর]

পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা গেলে পামু॥
সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি গেনু॥

অদ্ভুত কান্না। ঐ রকম কান্না দরকার। যে কান্না কেঁদেছিলেন স্বয়ং রাধাঠাকুরাণী, সেই কান্না, সেই আকুল ক্রন্দন।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলে বার বার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী যা' উচ্চারণ করলেন, সেটা রাধাঠাকুরাণীর বিরহ-দশার গীত।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

বিশেষ চিন্তার কথা ওগুলো। বুঝি না, মাথায় ঢোকে না ত'। কান্নার স্বরূপ ত' বুঝি না, কেমন কাঁদতে হবে। মহাজনদের কান্না ত' এক এক রকমের। সকলের কান্নাটা সমান নয়, ভাবটাও এক নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন,—

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান॥
বরজ-বিপিনে সখী-সাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ॥

আবার এক জায়গায় বললেন,—

আমি ত' স্বানন্দসুখদ বাসী।
রাধিকা-মাধবচরণ-দাসী॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥

আমার ত' মাথায় ঢোকে না এসব। আবার শ্রীল ঠাকুর বললেন,—

"সখীগণ সম,　　পরম সুহৃৎ,
যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে,　　সেবিব রাধার,
চরণ-কল্পতরু॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি',　　যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা-　　পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাঁ'কে॥"
"ভকতিবিনোদ,　　আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে,　　থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায়॥"

আবার একজন বৈষ্ণব-মহাজন গাইলেন,—

পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে-সঙ্গ না পাঞা কাঁন্দে নরোত্তমদাস॥

কই, আমার জন্য বলা হয়েছে কি? যার মাথা ফাটল তার ফাটল, তোমার কি হৈল তাতে? মাথা ত' ফেটেছিল একজনের। কোথায় সেই বিরহ-বেদনা, কোথায় সেই জ্বালা, খাওয়া-পরা সব ত' চুলোয় যাবে, ও চিন্তা যার আছে। "বলি, তুমি ত' শুধু গাইয়া গেলা, যার ফাটল তার ফাটল"—বংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ বলে ফেললেন গানটা শুনে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সবটার মধ্যে ত' হিসাবের কথা, চিন্তা-ভাবনার কথা। আমার মন ত' দোলা দেয় না, দিচ্ছে না। বুঝি না ত'। একজন কেঁদে আকুল, আর একজন হেসে ব্যাকুল। কান্নাটা ত' বুঝি না। শ্রীগৌরসুন্দর—চৈতন্যমহাপ্রভু এসে বুঝিয়েছেন কেমনভাবে কাঁদতে হবে। যে কান্না ভগবানকে আকর্ষণ করবে, যে কান্না ভগবানকে বলতে বাধ্য করবে—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" কাঁদছ কেন, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, জানিয়ে দিচ্ছি। আমাকে কেমনভাবে পেতে হবে, আমি তোমাকে সব বলে দিচ্ছি, বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি। আমার দেওয়া বুদ্ধিযোগেই আমাকে ঠিক জানতে পারবে।

সেই ভগবানকে আবার প্রতিজ্ঞা করতে হবে—আমি তোমাকে ছাড়ছি না, আমি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলছি না। তোমার জন্য আমার সব দায়িত্ব থাকল। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—বলতে বাধ্য হচ্ছেন ভগবান্। প্রেমিক ভক্তের ঋণ শোধ করতে না পেরে ভগবান্ বলে ফেলছেন—"ন পারয়েঽয়ম্"—আমি পারলাম না তোমাদের ঋণ শোধ করতে, তোমরা সবাই ক্ষমা কর আমাকে। ক্ষমা চাওয়া ভয়ঙ্কর জিনিষ। দোষ-ত্রুটী না করে ক্ষমা চাওয়ায় আরও বেশী বাহাদুরি, এক চরম কৃতজ্ঞতা। এ কৃতজ্ঞতা ত' ভগবান্ স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন, জানিয়ে রেখেছেন। বৈষ্ণবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা হচ্ছিল একজনের। পরে ভুল ধারণা যাতে না হয়, তার জন্য আর একজন একটা শ্লোক পড়লেন। তাতে আমাদের শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মুস্কিলে পড়ে গেলেন—বৈষ্ণবাপরাধ হয়ে যাচ্ছিল। শ্রীমুকুন্দ যেই বলেছেন,—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

আমি এমন দয়ালু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর কার শরণ গ্রহণ করব ?—

রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালুরে॥

কিসের দয়ালুতা তাঁর ?—

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি' ভজে অন্য॥

এমন দয়ালু কৃষ্ণের ভজনা করব না ত' কার ভজনা করব ? কার কাছে আমি পূর্ণ শরণাগত হব ? পূর্ণ শরণাগতি, পূর্ণ আত্মসমর্পণ না হলে ত' ভগবান্ কথা বলেন না। দাবাগ্নি-পানে দেখা যাচ্ছে,—চারিদিকে আগুন ঘিরে ধরেছে, চিৎকার আরম্ভ হয়ে গেছে, আগুন পুড়িয়ে দিচ্ছে গাভী, গোবৎস, সখাগণকে। কৃষ্ণ এসেছেন কাছাকাছি, বলদেবও এসেছেন। সখাগণ চিৎকার করছে,—হে বলদেব! হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর, বাঁচাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন কাছাকাছি এসেছে। এসে ঐ কৃষ্ণের গাভীর নাম ধরে ধরে ডাকছে—আয় শ্যামলী, আয় ধবলী। 'নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ!' আচ্ছা কৃষ্ণ, তুমি এত নিষ্ঠুর! লোকে বলে কানাই নিষ্ঠুর, আজ দেখছি, তুমি সত্যই নিষ্ঠুর। তোমার মত ত' নিষ্ঠুর কেউ নাই। দেখ, আমরা তোমার বান্ধব, সখা। সখা যদি বিপদে পড়ে তাহলে ত' সখা সখাকে বাঁচায়। বিপদে রক্ষা করে, ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার নাম ত' সখা, সেই ত' প্রকৃত সখা। কিন্তু তুমি ত' এগিয়ে আসছ না। 'ন চার্হস্ত্যবসাদিতুম্'—আমরা সকলেই তোমার বান্ধব, অতএব বিনাশের যোগ্য নহে। আমাদের প্রতি তোমার যে দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব তুমি ত্যাগ করতে পার না। কোন উত্তর নাই। আমরা ত' তোমার সখা, বেইমান নই। তোমার সখা যখন, তখন নিশ্চয় আমাদের বাঁচাবে তুমি। আমরা কি কিছু অন্যায় করে ফেলেছি তোমার প্রতি ?—হ্যাঁ, অন্যায় কিছু করে ফেলেছ, মনে মনে বললেন কৃষ্ণ। কতটা ?—তাৎকালিকভাবেও। আমাকে জিজ্ঞাসা করে এস নাই কেন, দাউজীকেও কিছু বল নাই কেন ? এতে তোমাদের আনুগত্যের অভাব হয়েছে। তারপরে সখাগণ বলছে,—যদি কিছু ভুলচুক্ হয়ে গেছে, ক্ষমা কর। তখনও কৃষ্ণ চুপচাপ। "বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ তন্নাথাস্তৎপরায়ণাঃ" যখন বলেছেন,—অর্থাৎ হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ! আমরা তোমাকেই প্রভু ও পরমাশ্রয় বলে জানি। এক্ষেত্রে পূর্ণ শরণাগতি বা পূর্ণ আত্মসমর্পণের ক্ষেত্র উপস্থিত। যে ভাবটা আমাদের মহাজন পদাবলীর ভিতরে আছে,—

তব পাদপদ্ম নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাই, এ ভব-সংসারে॥

তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—আচ্ছা, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তোমরা সবাই চোখ বন্ধ কর। চোখ খুলে থাকলে কি কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবেন না কৃষ্ণ? না এর মধ্যে চালাকি আছে কিছু? একবার কৃষ্ণকে ওরকম মুস্কিলে ফেলে দিয়েছিল সখার', নালিশ করে দিয়েছিল মা-যশোদার কাছে। সেইজন্য বললেন, এবার আর আমি কাকেও জানতে দেব না। তোমরা চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ করতেই কৃষ্ণ সমস্ত দাবাগ্নি পান করে ফেললেন মুহূর্ত্তের মধ্যে। 'এবার চোখ খুলে ফেল।' চোখ খুলে দেখে তারা সেই ভাণ্ডীরবনে — যেখানে তারা খেলাধূলা করছিল, সেখানে এসে গেছে। তাদের গাভী, গোবৎস ঘুমাচ্ছে সব। অলৌকিক লীলা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এর মধ্যে আগুন ছাড়া মাটী, জল, বায়ু, আকাশ সব জিনিষই আমরা আহার করতে পারি, কিন্তু ভগবান্ দাবাগ্নি পান করে দেখালেন যে, ও ক্ষমতা তোমাদের না থাকলেও আমার স্বাভাবিকভাবেই আছে। কেন? 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম ইতি ঈশ্বরঃ।' আমি ত' ভগবান্, আমার সব ক্ষমতা আছে। পূর্ণ শরণাগতি না থাকলে ভগবান্ এগিয়ে আসেন না।—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—একথা আগে বলেন নাই ভগবান্। যখন দেখছেন যে আমি ত' ভক্তের কাছে বিক্রীত হয়ে গেলাম, আর কোন উপায় নাই, আমার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললাম, তখন বলেন। **Supreme Autocracy** ভগবানেরই আছে। ঐরূপ বাহাদুরি আর কারও নাই। 'স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম' ভগবানের নাম, কিন্তু ওখানে তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন ওই বিশেষ গুণটা। কেন? ভক্ত ছাড়িয়েছে তাঁকে বা ভক্তের জন্যই তাঁকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—তোমার সব দায়িত্ব আমার। তোমার কিছুই ছিল না, তোমাকে দিলাম, এই নাও। ভক্তের প্রেমবিভাবিত অবস্থা। কে ঐসব ভগবৎপ্রদত্ত সম্পত্তি রক্ষা করবে? ভগবান্ দেখলেন, মহামুস্কিল। আমাকে যখন বেঁধে ফেলেছে, তখন বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—ধন-সম্পদ্ সব দিয়ে দিলেন তাঁকে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নাই, ক্ষমতা

নাই ভক্তের। ভগবান্ আবার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন ভক্তের জিনিষ। দায়িত্বও তাঁর ঘাড়ে চেপে গেছে। 'যোগ' মানে অলব্ধ বস্তুর লাভ, আর 'ক্ষেম' মানে তৎসংরক্ষণ-চেষ্টা। এ দুটোই আছে ভগবানের। এইরকম ধরণের যে দয়ালু ভগবান্, তাঁর সেবা করব না, তাঁর ভজন করব না, তাঁর আরাধনা করব না ত' কার আরাধনা করব? ওই তাৎকালিক দেবদেবীর উপাসনা আমার দরকার নাই, কোন লাভ হবে না। কেন না, আমি ত' চাই না স্বর্গ, মোক্ষ।—

"প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজকর্ম্ম গুণ-দোষে যে-যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥"

"যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্ম-পাশানুবন্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥"

[অর্থাৎ—কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে যদি আমার অধোগতি লাভ হয়, কুলবিহীন পক্ষী, ক্রিমি-কীটকুলেও যদি আমার জন্ম হয়, তথাপি আমার হৃদয়ে যেন বিষয়-আশ্রয়ভেদে শ্রীকেশবের প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি থাকে।]

শ্রীল কেশব-গোস্বামি-বন্দনা

জয় প্রভুবর, শ্রীকেশব ঠাকুর, শ্রীরাধার নিজজন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছাবশে, উদি' গৌড়দেশে, পূরালে সজ্জন-মন॥
তৃতীয় তত্ত্বধন,—প্রেম-প্রয়োজন, জানা'তে এ মুখ্য ধন।
গোবিন্দ-মাসেতে, কৃষ্ণ-তৃতীয়াতে, হেথা' তব আগমন॥
এ তিথি-বন্দনে, ভকতের মনে, বহে ভক্তি-প্রস্রবন।
ভক্ত যে তোমার, তুমি ত' তাহার, চাহে না সে অন্য ধন॥
তব গুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, তুমি তাঁ'র প্রেষ্ঠজন।
মঠ-সেবাভার, তোমার উপর, ন্যস্ত ছিল সর্ব্বক্ষণ॥
সকলে কহিত, 'গুরুর বিনোদ', তুমি হেন গুণীজন।
গুরু-কার্য্য যত, সাধিতে সতত, জীবন করিয়া পণ॥
অতুল-সেবাধী, প্রভুপাদ দেখি', বুঝিলেন নিজগণ।
হেন গুণধামে, 'কৃতিরত্ন'-নামে, করিলেন বিভূষণ॥
দুর্ব্বৃত্তরা মিলে, কীর্ত্তনের দলে, করে যবে আক্রমণ।
তুমি সেই কালে, গুরু-দায় নিলে, সহি' নিজে নিপীড়ন॥
'কুরেশের' মত, তোমার চরিত, ঘোষে' বাণী চিরন্তন—
সর্ব্ব-শ্রেয়োময়, গুরুসেবা হয়, অতিশয়-প্রয়োজন॥
প্রভুপাদ যবে, রাধা-অনুরাগে, করে লীলা সংগোপন।
লভি' তদাদেশ, ধরি' ন্যাসি-বেশ, হ'লে গুরু মহাত্মন॥
তব এ সম্মানে, খুশী হ'ল মনে, গৌড়ীয় ভকতগণ।
সরস্বতী-ধারা, পুনঃ বহে ত্বরা, নবরূপে অনুক্ষণ॥
'বেদান্ত সমিতি', ভূ-ভারতে স্থাপি', বিলা'লে শ্রীরূপ-ধন।
ন্যাসী-নামে যুক্ত, "ভক্তি বেদান্ত", কৈলে তুমি প্রচলন॥
রাধা-চিন্তাবেশে, হরির বিশেষে, কৃষ্ণকান্তি বিলোপন।
রাধা-আলিঙ্গিত, সে-রূপ অমৃত, কৈলে মর্ত্ত্যে প্রকটন॥
তব সমিতির, আকর-মন্দির, কোলদ্বীপ-আকর্ষণ।
নব-চূড়াযুক্ত, দেবানন্দ মঠ, (চারি) সম্প্রদায় সঞ্জীবন॥

নব-চূড়া হয়, নব' ভক্তিময়, শৃঙ্গে আত্মনিবেদন।
ভক্তি-কীর্ত্তনাঙ্গ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ তব প্রচার-ধন॥
বৈভব তোমার, অনন্ত অপার, জানে তব নিজজন।
আমি অর্ব্বাচীন, শক্তি-বুদ্ধিহীন, বুঝি নাই এক কণ॥
মায়াবাদ-মত, অজ্ঞানে আবৃত, ভকতির প্রবঞ্চন।
বিশ্বের বিস্ময়, "বৈষ্ণব-বিজয়", তব নিজ সম্পাদন॥
শুদ্ধোদনসুত, জ্ঞানী অবধূত, নহে তিনি নারায়ণ।
অঞ্জনা-নন্দন, বুদ্ধ-নারায়ণ, জানালে এ তথ্য ধন॥
"অচিন্ত্য ভেদাভেদ", বৈষ্ণব-সম্পদ, তব কৃপা-নিদর্শন।
সে লেখনী-দ্বারে, ঘুচে চিরতরে, অসুরের আস্ফালন॥
বেদান্ত দর্শন—ভকতি-দর্শন,—কহে সব মহাজন।
শব্দব্রহ্ম-নাম, সূত্রে অবিরাম, করিয়াছে সুকীর্ত্তন॥
গৌর ভগবান্, শাস্ত্রে পরমাণ, ভজ তাঁ'র শ্রীচরণ।
গৌরের আচার, গৌরের বিচার, মিলায় শ্রীকৃষ্ণধন॥
বদ্ধ-অবস্থাতে, গোষ্ঠীভজনেতে, (হও) নাম-সেবা-পরায়ণ।
নির্জ্জন-ভজন, অনর্থ-কারণ, নহে যুক্ত আচরণ॥
অর্চ্চন-মার্গেতে, সূক্ষ্ম-বিচারেতে, দীক্ষা-গুরু শ্রেষ্ঠজন।
প্রথম প্রণতি, রাখ তাঁ'র প্রতি, তবে শিক্ষা-গুরুগণ॥
ওহে গুরুবর! সিদ্ধান্ত-সাগর, দিলে শিক্ষা অগণন।
ভকতিবিনোদ, তোমার সম্পদ, করিবে কে তা' বর্ণন??
বৈরাগ্য অদ্ভুত, যেন বলদেব (*), নামে রত সর্ব্বক্ষণ।
গীতা-ভাগবতে, বেদে ও বেদান্তে, তুমি মহাজ্ঞানী জন॥
মুখে 'প্রভুপাদ', শিরে 'প্রভুপাদ', 'প্রভুপাদ' প্রাণ-ধন।
আচারে-প্রচারে, জানা'লে মোদেরে, 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'॥
শারদ-সন্ধ্যাতে, রাস-পূর্ণিমাতে, গ্রহণের শুভক্ষণ।
সবে ঘরে ঘরে, হরিনাম করে, ডাকে কৃষ্ণে ঘনঘন॥
তুমি সেইক্ষণে, শ্রীরাধা-চিন্তনে, ছিলে প্রেমে নিমগন।
কৃষ্ণের প্রসাদে, রাধার ইঙ্গিতে, গেলে চলি' ব্রজবন॥

---

* বেদান্তাচার্য্য শ্রীল 'বলদেব' বিদ্যাভূষণ প্রভু।

সে রাস-মঞ্চেতে, থাকি' রূপ-যূথে, কর রাধা-বিনোদন।
রাধা-অনুচরী, 'বিনোদ-মঞ্জরী', তুমি নিত্য ব্রজজন॥
হে ভক্তবৎসল! জীবন-সম্বল! কর কৃপা বরিষণ।
দাস্য-যোগ দিয়া, মোরে উদ্ধারিয়া, দেহ' কৃষ্ণ-সেবাধন॥

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ দিল্লী মহানগরী, ছত্রপতি শিবাজীর দেশ পুনা-মহানগরী এবং মুম্বাই মহানগরীতে বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। মহানগরী-ত্রয়ীতে ১৮।১১।৯৫ হইতে ২০।১২।৯৫ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সভায় ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, —**Western philosophy begins from wonder**। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোন ভিত্তিই নাই। ভারতীয় দর্শন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা প্রত্যক্ষ, মানসিক এবং আত্মিক—তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যক্ষ ও মানসিক দর্শনের হেয়তা, অসম্পূর্ণতা বর্ণনমুখে আত্মিক দর্শনই যথার্থ দর্শন, এই দর্শনের দ্বারাই জীবের প্রকৃত পারমার্থিক কল্যাণ হইতে পারে, তাহা ব্যাখ্যাদ্বারা বুঝাইয়া দেন। অন্য একটী সভায় ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহার আকার কি, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা '**Cause and effect theory**' (কার্য্য-কারণবাদ) ব্যাখ্যা করেন। 'অরূপবৎ এব হি তৎ প্রাধান্যত্বাৎ' এই সূত্রদ্বারা ও 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'র মাধ্যমে শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদ নিরসনমুখে ব্রহ্ম যুগপৎ কিরূপে সাকার-নিরাকার ও সগুণ-নির্গুণ ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য অপসম্প্রদায়ের অর্ব্বাচীন সমর্থকগণ ব্রহ্মের রূপ না মানিলেও তাহাদেরই ধর্ম্মগ্রন্থে—'**God created man after his own image**' এবং 'ইন্নাল্লাহা খালাকাহা মেন সুরাতি হি' উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মের সাকারত্ব প্রতিপাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ব্যাস-নারদ সংবাদে শ্রীব্যাসের অপ্রসন্নতার কারণ প্রসঙ্গে—ভা—ভাৎ প্রকাশং দুনোত্যত্যং,

গ—গতিরস্য দুরত্যয়া,
ব—বরিষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রেষু,
ত—তরণী চ ভবার্ণবাৎ,

ভাগবতের শাব্দিক ব্যাখ্যার দ্বারা 'ভাৎপ্রকাশ' শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের কারণ এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে, ইহা বিশদরূপে বর্ণনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্ম কখনই হইতে পারে না। ভক্তিপথেই জীব পরাবস্থা লাভ করিতে পারে। "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দেখান। অন্যত্র সভাতে শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব স্থাপন করেন। "নন্দস্তু আত্মজ উৎপন্নে ... জয়তি তেঽধিক, জন্মনা ব্রজ....." ও অন্যান্য ভাগবতীয় প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপনমুখে 'জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা দেবকীনন্দনত্বের গৌণত্ব স্থাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যুগপৎ যশোদানন্দন এবং দেবকীনন্দনও হইতে পারেন। অথবা বিভিন্নস্থানে তিনি যুগপৎ আবির্ভাব হইতে পারেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু ব্রজবাসিগণ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে যশোদানন্দন বা নন্দনন্দন ব্যতীত কোন কিছুই মানিতে রাজী নহেন। যুক্তি অবতারণার দ্বারা বলেন,—মানিয়া লইলাম যুক্তির খাতিরে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবনন্দন, বসুদেব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে রাখিয়া নন্দকন্যা যোগমায়া দেবীকে মথুরাস্থ কংস-কারাগৃহে আনয়ন করিলেন। দেবী কংসের হাত হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং কংসশত্রু অন্যত্র কোথাও জন্ম লইয়াছে ঘোষণা করিলেন। (১) এখানে অন্যত্র বলিতে মথুরা নহে, মথুরা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে। (২) বসুদেব মহারাজ পুত্রকে রাখিয়া কন্যা লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ত' কোনদিন কন্যা ফেরৎ দেন নাই বা দিতে পারিবেনও না। তাহা হইলে তিনি কিভাবে পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করিতে পারেন? সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও ইহার শুনানী হইলে বসুদেব মহারাজের পক্ষ বলবান্ হইবে। অতএব যুক্তির দ্বারা, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদানন্দন, নন্দনন্দন—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। অন্যান্য সভাতে বিশেষ করিয়া মুম্বাই মহানগরীস্থ ক্যাম্পস কর্ণারে বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ সময়ানুসারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

সংগ্রাহক—**শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী**, বিদ্যালঙ্কার

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

গুরুদেব !

শুভযাত্রা করিয়াছ পুষ্পকের রথে।
লীলা-সম্বরিয়া শেষে অনন্তের পথে ॥
জ্বেলেছিলে ভক্তিশিখা অন্তরে আমার।
কণ্ঠে ভাগবত-কথা শুনেছি তোমার ॥
প্রচারিলে বদ্ধজীবে কৃষ্ণপ্রেম-কথা।
জ্ঞান কর্ম্ম-ভক্তি-নিত্যসত্যের বারতা ॥
শম-দম-পবিত্রতা সহিষ্ণুতা ক্ষমা।
হৃদিস্থিত হৃষীকেশ-সেবন-মহিমা ॥
ঢালিয়াছ কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ-বিমুখেরে।
প্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত শ্রোতৃকর্ণ পরে ॥
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোতের প্রবাহে।
মাধুর্য্য-রসের সিন্ধু যেথা নিত্য বহে ॥
ভাসায়েছ প্রেমোর্ম্মির রসামৃত-ধারা।
পিয়ে পিয়ে ভক্তশিষ্য যাহে আত্মহারা ॥
প্রচারিলে কম্বুকণ্ঠে জৈবধর্ম্ম-গীতা।
নাম-নামী অভেদের সারাৎসার-কথা ॥
নন্দপুর চন্দ্র-বিনা যথা বৃন্দাবনে।
বহে তসিস্রার স্রোত মৃদুমন্দ স্বনে ॥
তেমতি হ'য়েছে মোর হৃদিবৃন্দাবন।
নীরবে বহিছে সেথা আঁধার-প্লাবন ॥
কে শোনাবে কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখে ?
বেদ-বেদান্তের বাণী উচ্চারিয়া মুখে ??
কেবা শুনাইবে আজ গোপী-প্রেমগাথা।
রাধাভাব-সুবলিত গৌর-কৃষ্ণকথা ॥

মাধুর্য্যরসের সিন্ধু শ্রীনন্দ-নন্দনে—
যূথেশ্বরী রাধিকার মধুর মিলনে—
হ্লাদিনীর চিদাহ্লাদে মূর্ত্ত জ্যোতিষ্মান্—
যেই করে আরাধনা সেই ভাগ্যবান্ ॥
আজি কোন্ বাঁশরীর রাখালিয়া সুরে।
মনের ময়ূরী মোর নেচেছিল ধীরে ॥
থাকিয়া থাকিয়া কেন সেই বেণুরব—
সুরহারা বারে বারে নিথর-নীরব !!
উঠে কেন সেথা চিরবিরহের গান—
ছন্দহারা তালহারা সঙ্গীতের তান !!
শ্রীপাদপদ্ম-সুরভিত অর্ঘ্য-পুষ্প মোর—
পারিজাত-গন্ধী হ'য়ে থাকুক বিভোর !!
ততক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রার্থনায় ধ্যানে—
নিয়ো মোর গণ্ড-মাল্য সভক্তি-চন্দনে ॥

—**ডাঃ মণীন্দ্রনাথ রায়,** এইচ. এম. বি.
সাহিত্য-বিশারদ

বর্ষশেষে নিবেদন

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" সপ্তচত্বারিংশ-বর্ষ অতিক্রম ও পরবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত ভোগপরায়ণ-ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা সংবাদ-বাহিকা নহে। জীবের বাস্তব কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া সুধীগণের পরম আদরণীয়া। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপুষ্ট থাকিয়া তাহার কর্ত্তব্য-সেবা যথাযথ পালন করিতে সক্ষম হওয়ায় নিজকে পরমসুখী ও ধন্য জ্ঞান করিতেছে। ইহার সেবক-সেবিকাগণ বর্ষশেষে কর্ত্তব্য-পালনজনিত সুখানুভব করিলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপা ও সুমেধাবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকা-গণই যে এই সৌভাগ্যের মূল কারণ তাহা সুসত্য। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা না হইলে এই সৌভাগ্যলাভ কখনই সম্ভবপর হইত না। তাঁহারা নিজগুণে সন্তুষ্ট থাকিয়া আগামী বর্ষগুলিতেও তাঁহাদের অমূল্য কৃপাবর্ষণ করিলে সকলেরই সুখের ও মঙ্গলের বিষয় হইবে। শ্রীপত্রিকার সেবকগণ নানাবিধ অসুবিধার বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। সহৃদয়ত পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাদের শুভদৃষ্টিদ্বারা আপতিত অসুবিধা হইতে

অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া আশা ও দৃঢ়বিশ্বাসে নববর্ষে পদসঞ্চারণ করিতে প্রয়াসী। শ্রীপত্রিকার সেবায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব পরিতোষ লাভ করিলে সকলেই সার্থক ও ধন্য হইবেন। তাঁহাদের প্রীতি ব্যতীত অন্যাভিলাষ শ্রীপত্রিকার যেন কাম্য না হয়—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

—শ্রীপত্রিকার জনৈক অধম সেবক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন শ্রীপত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলে গত ২৭শে পৌষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১২।১।৯৬), শুক্রবার শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর সম্মিলিত-আলোচনায় তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া লওয়া হয়। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩৭৪ ফাল্গুন হইতে ১৪০২ মাঘ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর কাল সুষ্ঠুভাবে বিশেষ দক্ষতার সহিত শ্রীপত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করত শ্রীসমিতির এবং শ্রীপত্রিকার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহকগণের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। তিনি ভবিষ্যতে শ্রীপত্রিকার পরিচালনা-কার্য্যে তাঁহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাজাত উপদেশাদি ও প্রবন্ধাদি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

উক্ত আলোচনা-সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীপত্রিকার পরবর্ত্তী সম্পাদকরূপে মনোনীত হন এবং উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজকে শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি-রূপে মনোনীত করিয়া তৎস্থলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজকে যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শ্রীপত্রিকা ভবিষ্যতে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন এবং শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন সহকারী-সম্পাদকরূপে মনোনীত হন।

আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁহাদের অহৈতুকী শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদে যেন শ্রীপত্রিকা শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারে সর্ব্বতোভাবে ব্রতী হন।

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা ও ষাণ্মাষিক ১৭·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি.পি.তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে কোনও সময়ে "শ্রীপত্রিকা"র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **"শ্রীপত্রিকা"র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি "শ্রীপত্রিকা"য় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'** শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-রচিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৯। The Bhagavat, ৩০। Nam-Bhajan, ৩১। Life Story of Impersonalism (Mayavad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩২। The Vedanta, ৩৩। Vaishnavism, ৩৪। Rai Ramananda। ৩৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ৩৬। প্রেম-প্রদীপ।

Central Regd. No. R.N. 5111/57
Postal Regd. No. W.B./NDA-13

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, মথুরা পোঃ (মথুরা), ইউ.পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, কঙ্খল পোঃ (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ (পুরী) উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — রান্দিয়াহাট পোঃ (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ — আশুতিয়াবাড় পোঃ (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — বাসুগাঁও পোঃ (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — তুরা পোঃ (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ (দার্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী — মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST

To

SL. NO.

From :—

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700 004
Ph. : 33-8973